হারেম থেকে বলছি

নিগূঢ়ানন্দ

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস
৫/১ এ, কলেজ রো, কলিকাতা – ৯

প্রকাশক :
বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
৫।১এ, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ—জ্যৈষ্ঠ. ১৩৬৭
দ্বিতীয় প্রকাশ—চৈত্র, ১৩৭৯

প্রচ্ছদ—শ্রীগণেশ বসু

মুদ্রাকর :
শ্রীহরিনারায়ণ দে
শ্রীগোপাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৫।১এ, কালিদাস সিংহ লেন,
কলিকাতা-৯

'হারেম থেকে বলছি' নাদিরের খোজা আফ্রিকান ক্রীতদাস আগাবাসীর আত্ম-কাহিনী। এ পুস্তক রচনার জন্য আমি মেনার্ড সাহেব রচিত 'নাদির শাহের জীবন চরিত' এবং জে. এ ব্রেণ্ডোন প্রণীত 'টুয়েলভ গ্রেট প্যাশন্‌স' গ্রন্থের উপর মূল আখ্যান ভাগের উপর নির্ভর করেছি। ঘটনার কিছু কিছু অংশের জন্য কয়েকটি পাঠ্য পুস্তকের উপরও নির্ভর করেছি। যাদের কাছে এ কাহিনীর জন্য আমি ঋণী, তাদের প্রত্যেকের কাছে আমার ঋণ স্বীকার করছি। কাহিনীবিন্যাস সম্পূর্ণ আমার, কিন্তু কাহিনীর ঘটনা সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক। সর্বশেষে এ কাহিনী লিখবার জন্য যিনি আমাকে উৎসাহ জুগিয়েছেন এবং দীর্ঘ দিন তাগাদা দিয়ে এ-কাহিনীকে বর্তমান রূপ দিতে বাধ্য করেছেন সেই শ্রদ্ধেয় প্রকাশক শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয়কে আমি আমার অন্তরীক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বেহালা
কলিকাতা—৩৪ } লেখক

এই লেখকের—

দুর্ধর্ষ তাতার
আগ্রা দুর্গের বন্দী
বলাকপুরের দরবেশ
ছন্দহারা
একটি বেগমের অশ্রু
বাবু আর বিবি
দক্ষল দরওয়াজার নগরী
বেগম নয় বাঁদী নয়
শায়ের কষ্ঠী
সুলতানা আমল
রাজপথ তীর্থপথ

আমি হারেম থেকে বলছি।

দিল্লীর মোগল হারেম নয়, পারস্যের নাদিরের হারেম। 'হারাম' অর্থাৎ 'অন্যায়' শব্দ থেকে 'হারেম' শব্দের সৃষ্টি। তুর্কী সুলতানদের জেনানামহলে পর-পুরুষের উঁকি দেবার উপায় নেই, সেটা 'হারাম'। 'হারাম'-এর দোহাই দিয়ে জেনানা-মহলের যে অঞ্চলটুকু সীমাবদ্ধ তাই হারেম। লোকচক্ষুর অন্তরালে সেই হারেমে কত না রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটে, কত না প্রেম-প্রীতি, কত বীভৎস কাণ্ড; যে দেখে সে অপরকে দেখাতে পারে না। যে শোনে, সে অপরকে বলতে পারে না। দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন এ এক আশ্চর্য জগৎ, খোদাতালার বাইরে মানুষের খোদ্‌গিরি।

আমি একজন সামান্য খোজা। আমার চোখ আছে দেখতে পাই, কান আছে শুনতে পাই, কিন্তু জিভ্ থাকলেও বলতে পারিনে। আমার প্রাণ আছে ব্যথা পাই, হৃদয় আছে অনুভব করি, কিন্তু যৌবন থাকলেও উত্তেজনা নেই। সে আমার বদ্‌নসিব, সে আমার অভিশাপ। দুনিয়াতে আমারও কিছু অভিযোগ আছে, আমারও কিছু বলবার আছে, কিন্তু অধিকার নেই। চেঁচিয়ে বললে এই মুহূর্তে আমার গর্দান নেমে যাবে। শাহের তলোয়ারের মুখে অবিশ্রান্ত ধার। আমি কোন ছাড়, দুনিয়া সে তলোয়ারের ঘায়ে রাঙিয়ে উঠেছে। কণ্ঠ তাই আমার নীরব।

কিন্তু কণ্ঠ রুদ্ধ হলেও ভাষার মৃত্যু হয় না। যেদিন মানুষ বর্ণমালা সৃষ্টি করে লিপিবিদ্যা আয়ত্ত করেছে, সেদিনই তার অনুচ্চারিত ভাব জীবন পেয়েছে বর্ণমালার মধ্যে। এই লিপিবিদ্যা

আমার আয়ত্তে। সুতরাং সরব কণ্ঠে যে কাহিনী আমি মানুষকে শোনাতে পারছি না, তার জন্যে রেখে যাচ্ছি নীরব বর্ণলিপি।

আমি একজন খোজা। খোজার অদ্ভুত বঞ্চিত জীবনের কাহিনী কে-না জানেন! কিন্তু আমার কাহিনী আমার নিজের জন্য নয়! নিজের জীবনের সেই অদ্ভুৎ বঞ্চনার কাহিনী লিখলে এক আশ্চর্য জবানবন্দী হয়। কিন্তু শুধুমাত্র নিজের জন্য কোন কিতাব লিখবার ইচ্ছা আমার নেই, কিংবা তারিখ-ই। কেন যেন আমার নিজের প্রচণ্ড বেদনাও নিজের মধ্যে কোন আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে না, যেমন অতলান্ত সমুদ্রের গভীর বেদনা. নিজেকে নিচ থেকে ঠেলে উপরে ঢেউ তুলতে পারে না। সে আন্দোলন সৃষ্টি হয় বাইরের হাওয়া লেগে। আমার জীবনেও তেমনি এক হাওয়া লেগেছিল বাইরে থেকে। আমার যতটুকু আলোড়ন, যতটুকু অভিযোগ, যতটুকু বক্তব্য শুধু সেই জন্যে। খুদাতালার সৃষ্টিতে অসামঞ্জস্যের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ। আমার অভিযোগ দুগ্ধফেনপুঞ্জের মত নিষ্কলঙ্ক জীবন যদি অপ্রয়োজনীয় ফুলের মত অমনি ফুটে উঠে ঝরে যায়, তার বিরুদ্ধে। তেমনি এক ঘটনা আমি আমার নিজের জীবনে দেখেছি। আমাকে তা ব্যথা দিয়েছে, অভিভূত করেছে। এ কাহিনী সেই গল্পটুকু জানবার জন্যেই। এ লেখার উদ্দেশ্য সুন্দরের মধ্যে সঙ্গতির অভাবে যে করুণ পরিণতি, সেইটুকু ধরিয়ে দেওয়া। সুন্দরের মধ্যে সঙ্গতির বিরাট অভাব, যা হারেমের অন্ধকারের মধ্যে আমার নিজের চোখে পড়েছে, অপর কোন মানুষের চোখে হয়তো তা কোনদিন পড়বে না।

কাহিনী আমার নিজের নয়, আমার চোখে দেখা আর একটি জীবনের অসঙ্গতির। কিন্তু সে-কাহিনী বলতে গেলে আমায় নিজেকেও কিছুটা জড়িয়ে যেতে হয়, তাই জড়াচ্ছি। আমার নাম আগাবাসী। আমি আফ্রিকার লোক। আমার ঘোর কৃষ্ণবর্ণ

চর্ম, কুঞ্চিত কেশ, পুরু ঠোঁট। আফ্রিকার অরণ্যের বাইরে সভ্য জগতের মানুষের কাছে আমি কুৎসিৎ।

কবে কোথা থেকে এসেছিলাম মনে নেই। তবে আমার অস্ফুট চেতনায় একদিনের এক প্রচণ্ড দৈহিক যন্ত্রনার কথা ভাসা ভাসা মনে পড়ে। আজ আমি কল্পনা করে নিতে পারি, সেই দিনই আমার মনুষ্য জীবনের চরম সর্বনাশ হয়েছিল। অথচ কি আশ্চর্য! মানুষের জন্য বেদনার অভাব আমার জীবনে কোনদিনও হল না।

আফ্রিকার উপকূল থেকে আমাকে ধরে নিয়ে এসেছিল আরব বণিকেরা। এনে বিক্রী করে দিয়েছিল বোগদাদের বাজারে। বোগদাদের কাজী হিসামৎউদ্দিন আমাকে কিনেছিলেন। এই যে আমি আজ লিখছি, এই অক্ষরমালার পরিচয় আমি হিসামৎ-উদ্দিনের কাছ থেকেই পাই। ঘরের মেয়েকে যেমন খাইয়ে-দাইয়ে সুস্থ করে তোলে বাপ-মায়েরা, ভাল ঘরে তুলে দেবে বলে, যাতে করে সহজে বরের নজরে পড়ে, আমাকেও তেমনি আদর-যত্ন করে গড়ে তুলেছিলেন বোগদাদের কাজী। দুয়ের মধ্যে ফারাক এই যে, মেয়ের ক্ষেত্রে থাকে স্নেহ মমতা, খোজার ক্ষেত্রে শুধু ব্যবসায়িক লাভালাভের একটা ভাবি কল্পনা। বরং আমাদের অবস্থাকে তুলনা করা যায় কুর্বানীর মানসে লোকে যে উট পুষে, তার সঙ্গে।

হিসামৎউদ্দিন কাজী হলেও মূলতঃ ছিলেন ব্যবসায়ী। ক্রীতদাস পুষে চড়া দামে বিক্রী করা ছিল তার অন্যতম একটি ব্যবসা। সেই কারণে ক্রীতদাসদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতেন তিনি, আদর যত্ন করতেন, লেখাপড়া শেখাতেন। আমার হাতে খড়ি সেই বোগদাদের হিসামৎউদ্দিনের কাছে। যা-ই হোক, আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞ এই কারণে যে, তিনি আমাকে নতুন জীবন দিয়েছিলেন। বিদ্যা মানুষের [illegible] সুলতান [illegible] কে।

বোগদাদের এই কাজী, আমাকে [illegible] চড়া দামে

বিক্রী করে দিলেন ইরাণ দেশের ইস্পাহানের বাজারে। ক্রীতদাসদের বাজার সেখানে ছিল জমজমাট। সেখান থেকে হাজারে হাজারে ক্রীতদাস চালান হয় হিন্দুস্থানের দিকে। হিন্দুস্থানের বাজার নাকি ছিল সব চাইতে ভাল। হিন্দুস্থানের বাজারে ব্যবসায়ীদের যেমন মিলত প্রচুর টাকা, তেমনি ক্রীতদাসদের ভাগ্যও সেখানে ছিল সর্বাপেক্ষা সদয়। তাই যেমন দলে দলে ব্যবসায়ী হিন্দুস্থানের দিকে তাকিয়ে থাকত সাগ্রহ দৃষ্টিতে, তেমনি ক্রীতদাসরা নিজেরাও চাইতো, হিন্দুস্থানে তাদের বিক্রী করুক তাদের মালিকেরা।

আমি শুনেছি, মুসলমানেরা অর্ধচন্দ্র উড়িয়ে যখন প্রথম গেল হিন্দুস্থানে. তখন ক্রীতদাসদের নসিব ছিল সব চাইতে ভাল। ক্রীতদাসরাই ছিল হিন্দুস্থানের ভাগ্যবিধাতা। হিন্দুস্থানে গিয়ে কেউ কেউ সুলতানও হয়েছেন তাদের মধ্যে। ঘুরীদের মহম্মদ ঘুরীর ছিল ক্রীতদাসের সখ। হাজার হাজার ক্রীতদাস কিনতেন তিনি। নিজের ছেলের মত ভালও বাসতেন তাদের। আদর যত্ন করতেন। নিজের ছেলে ছিল না, ক্রীতদাসদেরই ভাবতেন 'ছেলে' বলে। এদিকে খারিজম থেকে সেদিকে কাফেরের দেশ হিন্দুস্থানের বড় দরিয়া গঙ্গা নদী পর্যন্ত সাম্রাজ্য ছড়িয়েছিলেন তিনি। মরলে পড়ে ভোগ করবার কেউ নেই। গজনীর কাজী একদিন বলে ছিলেন, এতবড় রাজ্য, খুদাবন্দ না থাকলে ভোগ করবে কে?

হেসে জবাব দিয়েছিলেন সুলতান, কেন, এই তো আমার হাজার হাজার পুত্র রয়েছে, এরা করবে? ঔরসে জন্মালেই পুত্র হবে, এমন কথা কি? আপন পুত্র কত কুপুত্র হয়েছে। পুত্রের যে কাজ করে সেই পুত্র। আমার এই বান্দারা জান দিয়েছে খারিজম থেকে হিন্দুস্থানের মাটি পর্যন্ত। পুত্র আমার এরাই।

তেমনি এক ক্রীতদাস বল, বান্দা বল, পুত্র বল, ছিলেন কুতবউদ্দিন আইবক। আকৃতিতে আমারই মত। কুৎসিৎ। হাতের

একটা আঙুল তরবারি চালাতে গিয়ে উড়ে গিয়েছিল। কারো কারো মুখে শুনি, আইবক অর্থ চাঁদ বদন, কিন্তু কুতবউদ্দিন চাঁদবদন ছিলেন না মোটেও।

আমারই মত নিশাপুরের এক কাজী কিনেছিলেন তাকে। ঘোড়ায় চাপা থেকে তরোয়াল খেলা, সব শিখিয়ে ছিলেন। শিখিয়ে ছিলেন লেখাপড়া। তারপর প্রচুর দামে তাকে বিক্রী করে দিয়েছিলেন ঘুরের সুলতানের কাছে। সেই কুতবউদ্দিন ঘুরের সুলতানের মৃত্যুর পর নিজেই হয়েছিলেন হিন্দুস্থানের সুলতান। শুধু কুতবউদ্দিন নয়, আরো কত বান্দা ছিল তাঁর। এদের একজন হয়েছিল সিন্ধুর মালিক নাসিরুদ্দিন কাবাচা। আর একজন নিজে বসেছিলেন গজনীর গদিতে, তাজউদ্দিন ইলদুজ।

কুতবউদ্দিন স্বয়ং কিনে ছিলেন অনেক বান্দা। সেই বান্দাদের দিয়ে অনেক কাজ করিয়েছিলেন তিনি। তাদেরই একজনের সঙ্গে নিজের কন্যার সাদি দিয়েছিলেন, নাম তার ইলতুৎমিস। মালিকের মৃত্যুর পর সে নিজেই বসেছিল দিল্লীর তখ্‌তে। ইলতুৎমিসেরও ছিল হাজার হাজার বান্দা। এর মধ্যে চল্লিশ জন ছিল নাম করা। সবার সেরা ছিল একটা বেটে বান্দা, কুৎসিৎ বলবন।

হিন্দুস্থানের বাজারে সুন্দর কুৎসিৎ সবই বিকাতো। বাদ যেত না কিছুই। তাই আরব আর ইরাণের বণিকদের বেশী লোভ হিন্দুস্থানের বাজারের দিকে। বলবনের ব্যাপারটাই সকলকে আরো বেশী আকৃষ্ট করেছিল সেখানে। এই ইল্‌বারী তুর্কীদের কুৎসিৎ ছেলেটাকে চুরি করেছিল দাস-ব্যবসায়ীরা। কিন্তু সে ছিল এত কুৎসিৎ যে, মধ্য এশিয়ার বাজারে আর বিক্রী হয় না। অগত্যা বণিকেরা তাকে নিয়ে এল হিন্দুস্থানে। সুলতান তখন কুতবউদ্দিনের বান্দা ইলতুৎমিস। দেখে বললেন—ওয়াক! থু। একে কেনা

যায়না। তা শুনে বান্দার চোখে পানি। ইতিমধ্যে কোথাও বিক্রী হয় না দেখে মারধোর করতে আরম্ভ করে দিয়েছে বণিকেরা।

বলবন কেঁদে বলল : শাহেন শা, আমায় দয়া করুন। কিমুন।

সুলতান বললেন॥ তোমায় দিয়ে কি হবে? কোন কাজে লাগবে না।

সে বান্দার বুদ্ধি ছিল। বলল : শাহেন শা, আর সব বান্দাদের আপনি কিনেছেন কেন?

সুলতান বললেন : - আমার জন্য।

বান্দা বলল। আমায় তবে খুদাতালার নামে কিমুন।

সুলতান বুঝলেন, বান্দাটার রূপ না থাকতে পারে, বুদ্ধি আছে। কিনলেন।

সে বেটা জবরদস্ত সুলতান হয়েছিল হিন্দুস্থানে— সুলতান বলবন।

দিল্লীর তুগলকদেরও বান্দার সখ ছিল। ফিরজ তুগলক কিনেছিলেন চল্লিশ হাজার বান্দা।

এখন আছে মোগল বাদশা দিল্লীর তখ্‌তে। যত না বান্দার সখ, তার চেয়ে সখ বেশী বাঁদীর আর খোজার।

হারামের হাজারো হুরীর মতন মেয়ে মানুষদের খোজা আর বাঁদী ছাড়া পাহারা দেবে কে?

বান্দার মধ্যে সব চাইতে খারাপ নসিব আফ্রিকার বান্দাদের। কালো আদমি বলে এদের উপর মায়া দয়া নেই কারো। পুরুষত্ব কেড়ে নিয়ে দলে দলে খোজা করে। তুর্কী বান্দাদের ভাগ্য ভাল, পুরুষত্ব নেয় না কেউ। খবসুরৎ মানুষের মধ্যে একমাত্র আর্মেনিয়ার বান্দারাই পুরুষত্ব হারিয়েছে, আর আমরা।

খোজায় লাভ সব চাইতে বেশী। গাধার মত খাটবে। বিনিময়ে এক পেটের খোরাক ছাড়া আর কিছু পাবে না। ধন-দৌলত পেতে পারে। কিন্তু তা দিয়ে হবে কি? আসল জিনিষ না থাকলে

ঐশ্বর্যের আর মূল্য কি ? হিন্দুস্থানের বাংলা মুলুকে আমাদের মত কালো আদমি খোজারা এর বদলা নিয়েছিল—হাব্‌সী খোজা। সুলতানকে কোতল করে নিজেরা বসেছিল সিংহাসনে। আর এক খোজা ছিল দিল্লীর খিলজীদের আলাউদ্দিনের খোজা—মালিক কাফুর। দক্ষিণ মুলুক জয় করেছিল দিগ্বিজয়ী সেকেন্দার শার মত। শেষ পর্যন্ত খিলজীদেরই খতম করে নিজে হাত বাড়িয়েছিল তখ্‌তের দিকে। অপমানের প্রতিশোধ নিতে খোজা হয়েও সাদি করেছিল আলাউদ্দিনের এক বিধবা বেগমকে। বর্তমানে দিল্লীতে আছে এক খোজা, ধরতে গেলে হিন্দুস্থানের সর্বেসর্বা—জাবিদ খাঁ। লম্পট বাদশা মহম্মদ শা, তার কথাতেই উঠে বসে। এই দূর ইরাণের কান্দাহারে বসেও আমার দিল্লীর কথা মনে পড়ে। দিল্লী গিয়ে অবিস্মরণীয় এক স্মৃতি নিয়ে এসেছি আমি ; তাই নিয়েই তো আমার এই বর্ণমালা। কিন্তু সে কথা বলতে গেলে আমাকে নিয়েই যে আরম্ভ করতে হয় !

আমি আফ্রিকান আগাবাসী, ক্রীতদাস, খোজা। বোগদাদের হিসামৎউদ্দিন আমায় বিক্রী করে দিলেন কান্দাহারের বাজারে। সেখানকার বণিকেরা আমায় কিনলে বোধ হয় হিন্দুস্থানে চালান করে দেবার জন্যে। কারণ হিন্দুস্থানের মোগলদের যত খোজার প্রয়োজন, ইরাণে তত প্রয়োজন কই, আর টাকাই বা কোথায় ? কিন্তু আমার নসিব যদি ইরাণে থাকে, হিন্দুস্থানে আমি যাই কি করে ? আমি থাকলাম ইরাণেই।

হিন্দুস্থান আর ইরাণে বিরোধ, মান নিয়ে আর সম্ভ্রম নিয়ে অনেক দিন। সেই মান আর সম্ভ্রম নিয়ে বাবুর বাদশা থেকে মহম্ম শা—কতকাল দ্বন্দ্ব চলছে তো চলছেই। কে বড়, হিন্দুস্থানের মোগল বাদশা, না পারস্যের শা ? মারামারি হ'ত কান্দাহার দুর্গ নিয়ে ; একবার শায়ের হাতে, একবার মোগলদের হাতে। অথচ

মজার কথা, দুই দেশের দরবারে দু দেশের দূত থাকতো। নওরোজ আর রমজানে দুই দেশে কুশল বিনিময় হোত। মজার খেলা হয়েছিল ইরাণের শা আব্বাসে আর হিন্দুস্থানের শাজাহানে। নিজের কথা লিখতে গিয়ে সে কথাটা মনে পড়ে যাচ্ছে। অবশ্য এটা আমার শোনা কথা। দিল্লীতে ইরাণের রাজদূত ছিলেন বড় অহংকারী। হিন্দুস্থানের মোগল বাদশাকে বাদশা বলেই মানেন না। মাথা নুইয়ে সেলাম পর্যন্ত জানান না বাদশা শাজাহানকে। শাজাহানের জেদ, মাথা তাঁর নত করবেনই। একদিন হুকুম দিলেন, আমখাসের দিকে দরবারের যে প্রবেশ পথ আছে, সেটা বন্ধ করে দাও। শুধু সামান্য একটু ফাঁক থাকবে এক জায়গায়। ফাঁকটুকু এমন নিচু হবে যে ঢুকতে গেলে যেন মাথা নিচু করে ঢুকতে হয়। ব্যবস্থা হল। বাদশা শাজাহান স্বয়ং সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলেন। কথা ছিল ইরাণী দূত মাথা নত করে ঢুকতেই তিনি তাকে অভ্যর্থনা জানাবেন। তার অহংকার চূর্ণ হবে। বাদশা তাকে বলবেন—মাথাটা অত নিচু করে সেলাম করাটাও হিন্দুস্থানের রীতি নয়!

দূত বোধ হয় আগেই বাদশার দূরভিসন্ধি বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি বাদশার দিকে পিছন ফিরে নিচু হয়ে দরবারে ঢুকলেন।

দেখে বাদশা বললেন: হায় আল্লা! আপনি কি মনে করলেন, এখানে আপনার মত গর্দভের আস্তাবল আছে যে, ঐ ভাবে ঢুকলেন।

দূত বললেন: বাদশা ঠিকই বলেছেন। আমার চেয়ে বুদ্ধিমান গর্দভ ইরাণের শাহের দরবারে আরো অনেক আছেন। কিন্তু যিনি যেমন বাদশা, তাঁর কাছে তেমন দূতই পাঠানো উচিত বলে তিনি আমায় পাঠিয়েছেন।

শুনে শাজাহান বাদশার চোখ মুখ লাল। রাগে গড়গড় করতে করতে তিনি গিয়ে বসলেন ময়ূর সিংহাসনে।

শুধু একদিন নয়! অনেক দিন চেষ্টা করেছিলেন তিনি ইরাণী দূতকে অপমান করতে। একদিন পাকড়াও করলেন ভোজ টেবিলে। মুরগীর মাংস আর হিন্দুস্থানের পোলাও খাওয়া হচ্ছিল। খুব মজা করে মুরগীর ঠ্যাং চিবুচ্ছিলেন ইরাণী দূত। দেখে বাদশা বললেন : কুকুরগুলোর জন্য কিছু রাখুন ?

ইরাণী দূত পোলাওয়ের দিকে আঙ্গুল তুলে বললেন : ঐতো রেখেছি।

বাদশা শাজাহানের মুখ লাল। তিনি খুব পোলাও খেতে ভালবাসতেন।

ময়ূর সিংহাসন থেকে বাদশা একদিন ইরাণী দূতকে জিজ্ঞেস করলেন : ইস্পাহান ভাল, না দিল্লী ভাল ?

উত্তরে দূত বললেন : বিল্লা। বিল্লা! (বি-ইল্লাহি) ইস্পাহানকে দিল্লীর ধূলোর সঙ্গে তুলনা করা যায়!

বাদশা ভাবলেন, আহা! দিল্লীর ধূলোর সঙ্গেও বুঝি ইস্পাহানের তুলনা হয় না। কিন্তু আসল ব্যাপারটা তা নয়। দূত বোঝাতে চাইছিলেন এই যে, দিল্লীতে যা ধুলো, ইস্পাহানের সঙ্গে তার তুলনা করতে চাওয়াই বাতুলতা।

আর একদিন দরবারে বাদশা জিজ্ঞেস করলেন : আচ্ছা রাষ্ট্রীয় শক্তি হিসাবে, হিন্দুস্থান বড় না, ইরাণ বড় ?

ইরাণের দূত বলেছিলেন : শোভানাল্লা! ইরাণের সঙ্গে হিন্দুস্থানের তুলনা ? হিন্দুস্থান যদি পূর্ণ-চন্দ্র, তবে ইরাণ হল দ্বিতীয়ার চাঁদ।

শাজাহান শুনে আহ্লাদে আটখানা। ভাবলেন হিন্দুস্থানের শক্তির কত প্রশংসাই না করলেন ইরাণী দূত। কিন্তু একা বসে যখন কথাটার গভীর অর্থ ভাবলেন, তখন নিজে বোকা বনলেন। প্রকারান্তরে ভারতবর্ষ যে ইরাণের চেয়ে অনেক দুর্বল, একথাটাই

বোঝাতে চেয়েছিলেন দূত। পূর্ণচন্দ্র ধীরে ধীরে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। কিন্তু দ্বিতীয়ার চাঁদ ক্রমশ বাড়ে। অর্থাৎ ইরাণের শক্তি ক্রমবর্ধমান।

বুদ্ধিতে না এটে উঠতে পেরে এত বিরক্ত হয়েছিলেন বাদশা যে, কি বলব, পাগলা হাতী লেলিয়ে দিয়ে পর্যন্ত তাঁকে মারতে চেয়েছিলেন।

তাই বলছিলুম হিন্দুস্থানের বাদশার সঙ্গে ইরাণের শাহের বিরোধ নতুন নয়। শেষ পর্যন্ত বিরোধে ইরাণেরই জয় হয়েছিল, ভারতের নয়। দশ কোটি তঙ্কা ব্যয় করেও মোগল বাদশারা ইরাণের শাহের কাছ থেকে কান্দাহার পুনরুদ্ধার করতে পারেনি।

হিন্দুস্থানে ক্রীতদাস হয়ে, বা মোগল হারেমের খোজা হয়ে আমাকে ভারতবর্ষে আসতে হয়নি। তবে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল হিন্দুস্থানে আসবার, মোগলদের লীলাক্ষেত্র দিল্লী দেখবার এবং মোগল হারেমের অভ্যন্তরে উঁকি দেবার। কিন্তু সে কথা যথাসময়ে বর্ণনা করব।

হিজরি ১১১৯ সালে ইরাণের সফাভিদ বংশকে হটিয়ে দিয়ে আফগানরা সিংহাসন দখল করেছিল। সুরুচি-সম্পন্ন ইরাণীদের উপর রাজত্ব করবে অসভ্য আফগানরা, এটা যেন অসহ্য ছিল। কিন্তু দুনিয়ার রুচির মূল্য কি, যদি শক্তি না থাকে? ইরাণীরা শক্তির সাধনা ভুলে গিয়ে করছিলেন সংস্কৃতির সাধনা। সুতরাং বিপর্যয় এল। দিকে দিকে হাহাকার উঠল—গেল, গেল, সব গেল। কিন্তু রুচি এবং সংস্কৃতিকে রক্ষা করবে কে? সুরুচি সম্পন্ন মুসলমানেরা চতুর্দিকে আবেদন জানাতে লাগলেন। এমন কি হিন্দুস্থানের কাপুরুষ সুলতান মহম্মদশায়ের কাছেও আবেদন গেল। সুলতানের দাক্ষিণাত্যের শিপাহশালার নিজাম উলমুলক পর্যন্ত সুলতানকে পরামর্শ দিলেন মোগল বাহিনী নিয়ে পারস্যের দিকে এগিয়ে যেতে। কিন্তু মদ আর মেয়ে নিয়ে যে বাদশা পাপের পঙ্কিল

আবর্তে ডুবে আছে, তাঁর কাছে শৌর্য বীর্য এবং কর্তব্যের কোন মূল্য নেই।

শেষ পর্যন্ত সফাভিদ বংশের সাহায্যে এগিয়ে এলেন ইরাণেরই একজন নাগরিক—নাদির কুলি খাঁ। বংশ মর্যাদায় আফগানদের চাইতে সামান্য উঁচু হলেও রুচিতে তাদের অপেক্ষা কোন অংশেই বড় ছিলেন না নাদির কুলি। তার পিতার নাম ইমাম কুলি। জাতিতে এরা তুর্কোমান। কাজ পশুচারণা। কিন্তু সাহসে নির্ভিক এবং শক্তিকে দুর্ধর্ষ। তুর্কোমানরা দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায় পারস্যের পাহাড় পর্বতের ছায়ায়, সবুজ মাঠে প্রান্তরে, সঙ্গে থাকে হাজার হাজার মেষ ও অন্যান্য পশু। ভয় পায়না কাউকে, যে-কোন শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে তারা। এই তুর্কোমানদের নেতা নাদির কুলির কানে গেল সফাভিদ বংশের বিপদের কথা। তিনি তার পশুচারকের দল নিয়েই এগিয়ে এলেন আফগানদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। রক্তের স্রোত বয়ে গেল তুর্কী-আফগানদের দ্বন্দ্বে। অবশেষে আফগানরা ইরাণ ছেড়ে পালালো আফগানিস্থানের পর্বতাকীর্ণ অঞ্চলে। সফাভিদ বংশের শা তামাশ আবার বসললেন সিংহাসনে। শা দ্বিতীয় তামাশ। সেই ঘূর্ণী ঝড় উঠবার কয়েকদিন আগেই আমাকে বিক্রী করে দেওয়া হয়েছিল শা তামাশের কাছে।

পারস্যের হারেমের সুন্দরী ললনাদের পাহারা দেবার জন্যে একজন বলিষ্ঠ খোজা ক্রীতদাসের প্রয়োজন ছিল। হারেমের মধ্যে সুলতানের প্রকোষ্ঠের মুখে সে স্বয়ং থাকবে পাহারা। প্রয়োজন হলে দুষ্‌মন রুখতে তরবারি ধরবে। অথচ মেয়েরা কাছে দাঁড়ালেও তার দেহে উত্তেজনা জাগবে না। খোজা ছাড়া তেমন ব্যক্তি আর কে হতে পারে? সুতরাং আমি হলুম শাহের খাসমহলের পয়লা নম্বরের খোজা।

আফ্রিকার কালো চামড়ার নিচে আমার দেহে প্রবল রক্তের

স্রোত ছিল। অথচ পুরুষত্বের অভাবে রক্তের স্রোতের মধ্যে হারেমের পক্ষে ক্ষতিকর কিছু ছিল না। আমাকে দেখে শাহের ভারি পছন্দ হল। এমন দৈত্যের মত বলিষ্ঠ অথচ নিবীর্য প্রহরীই তাঁর দরকার। আমার মালিক আমাকে অত্যন্ত চড়া দামে বিক্রী করলেন। আমি হলুম শাহী মহলের খোজা।

জীবনে প্রথম দেখলুম পর পুরুষের নিষিদ্ধ দেশ—হারেম। আমার যে-সব মালিকদের অধীনে আমি থেকেছি, তারা সবাই ছোটদরের মানুষ। তাদের কারো দুজন বেগম, কারো পাঁচ-দশজন বেগম আছে বটে তবে তাদের পাহারা দেবার জন্যে কখনো খোজার প্রয়োজন হত না। বাঁদীরাই ছিল যথেষ্ট। আমি খাটতুম আমার নিজের মালিকের পার্শ্বচর হয়ে। আমি খোজা হলেও তখন ভৃত্য বই আর কিছু ছিলুম না। খোজার প্রয়োজন কেন এবং কি জন্য, বুঝলুম শাহীর হারেমে এসে।

একটা দুর্গ, তার আধখানা দেয়াল দিয়ে পৃথক। সেখানে বারোমাস থাকে জরুরী প্রয়োজনের জন্য শাহী ফৌজ বাকী অংশে শাহের দরবার আর হারেম। দরবারে সিংহাসনের পশ্চাতেই হারেমে ঢুকবার পথ। শাহ সেই পথে দরবারে আসেন। খোজা আর বাঁদীদের চলাচলের পথ পাশ দিয়ে। আমি দরবারে সিংহাসনের পাশ দিয়ে একদিন হারেমে ঢুকলাম দায়িত্ব নিয়ে। দুর্গের মধ্যে সে এক বিরাট প্রান্তর। এখানে সেখানে নানাস্থানে ঘর। মূল্যবান পাথরের কারুকার্য করা। পুর্বদেশের রেশমী পর্দা দিয়ে প্রত্যেক ঘরের প্রবেশ পথ আচ্ছাদিত। জলের ফোয়ারা। সবুজ ঘাসের উদ্যান। রক্ত গোলাপ। ঝর্ণাধারা। শাহীমহলের জন্য বেগমের ঘরের চার পাশে নিচের সারিতে বাঁদীদের আস্তানা। উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে খোজাদের ঘুরে বেড়ানোর জন্য প্রশস্ত চত্বর। বিভিন্ন বেগমের জন্য বিভিন্ন অঞ্চল। এক একটি বেগমের জন্য একদল করে বাঁদী।

এক একটি বাঁদীর দলের উপর একজন করে খোজা। হারেমের প্রত্যেক প্রবেশ পথের মুখে উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে সদাজাগ্রত খোজা প্রহরী। প্রহরে প্রহরে নতুন খোজা এসে দায়িত্ব নিয়ে দুয়ারে দাঁড়ায়। ঝকমকে খোলা তরবারি হস্তে পাথর মূর্তির মত ঠায় অপেক্ষা করে।

আমার কাজ হল দাঁড়িয়ে থাকা নয়—তদারক করা। বিশেষ করে মুখ্য বেগমের মহলের চতুষ্পার্শ্বে কড়া নজর রাখা।

হারেমে ঢুকেই আমি বুঝলুম, এখানে সৌন্দর্য আছে, সোয়াস্তি নেই। এখানে উন্মত্ততা থাকলেও সুখ নেই। এখানে যৌবন থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা ব্যর্থ। সকল থাকতেও যেন এ এক বুভুক্ষু হুরীর দেশ, হারেম।

শা দ্বিতীয় তামাশ আফগান বিপদের পর থেকে বড় বেশী ভয় পেতে আরম্ভ করেছিলেন। চতুর্দিকে তিনি যেন বিভীষিকার ছায়া দেখতেন। ভাবতেন, এক মুহূর্তও তিনি বুঝি নিরাপদ নন। তাই খোজা প্রহরীর সংখ্যা বাড়ালেন অনেক। বিশেষ করে আমাকে তাঁর নিজের জন্য রাখলেন এই কারণে যে, আমি খোজা হলেও আমার রুচি ছিল। বর্ণমালার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। আমি হাফিজ, সাদী, রুমি, জামি পড়েছিলাম।

শক্তির সঙ্গে সুরুচি পারস্যের জাতীয় চরিত্র। আমাকে কেন জানি শা বেশী বিশ্বাস করতে চেয়েছিলেন। প্রথম দিনই আমায় বলেছিলেন: আগা, আমি তোমায় বিশ্বাস করতে পারি কি?

আমি কুর্নিশ জানিয়ে বলেছিলাম: শাহেন শা, আমি বান্দা, খোজা। যার নিমক খাই, তার জন্য জান দিই;

শা বলেছিল: হু। আমি তা জানি বলেই তোমাকে আমার নিজের মহলের খোজা নিয়োগ করেছি। রুচি জ্ঞানহীন লোকগুলো বিশ্বাসী হলেও হঠকারী। হঠাৎ বিগ্‌ড়ে গেলে বিপদ করে। আমি

তোমার মত একজন শিক্ষিত রুচিবান খোজা খুঁজছিলুম, যে সব বুঝবে, বুঝে কাজ করবে। যার তার হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে হারেমে আমি নিরাপদ বোধ করিনে। তোমার উপর দায়িত্ব. রইল, সমস্ত খোজাদের তদারক করবার। বেইমানীর কিছুমাত্র আভাস পাবে কি, সোজা গর্দান নেবে, আমার ঢালাও হুকুম। বাঁদীরা যদি বেয়াদপি করে, চাবুক কষবে। বাঁদীরা বড় চঞ্চল। নজর না রাখলে বয়ে যায়। জানতো, হারেম মানে নিষিদ্ধ এলাকা। পরপুরুষের ছায়া যেন এখানে কদাচ না পড়ে।

আমি শাহকে কুর্নিশ জানিয়ে বললুম: শাহেন শা—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এ সমস্ত শিক্ষাই আমাকে আমার মালিকেরা দিয়েছেন।

শা বললেন: আমি তা জানি বলেই, তোমাকে অতি উচ্চ মূল্যে ক্রয় করেছি। আমি জানি, তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করবে।

শা এই কথা কয়টি বলে জরি করা সিল্কের পর্দা সরিয়ে মূখ্য বেগমের মহলে প্রবেশ করলেন। আমি আবার তাকে কুর্নিশ করে, তিনি অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত মাথা নত করে থাকলুম।

পূর্ব আমিরদের যতদিন বান্দা ছিলুম, জেনানা মানুষের মুখ আমি খুব কম দেখতুম! মেয়েরা হাটতো বোরখা পড়ে। হারেমে আমি দেখলুম বোরখাহীন ঝাঁকে ঝাঁকে সুন্দরী মেয়েছেলে। খোজাকে লজ্জা বা সঙ্কোচের কিছু নেই। মিহি মসলিনের ওড়না গায়ে সালোয়ার কামিজ পরা বাঁদীরা অবাধে ঘুরে বেড়াতো হারেমের মধ্যে। মাঝে মাঝে ননীর মত নরম দেহের বেগমেরা দেখা দিতেন। একপাল বাঁদী তাঁদের ঘিরে ঘিরে চলত। অহংকারে বেগমদের যেন মাটিতে পা পড়ত না। দেখে মনে হত, মানুষকে তারা মানুষ বলে ভাবেন না। বেগমদের দেখলেই কুর্নিশ করে পথ করে দিতুম।

মুহূর্তের মধ্যে রটে গিয়েছিল আমি হারেমের প্রধান খোজা। অন্যান্য খোজা আর বাঁদীরা তাই প্রথম থেকেই আমাকে দারুণ সমীহ করে চলতে লাগল। বিশেষ করে বাঁদীরা মুহূর্মুহু আমাকে সালাম জানাত : সালাম আগা সাহেব। চোখের কোণে দুষ্টুভাবে তাকিয়ে তারা আমাকে দেখে হাসত। তাদের সে হাসির ছটা তাতারদের নিক্ষিপ্ত তীরের মত যেন আমার বুকে এসে লাগত। আমি প্রথম প্রথম ভাবতুম, সে হাসির মধ্যে বুঝি আমার জন্যে বিদ্রূপ মেশানো আছে। পরে বুঝেছিলুম, না, তা নয়।

বাঁদীরা তো খোজা নয়। পুরুষের পুরুষত্ব নষ্ট করে তাকে খোজা করা যায়। কিন্তু বাঁদীর নারীত্ব তো নষ্ট হয় না। অথচ নারীত্বের সার্থকতা হারেমের মধ্যে তাদের নেই। শুধু বাঁদীদের কেন, সমস্ত বেগমদেরও নেই। বছরের পর বছর কেউ ফুলের মত সুন্দর যৌবন নিয়ে পড়ে আছেন, ভ্রমর নেই। সে যন্ত্রনা নারী ছাড়া আর কে বুঝে। তাই প্রতি সন্ধ্যাতে হারেমে ভারে ভারে সিরাজী আসতো। পান করে চূড় হয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকতেন বেগমেরা। নেশা না হলে উন্মাদের মত ব্যবহার করতেন। বাঁদীদের জাপটে ধরতেন, সুখ না পেলে চাব্‌কাতেন। তারপর হুহু করে কাঁদতেন।

বাঁদীদের তাই দেখতুম, প্রতি সন্ধ্যায় যেমন করে হোক নেশায় বুঁদ করে বেগমদের বেহুস করবার চেষ্টা করে তারা। নইলে কপালে লেখা নির্ঘাৎ লাঞ্ছনা। কিন্তু বেগমদের বেহুঁস করলেই কি সব হত? তাদের নিজেদের যন্ত্রনা নেই? সুতরাং তারাও ভারে ভারে মদ খেত, পাগলামী করত, যে খোজাদের বলিষ্ঠ দেহ ছাড়া আর কোন রমণী-রমণ ক্ষমতা নেই, তাদের বিরক্ত করতো, লোভ দেখাতো, আড়ালে টানতো।

এই বেয়াদবি তদারকির ভার পড়েছিল আমার উপর। প্রথম

প্রথম আমি ভাবতুম—সত্যিই এটা বেয়'দবি—তাই নির্মম ভাবে চাবুক কষতুম। মেরে মেরে হারেমের নিচে ছোট ছোট কুঠুরিতে তাদের পাঠিয়ে দিতুম। পরদিন পিঠের উপর কড়া চাবুকের দাগ নিয়ে আবার ফোলা ফোলা চোখে জেগে উঠতো বাঁদীর দল। আমাকে দেখেই সালাম জানাতো : সালাম আগা সাহেব।

আমি ভাবতুম, কি নির্লজ্জ আর বেহায়া এই মেয়ে মানুষগুলো। পরে বুঝেছিলাম—কি বিরাট বঞ্চনা ওদের মধ্যে। যে বঞ্চনার জন্য মান-অপমান জ্ঞান পর্যন্ত ওদের আর নেই। প্রতি সন্ধ্যার অন্ধকারে আবার ওরা সিরাজীর নেশায় বেহুঁশ হয়ে বেগম মহলের আনাচে কানাচে খোজা প্রহরীদের হাত ধরে টানতো।

খাস বেগম মহলের বাঁদী ছিল সাকী। ষোড়শী, তন্বী। যেন হিন্দুস্থানের এক টুক্‌রো লিকলিকে চাবুক।

অনেক বেশী রাত না হলে সে নেশা করতে পারত না। স্বয়ং শাহ যখন ঘুমিয়ে পড়তেন, তখন সে চুপি চুপি দ্রাক্ষা সুধা পান করতো। তার সমস্ত দেহের উপর যেন রক্তের আগুন জ্বলত। শাহ যখন মঞ্জিলে আসতেন তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হত পর্দার এপাশে হুকুমের অপেক্ষায়। কিছু দূরেই খোলা তরোয়াল হাতে দাঁড়িয়ে থাকতুম আমি। কৌতুকের দৃষ্টি মেলে মুহুর্মুহু সে আমার দিকে তাকাতো। আমি শিখেছিলুম, জেনানার দিকে তাকানো 'গুনাহ'। তাই আমি আমার নাক বরাবর সামনের দিকে তাকিয়ে থাকতুম, যাতে কোন দিকে দৃষ্টি না যায়। তা দেখে সে হাসতো। আমার দিকে চোখ পড়তে আরো বেশী করে হাসতো। প্রথম প্রথম আমার মনে হত, সে বিদ্রূপ করছে।

দিনে দিনে বোধহয় সাকীর সাহস বেড়ে চলেছিল। ক্রমশঃ সে আমার আরো কাছে এসে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করত। আমি ধমকে উঠতুম : হঠো ! ভাগো !

একটু দূরে দাঁড়াতো সে। ভ্রূকুটি করতো। ভেংচি কেটে বলত : তুমি একটা আফ্রিকার উল্লুক। বুদ্ধু।

আমি আমার কোমরে গোজা চাবুকটা বের করে তাকে শাসাতাম। চাবুকের ডগাটা লক্ লক্ করত। সে একটু দূরে সরে দাঁড়াতো। কিন্তু তাকে হটিয়ে রাখা কি সহজ ছিল? যাতায়াতের সময় সে আমার গা ঘেঁষে চলত। ক্রমশঃ এমন গা ঘেঁষে চলতে আরম্ভ করল যে, আমি যে খোজা, আমার দেহের রক্তও তাতে চন্ চন্ করে উঠতো।

আমি ভাবতুম, সাকীকে যদি প্রশ্রয় দিই, তবে আমি কর্তব্য ভ্রষ্ট হব। শাহ আমার উপর রাগ করবেন। তাই একদিন তাকে ভয়ানক ভাবে শাসাব বলে ভাবলাম আমি। কিন্তু খুদাতালার মনে যে এমন ইচ্ছা ছিল, তা কে জানতো! সে কথা মনে পড়ে আজো আমার মনে মর্মদাহের অন্ত নেই।

শাহের মনে ছিল তখন দারুণ চিন্তা। বেগমের ননীর মত দেহের স্পর্শে, দুগ্ধ ফেননিভ শয্যায়, রেশমে মোড়ানো গদিতেও তার নিদ্রা ছিল না। সিরাজীতে নেশা ধরত না। যে পশুচারক তুর্কোমান নাদির কুলি তাঁকে আফগান অসভ্যদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন সেই নাদির দিন দিন বড় বেশী ক্ষমতাশালী হয়ে উঠছিল। স্বয়ং শাহকে সে উপদেশ দিতে চাইত। সে জন্যে শাহের মনোযন্ত্রণা ছিল, ভয়ও ছিল।

সে ছিল এক গভীর অন্ধকার রাত। অন্ধকারকে বড় বেশী ভয় পেতে আরম্ভ করেছিলেন শাহ তামাশ। ভাবতেন, অন্ধকারের আড়ালে বুঝি কোন গুপ্তঘাতক ঢুকে পড়বে তাঁর হারেমে। অন্ধকারে পাছে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন এই ভয়ে সেদিন বেশী সিরাজী পান করেননি। নিজের চিন্তাতেই নিথর হয়ে ভাবছিলেন। সাকীর ধারণা ছিল শাহ ঘুমিয়েছেন। সে এসে আমার কাছে দাঁড়িয়েছিল। আমার

মানা শোনেনি, জোর করে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল। তারপর আমাকে বিন্দুমাত্র চিন্তার অবকাশ না দিয়ে—চুমু খেতে আরম্ভ করেছিল। আমি ভয় পেয়েছিলুম। মনে হয়েছিল চিৎকার করে উঠব। সজোরে ঠেলে দিয়েছিলুম সাকীকে।

এক ফোটা ছোট্ট দেহের মধ্যে কি যে প্রচণ্ড শক্তি ছিল, কি বলব। যেন একখণ্ড বিরাট পাথর। তাকে আমি ঠেলে সরাতে পারছিলুম না। সমস্ত দেহের শক্তি দিয়ে কোন রকমে তাকে দূরে ঠেলে দিয়েই সজোরে চাবুক কষেছিলুম—সপাং।

মুখ বুজে চাবুকের কামড়টা পিঠের উপর সহ্য করেছিল সাকী। কোন শব্দ করেনি। কিন্তু চাবুকের শব্দ স্বয়ং শাহের কানে গিয়েছিল। নিঃশব্দ পদে রেশমী পর্দা ঠেলে দিয়ে তিনি বাইরে এসেছিলেন। তখনো আমার চাবুক পড়ছিল সাকীর পিঠে। গম্ভীর কণ্ঠে শাহ ডেকেছিলেন : আগা!

—হুকুম করুন শাহেন শা। যন্ত্র চালিতের মত আমি সেই ভাবেই তাকে কুর্নিশ জানিয়ে ছিলাম।

—কি হচ্ছে?

বলেছিলুম : শাহেন শা, সাকী বেয়াদপি করছিল।

সাকী তখন দুই হাতে মুখ ঢেকে মাথা নিচু করেছিল। শা গম্ভীর ভাবে তার আপাদমস্তক তাকিয়ে দেখলেন। তারপর বজ্রকণ্ঠে আমাকে হুকুম করলেন : আগা, ওর মাথাটা গর্দান থেকে নামিয়ে দাও।

আমি যেন শিউরে উঠলুম। করুণ দৃষ্টিতে শাহের দিকে তাকিয়ে মিনতির সুরে বললুম : শাহেন শা!

গম্ভীর কণ্ঠ এল : হুকুম তামিল কর।

তীক্ষ্ণ ধারালো তরবারিটা তুলে নিলুম। মশালের আলোতে বুঝি ইস্পাতের ফলাটি ঝল্‌কিয়ে উঠল। তারপর কি করলাম আমিই জানি না। দেখলুম—কর্তিত বেণীর সঙ্গে স্কন্ধচ্যুত একটা

শির দূরে ছিটকে পড়েছে। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটেছে, রক্তের বন্যা।

শাহ্‌ বললেন : মশালের আলোটা বাড়িয়ে দাও।

আমি আলোটা উস্কে দিলুম।

ধীর পদে শাহ্‌ মহলের মধ্যে ঢুকে গেলেন।

আমার সমস্ত শরীরটা কাঁপতে লাগল। আমার কণ্ঠ শুকিয়ে গেল। মনে হল আমি ঘুরে পড়ে যাব।

কে কাকে কখন খবর দিয়েছিল জানি না। দেখলাম, একদল খোজা এসে মৃত দেহটাকে নিয়ে গেল। একদল বাঁদী এসে ধুয়ে দিল হারেমের উঠানটা। আমি প্রাণহীন নিস্পন্দ পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকলুম, কিছু ভাবতে পারলুম না।

সংবিত ফিরে পেলুম অনেকক্ষণ পরে। তখন আমার শরীর শীতের আকাশের নিচে নগ্নদেহ ভিখারীর মত কাঁপছে। আমি ভাবলুম : এ আমি কি করলুম? প্রথম মানুষ হত্যা করলুম! তাও জেনানা আদমি! কেন? সাকী কী অপরাধ করেছিল? সাকীর কথা আমি ভাবতে লাগলুম। সাকীর অদ্ভুত আচরণের কথা ভেবে আমি তার উত্তর খুঁজতে লাগলুম। সাকী আমার কাছে কি চেয়েছিল?

অদ্ভুত একটা বনমানুষের মত আমার চেহারা। কোক্‌ড়ানো চুল। পুরু ঠোঁট। আমার মধ্যে পুরুষত্ব নেই। তবু সে আমার মধ্যে কি চেয়েছিল?

একথার উত্তর আমি কিছুটা পেয়েছিলাম। মেয়েদের কাম্য সুস্থ পুরুষ। সৌন্দর্য পরের কথা। পুরুষের সান্নিধ্য থেকে আজীবন বঞ্চিত হারেমের বাঁদীরা। অথচ জৈবিক দেহের তাগাদাকে অস্বীকার করবে কি দিয়ে? তাই সামনে যা পাওয়া যায় তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি করে। খোজাকে বিরক্ত করে সন্ধ্যার আড়ালে। খোজার আর কিছু না থাক, পুরুষের মত দেহটা আছে তো! সেই পুরুষ দেহের আলিঙ্গনেও অনেকটা

তৃপ্তি। তারপর আরো কিছু পেতে চায়। যখন পায় না তখন উন্মাদের মত ব্যবহার করে। রক্তের কামড় কখনো কখনো এমন উন্মাদ করে দেয় ওদের যে, নিজেরা নিজেরাই সিরাজীর নেশায় উন্মত্ত হয়ে জড়াজড়ি করে। জড়ানো কণ্ঠে আদর করে দাবী করে, কামনা জাগায়। কি অদ্ভুত অসঙ্গতি, মানুষের নিজের ব্যবস্থায়। খুদাতালার উপর খোদগারির কি করুণ পরিণতি !

পাপের শাস্তি আছে। আমার হাত দিয়ে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে কাজ করানো হয়েছিল, যে বীভৎস দৃশ্য আমাকে বহুদিন পর্যন্ত স্তম্ভিত করে রেখেছিল, শাহ তার প্রায়শ্চিত্ত করতে বাধ্য হলেন। যে নাদির কুলি তাঁকে আফগানদের হাত থেকে রক্ষা করেছিল সেই নাদির কুলিই তাকে আবার সিংহাসন থেকে টেনে নামালে। একদিন শা তামাশ হারেম থেকে দরবারে যাবার আগেই বাইরে কোলাহল শোনা গেল। দরবারে জয়ধ্বনি উঠল নিজের পুত্র তৃতীয় আব্বাসের। সে ধ্বনি শুনে একটা মড়া মানুষের মুখের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল শা তামাশের মুখ। তেমন করুণ মুখ এ দুনিয়ায় আমি আর কখনো দেখিনি। সাকীর স্কন্ধচ্যুত মুখের মধ্যেও এমন বীভৎস ভয়ের ছাপ আমি দেখতে পাইনি। টলতে টলতে শাহ মহলের মধ্যে ঢুকে গেলেন।

একজন খোজাকে আমি দরবারে পাঠালুম ঘটনা জানবার জন্যে। সে গিয়ে খবর নিয়ে এল। খবর এই যে নাদির কুলির নির্দেশে আমিরেরা শা তামাশকে সিংহাসনচ্যুত করে তাঁর পুত্র তৃতীয় আব্বাসকে সিংহাসনে বসিয়েছেন। শুনে আমি কি করব ভাবতে লাগলুম। নতুন শাহের কাছ থেকে কোন হুকুম না পেলে আমার কিছু করবার নেই। আমি ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইলুম। কিন্তু অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই হুকুম এল। ওয়াজীর স্বয়ং ঢুকলেন শাহী ফৌজ নিয়ে হারেমে। নতুন বাদশার পরোয়ানা দেখিয়ে আমায় বললেন ঃ

শাহী মহলে নিয়ে চল।

আমি খোজা। আমি বান্দা। তখতে যিনি আছেন আমি তারই ভৃত্য। আমার ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা রুচি কিছু নেই। ওয়াজির সাহেবকে কুর্নিশ জানিয়ে বললুম: খুদাবন্দের হুকুম এখনি তামিল হবে। শাহী-মহলের দিকে আমি তাকে নিয়ে চললুম। রেশমী পর্দা হাত দিয়ে টেনে ভেতরে যাবার পথ দেখালুম।

হারেমের মধ্যে ফৌজ দেখে হৈ হুল্লোড় পড়ে গেল। কোথাও ছু-একজন বেগম বুক চাপড়ে কেঁদে উঠলেন। ফ্যাকাশে মুখে অর্থ-হীন ঘোলাটে দৃষ্টি নিয়ে শাহ তাকিয়ে রইলেন। আমার মনে হল, আমার দিকেই তিনি করুণ মিনতি ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন।

ওয়াজীর সাহেব পরোয়ানা দেখিয়ে বললেন: নতুন বাদশা শা তৃতীয় আব্বাশের হুকুমক্রমে আপনাকে বন্দী করা হোল।

ফৌজেরা এগিয়ে গিয়ে হাতকড়া লাগালো শা'কে। বেগম সাহেবার ঠোঁটের রক্ত যেন একটা মধুপ ভ্রমর অনেক আগেই শুষে নিয়ে গেছে।

ওয়াজির বললেন: বেগম সাহেবা, এ মহল এখন শা তৃতীয় আব্বাসের। আপনি এ মহল ত্যাগ করুন।

আশ্রয়হীনা একটা নারীর মতন বেগম সাহেবা ওয়াজীরের মুখের দিকে তাকালেন।

ওয়াজীর সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: "আগা, নতুন শা আসবেন ছুই প্রহরের মধ্যে। তুমি বেগম সাহেবার একটা ব্যবস্থা করে সমস্ত হারেমকে গুছিয়ে রাখ।"

শাহকে বন্দী করে নিয়ে চললেন ওয়াজীর সাহেব। হয় মৃত্যু নয় কারাগার, একটা কিছু হবেই। রাজনীতিতে ক্ষমা নেই। কাল যার একটি হুকুমে ছুনিয়া উঠতো বসতো, আজ সে পথের ভিখারী।

সাকীর জন্য যে বেদনা, যে সহানুভূতি অনুভব করেছিলুম, শা

তামাশ আর বেগম সাহেবার জন্য সেই একই বেদনা এবং সহানুভূতি-অনুভব করলুম। মনে হল, যাবার বেলা শাহকে শুনিয়ে দিই যে, আমার গুণাহ নেবেন না। আমি বান্দা। আমার ব্যক্তিগত রুচি-অভিরুচি নেই। আমি রাষ্ট্রের হুকুম তামিল করবার বান্দা মাত্র। আমি শাহেন শার বিশ্বস্ত হারেমের খোজা।

নতুন শা এলেন হারেমে। এলেন কি? তিনি হারেমের মধ্যেই ছিলেন। শা তামাশেরই বালক পুত্র তিনি। তাঁর বেগম নেই। আছে ধাত্রী, সে ধাত্রী নাদিরেরই নির্বাচিত। প্রকৃত পক্ষে সিংহাসন পেলেন তিনিই। কড়া আদেশ এল আমার উপর—হারেমে যেন বিন্দুমাত্র বেয়াদপি সহ্য করা না হয়। প্রাক্তন সকল বেগমকে কড়া নজরে রাখবার হুকুম দেওয়া হল। হারেমের উপর কর্তৃত্ব পেলেন নাদিরের নির্বাচিত ধাত্রীরা। মাঝে মাঝে নাদিরের নিজের দু-একজন বেগমও আসতে লাগলেন। দেখে আমার হাসি পেত। আভিজাত্যের ছাপ নেই তাদের মধ্যে। হারেমের রীতিনীতি জানে না। তবু আমরা সকলে 'বেগম সাহেবা' বলে তাদের সালাম জানাতুম।

নাদির যে ধাত্রীটি পাঠিয়েছিলেন বালক আব্বাসকে দেখাশুনা করবার জন্য, দুদিনেই হারেমের ঐশ্বর্য দেখে তার মাথা ঘুরে গেল। বয়স তার খুব বেশী ছিল না। মহলের বাদীদের কারণে অকারণে চাবুক কষে সে কর্তৃত্ব ফলাত। কড়া সিরাজী আনবার জন্য হুকুম হত প্রহরে প্রহরে। মদ খেয়ে বে-সামাল হয়ে যা ইচ্ছে তাই করত। বাঘহীন একটা বাঘিনীর মত গর্জাতো সে। নেশার ঘোরে কখনো কখনো নিজের কক্ষে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরতে বলত। আরো কিছু চাইত। কিন্তু আমার কাছ থেকে কিছুই না পেলে, আমাকে গালাগাল করত। চাবুক মারতো। শেষ রাতের দিকে যখনই সংবিত ফিরে আসতো, নিজের ভুল বুঝতে পারত সে।

আমি হারেমের প্রধান খোজা। আমার গুরুত্বের কথা ভেবে সে ভয় পেত। নাদিরের কাছে যে কোন সময় যদি নালিশ জানাই তবে তার গর্দান যাবে। সে এসে অনুনয় করতো, রাতের ঘটনা যেন আমি প্রকাশ না করি। রাতে আর দিনে নারীর বিচিত্র রূপ দেখে আমি স্তম্ভিত হতুম। লোকে ঠিকই বলে,—দিনকা কামিনী, রাতকা বাঘিনী।

দুনিয়ার হাওয়া পাল্টে যাচ্ছে। সে যার যোগ্য নয়, সে-ই বসছে সেইখানে। অসভ্য তুর্কোমান নাদির কর্তৃত্ব নিয়েছে নিজের হাতে রাজ্য চালাবার। শুধু শক্তি থাকলেই সব হয় নাকি? রুচি চাই না? সংস্কৃতি জ্ঞান চাইনা? শক্তি থাকলে তাণ্ডব করা যায়, রাজ্য চালানো যায় না?

দু-এক বছর নতুন শা আব্বাসকেই সিংহাসনে বসিয়ে দরবার চালাতেন নাদির। তারপর তাঁকেও আর সিংহাসনে বসাতেন না। শাহের প্রতিনিধি হিসাবে সিংহাসনে নিজেই বসতেন তিনি। আব্বাসের নামে নিজেই হুকুম দিতেন।

প্রথম প্রথম নাদিরের নির্দেশে শাকে সাজিয়ে গুছিয়ে দরবারে দিয়ে আসতুম আমি। তখন লক্ষ্য করতুম আমিরদের হাবভাব। তারা কেউ সন্তুষ্ট নয়। নাদিরকে দেখতুম কৃষ্ণশ্মশ্রু দীর্ঘকায় এক দৈত্যের মত। তাঁর রক্তবর্ণ চক্ষু আগুণের মত দরবারে জ্বলত। আমি তখনই জানতুম, আগুন জ্বলবে। আমিরেরা বিদ্রোহ করবে। রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।

আমার সন্দেহই সত্য হল। এদিক ওদিকে ইতস্তত বিদ্রোহ ঘটতে লাগল। কিন্তু ইরাণের সম্ভ্রান্ত বংশের মধ্যে যত রুচি তত শক্তি ছিল না। অভব্যতা মানবার তাদের ইচ্ছা না থাকলেও তাকে অস্বীকার করবার তাগদ ছিল না। ফলে নাদিরের রোষবহ্নিতে পুড়ে ছাই হতে লাগল অনেকেই। নিত্য নির্মম নিষ্ঠুরতার কাহিনী শুনতে পেতুম হারেমে বসে। আমি তখনই জানতুম, এই প্রহসন

অনেকদিন চালাবেন না নাদির। একদিন প্রকাশ্যে সমস্ত ক্ষমতা হাতে নিয়ে নিজেকে শা' বলে ঘোষণা করবেন।

ক্ষমতার চেয়ে উন্মাদনাকর নেশা আর কিছুতেই নেই। এমন কি ইরাণের সিরাজীতেও নেই। যে একবার তার স্বাদ পেয়েছে, সে পরিপূর্ণভাবে তাকে পেতে চাইবেই। নাদিরও চাইবেন, আমি জানতুম। কিন্তু অসভ্য হলেও একেবারে বুদ্ধিহীন ছিলেন না নাদির। তাই যতদিন পর্যন্ত না নিরাপদ বোধ করলেন, ততদিন নিজেকে শাহ বলে ঘোষণা করলেন না ; প্রায় ষোল বছর অপেক্ষা করলেন।

ইতিমধ্যে বালক আব্বাস ফুটে উঠছিলেন যৌবনের পথে। ফুটে উঠছিলেন কি, তাকে জোর করে ফুটিয়ে তুলছিলেন হারেমের রমণীরা। ইন্ধন জোগাচ্ছিলেন স্বয়ং ধাত্রী। বার বছর বয়স না হতেই সিরাজীর নেশাতে তাঁকে রপ্ত করালেন ধাত্রী সাহেবা। সুরসুরি দিয়ে দেহে যৌবন জাগাবার চেষ্টা করলেন। প্রতি রাত্রিতে একটা যৌবনপুষ্ট পুরুষ দেহের প্রয়োজন বোধ করতেন তিনি।

আমি খোজা। খোলা তরোয়াল হাতে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতুম। তবু ভেতরের কথাবার্তা আমার কানে আসতো। ধস্তাধস্তির শব্দ শুনতুম। কখনো উন্মত্ত অবস্থায় ধাত্রী সাহেবার হুকুম এলে ভেতরে যেতুম। দেখতুম, একখণ্ড পূর্ণ যৌবন নগ্ন অবস্থায় পড়ে আছে। নেশাগ্রস্ত বালক শা' উদগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন নারীর অদৃশ্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দিকে। তাঁর চক্ষু লাল। দেহ কম্পমান, বিহ্বল, দিশেহারা শা' আব্বাস। ধাত্রী আমাকে দেখে চিৎকার করে বলতেন : এই আফ্রিকার উল্লুক শা-কে শিখিয়ে দে, কি করে পুরুষ হতে হয়। আমি নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকতুম। আমার এই পুরুষত্বহীন খোজা দেহের মধ্যেও আন্দোলন দেখা দিত। হঠাৎ মনে হত, উন্মাদ হয়ে যাই। ঝাপিয়ে পড়ি। কিন্তু আমি কেনা গোলাম—হুকুমের চাকর, বান্দা, খোজা, কর্তব্য ছাড়া আমার জীবনে আর কিছু নেই।

আমাকে নিশ্চুপ দেখে ধাত্রী সাহেবা গালাগাল দিতেন, বিদ্রূপ করতেন। উঠে আমাকে লাথি মারতেন। তারপর সেই বিহ্বল শা'কে নাগিনীর মত জড়িয়ে ধরে শয্যার উপর জড়াজড়ি করতেন।

বাইরে এসে কিছুক্ষণ হাঁফাতুম। নিজেকে শান্ত করতুম। তারপর ভাবতুম। শা' আব্বাসের জন্য গভীর সমবেদনা অনুভব করতুম।

কিছুদিন পরে নাদিরেরই হুকুম অনুযায়ী প্রাক্তন এক শাজাদার ছোট্ট এক কন্যা নির্বাচিত হল আব্বাসের বেগমরূপে। সে বেচারী জড়োয়ার নক্সা করা শালোয়ার কামিজ পরে একদিন ঢুকলো—শাহের হারেমে। শা'কে দেখলো, তারপর আবার চালান হয়ে গেল নিজের আম্মাজানের ঘরে। লোকে জানলো, শাহের সাদি হয়েছে। দরবারে আমীরেরা উপঢৌকন দিয়ে গেলেন। সে উপঢৌকন উঠল নাদিরের ঘরে। আর সন্ধ্যার আগমণের সঙ্গে সঙ্গেই উন্মত্ত ধাত্রীর বাহু নিষ্পেষণে যন্ত্রণা পেতে লাগলেন শাহ আব্বাস।

এর পরিণতি কি, আমি জানতাম। একটা শিশু গাছকে বড় হবার আগেই মুচ্‌ড়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রাণরসের পাত্রকে ফুটো করে দেওয়া হচ্ছে। রোজ রোজ চুইয়ে পড়ছে রস। পাত্র অল্প দিনের মধ্যে নিঃশেষিত হবেই। যত তাড়াতাড়ি হয় শুধু সেই অপেক্ষা।

ইদানিং নাদিরের বেগমেরা নিজেরা বড় বেশী আসতে আরম্ভ করেছেন হারেমে। ক্ষমতা পেলে তাকে ঘিরে স্তাবক জমে। স্তাবকের স্তুতিতে নিজের শক্তি সম্পর্কে লোকের ভ্রান্তি জন্মে। অসীম বিলাসের দিকে নজর যায়। পশুপালক নাদিরের লেগেছিল সেই বিলাসের নেশা। সুন্দরী ইরাণী রমণীদের প্রতি তার দৃষ্টি যাচ্ছিল। ক্ষমতাশালী নাদিরকে সন্তুষ্ট করে স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তাঁকে দলে দলে সুন্দরী উপঢৌকন দিচ্ছিল স্বার্থপর নিচু লোকেরা। কারো বা উপহার ভাল লাগছিল নাদিরের। গ্রহণ করছিলেন। কারো বা উপহারকে ঠেলে ফেলে দিচ্ছিলেন। কিন্তু নাদিরের মন কেড়ে

নিয়েছিল সিরাজা। এদেশের একটি সদ্য প্রস্ফুটিতা যুবতী রমণী। নাম তার সিরাজাই। একদিন নাদিরের বেগমদের সঙ্গে সেও এল হারেম দেখতে।

আমি তাকে তাকিয়ে দেখলুম। সুন্দরী বটে সে, কিন্তু ক্রূর। তার নীল নয়নের কটাক্ষে যেন বিষ। অকারণে পুরাণো বেগমদের উপর তিনি চাবুক কষলেন। একজন বেগমের ঘরে বাঁদীদের দেখে হাঁকিয়ে দিলেন। সফাভিদ বেগমেরা উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকেই সালাম জানাল।

দূর থেকে মহলের বাগিচায় রুগ্ন শাহ আব্বাসকে দেখে বিদ্রূপ করলেন সিরাজাই: ফুল ফুটবার আগেই দেখি গাছের রস শুকিয়ে গেছে। এ গাছ ভেঙ্গে পড়ল বলে। এর মগডালে আর পাখি বসতে পাবে না।

বাগিচার প্রবেশ পথে দাঁড়িয়েছিলুম আমি। আমাকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন: এই উল্লুকটা তোর নাম কি?

আমি সালাম জানিয়ে বললুম: বেগমসাহেবা, এ বান্দার নাম আগা।

মুখ বাঁকিয়ে সিরাজাই বললেন: আহা উল্লুকের মত চেহারায় আবার আগা নাম। তা, হ্যারে আগা, ঐ যে শা'য়ের পাশে দাঁড়িয়ে ডব্‌গা মাগিটা, ও কে রে?

আমি বললুম: শাহের দাই।

হেসে সিরাজাই বললেন: দাই। আমি ভাবি বেগম বুঝি। তা দাইটা বুঝি শা'টাকে খুব চট্‌কাচ্ছে?

এর জবাব খোজা হয়ে আমি তো কিছু দিতে জানিনা। আমি চুপ করে থাকলুম। কিন্তু বুঝলুম, এ মেয়ের চোখ বড় তীক্ষ্ণ। সব বুঝে। হারেমে এসে এ একদিন নিশ্চয়ই খবরদারি করবে। নাদিরের উপর এর প্রভাব নিশ্চয়ই সর্বাপেক্ষা বেশী। শুধু সুন্দরী হলেই

হয় না, হাস্যে লাস্যে যে রমণী হতে পারে, পুরুষকে বস করতে পারে সে-ই। নাদিরের আগের বেগমরা গাঁয়ের মেয়ে, পুরুষের মন ভুলানোর কলাকৌশল তারা কিছু জানেনা। বুঝলুম, হারেমের মুখ্য মহলের পালঙ্ক অধিকার করবেন এই শিরাজাই।

দিনে দিনে শাহ তৃতীর আব্বাস শুকিয়ে উঠছিলেন। আমি বুঝতুম, জীবন পাত্র যার ফুটো হয়ে গেছে, সে বাঁচবে কি করে। এই জন্যেই বুঝি একজন সুন্দরী ধাত্রী পাঠিয়েছিলেন নাদির—শাহ আব্বাসের জন্য। দেখতুম শাহের চোখের নিচে কালি পড়ে গেছে। গাল ভেঙে গেছে। মুখে পাণ্ডুর ছায়া। অপরাহ্নে আর এসে বাগিচাতেও বসতে পারতেন না তিনি। শয্যা নিলেন। নিজের বেগমকেও তাঁর কাছে আসতে দেওয়া হোলনা। আর সেই বেগম সাহেবা কিইবা বোঝেন? একদিন দুপুর রাতে বুক ধড়ফড় করে শা' মারা গেলেন। শাহের আম্মাজান নিজের মহল থেকে সংবাদ পেয়ে কেঁদে উঠলেন। নিজের পুত্রের কাছেও তাঁকে আসতে দেওয়া হোত না। হায়রে উপরতলার মানুষের দুঃখ! আমি খোজা ছাড়া সে দুঃখের স্বরূপ আর কেউ দেখেনি। সংবাদ গেল নাদিরের কাছে। তিনি মূল্যবান কফিনের কাপড় পাঠিয়ে দিলেন হারেমে। বাঁদী বেগমেরা শোক প্রকাশের জন্য কালো বোরখা পড়লেন। এই বিরাট হারেমে—মুষ্টিমেয় কয়েকজন শুধু আত্মীয় বিয়োগে কেঁদে বুক চাপ্ড়ালেন। নতুন বেগম সাহেবার স্বামীর ঘর পর্যন্ত করা হল না। মিছিল করে শবাধার নিয়ে যাওয়া হল শাহী কবরখানায়। নাদির শেষকৃত্যে কোন কার্পণ্য করলেন না।

কিন্তু আব্বাস যখন চললেন কবরে, সেই মুহূর্তে নাদির কুলি 'নাদির শাহ' নাম ধারণ করে স্বয়ং বসলেন সিংহাসনে। শোকের পাশাপাশি হল আনন্দ উৎসব।

আমি হারেমের প্রধান খোজা। আমার কাছে হুকুম এল

হারেম গুছিয়ে রাখবার। স্বয়ং নাদির এবার হারেম তদারক করে নিজের বেগমদের দুর্গ-প্রাসাদে নিয়ে আসবেন।

হিজ্‌রি ১১৩৩ সাল। দ্বিপ্রহরে স্বয়ং নাদির এলেন অভিষেকের পর হারেমে। মোল্লারা এইমাত্র তার নামে খুত্‌বা পাঠ করেছেন। টাকশালে নাদিরের নামে নতুন মুদ্রা তৈরী হবার আদেশ গিয়েছে।

দীর্ঘকায় নাদির ঢুকলেন দ্বিপ্রহরে হারেমে। তাঁর কৃষ্ণ শ্মশ্রু, উন্নত নাসিকা, রক্তবর্ণ চক্ষু। মাথায় পড়েছেন মণিমাণিক্য খচিত তাজ সদৃশ দীর্ঘ শিরস্ত্রান। হাতে রাজদণ্ড। আমি হারেমের প্রধান খোজা—তাঁকে প্রথম কুর্নিশ জানালুম। সারি বেঁধে অন্যান্য খোজারা নতুন শাহকে সালাম জানাল। বাঁদীরা ভূমিতে গড়াগড়ি খেয়ে নাদিরের পদচুম্বন করল। নাদির সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর আমাকে বললেন: আগা সমস্ত বেগম মহল আমাকে ঘুরিয়ে দেখাও।

আমি জানি, এ নির্দেশের অর্থ কি। ঘুরে ঘুরে সমস্ত বেগমদের নাদির দেখবেন। যদি কারো এখনো যৌবন অটুট থাকে, চোখে মদির দৃষ্টি থাকে, বক্ষে উন্নত স্তনযুগল থাকে, যদি তার মুখ-লাবণ্য শাহের মন আকর্ষণ করে, তবে তাকে তিনি বেগমের মর্যাদা দেবেন, হারেমের বেগম মহলে থাকতে দেবেন। কখনো কোনদিন খেয়াল হলে নিশিথে আসবেন অভিসারে। বুভুক্ষু কোন বেগম হয়তো একদিনের জন্যও একটা পুরুষ দেহের স্পর্শ লাভ করে তার নারী-জীবন সার্থক করবেন। বাঁকি জীবন সিরাজী পান করে প্রতি সন্ধ্যাতে উন্মাদ হবেন। পুরুষের আকাঙ্ক্ষায় পাগল হয়ে বাঁদীদের চাবুক কষবেন, হয়তো অক্ষম খোজাদের ধরে পীড়ন করবেন সাহচর্য দেবার জন্য; হায়রে বড় মানুষের জীবন!

যে বেগমদের শাহের পছন্দ হবেনা, তাদের তৎক্ষণাৎ হুকুম দেবেন বাঁদী মহলে নামিয়ে দেবার জন্যে। বাঁদিরা হাসাহাসি করে বেগমদের

হাত ধরে তাকে নিয়ে যাবে বাঁদী মহলে। কাল যে সহস্র বাঁদীকে হুকুম করতো, আজ সে তাদের বিদ্রূপ শুনবে। হয়তো বা নতুন বেগমদের চাবুক খাবে। খাবেই, কারণ, পূর্বতন এইসব বেগমদের প্রতি নতুন বেগমদের দারুন আক্রোশ থাকে.

নাদির আমাকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেগম মহল দেখলেন। অধিকাংশ বেগমকেই তাঁর পছন্দ হল না। সঙ্গে সঙ্গে বাঁদীরা তাদের নামিয়ে নিয়ে গেল বাঁদী মহলে। দু-এক জন যৌবনবতী বেগম ওড়না ফাঁক করে নাদিরের দিকে তাদের সম্পূর্ণ মুখটা ভাল করে মেলে ধরলেন। কারো বা চোখে আকূতি ভরা দৃষ্টি ফুটে উঠল। নৈবেদ্যের মত সমস্ত রূপের ডালি তারা শাহের ভোগের জন্য উৎসর্গ করতে উন্মুখ: শাহ তাদের গ্রহণ করে ধন্য করুন। দু একজন বেগমকে শাহ রাখলেন। রাখলেন শাহ তৃতীয় আব্বাসের বালিকা বধূকে। তার দেহের উপর সবেমাত্র নতুন পাতার মত রং ধরছিল। একটা ধৃত পাখির মত নাদিরকে দেখে কাঁপছিলেন তিনি। নাদির তাকে হারেমে থাকবার অনুমতি দিলেন।

কি ভাবলেন নাদির তিনিই জানেন। হয়তো ভাবলেন, একদিন এ-ফুল ফুটে উঠলে অত্যন্ত মনোরম হবে। পাগল করা গন্ধ ছড়াবে। সেইদিন নিজের ফুলদানিতে নিয়ে তুলবেন এঁকে।

হায়! শাহী মহলের রমণীরা ফুল ছাড়া আর কি? যখন ফুটে উঠেন, যখন তারা খোসবাই ছড়াতে পারেন, তখন তাদের আদর। শাহের ফুলদানীতে তারা আশ্রয় পান। শুকিয়ে গেলে মূল্য নেই, ছুঁড়ে ফেলে দেন বাইরে, নিচে বাঁদীদের মহলে। আবার সেখানে যদি কোন ফুল গন্ধ নিয়ে ফুটে উঠে, সে চলে আসে শাহী হারেমে।

অপরাহ্নে নাদির বেগমমহলে ঢুকলেন সদলবলে। এলেন বেগম সাহেবারা। যারা কোনদিন পারস্যের মাঠে প্রান্তরে পশুচারকের শিবিরে কাটিয়েছে, মশকে করে জল এনেছে ছোট্ট

ঝর্ণা থেকে গৃহকর্মের জন্য, তারা আজ শাহী মঞ্জিলে দুনিয়ার বিস্ময়কর রাজপ্রাসাদে দিন যাপন করবেন। ভাগ্যের কি অদ্ভুত প্রহসন, কি অদ্ভুত খেলা!

আমি খোজা, আমি নীরব সাক্ষী। আমাকে সবই গ্রহণ করতে হবে। আমার ব্যক্তিগত আবেগ, সোহাগ, ভালবাসা, স্নেহ, মমতা, কিছুই থাকতে নেই।

নাদির হারেমে ঢুকেই আমাকে বললেনঃ আগা, বেগম সাহেবাদের যথাযোগ্য মহলে তুমি তাদের রেখে এস।

সে-কথা শুনে শাহকে সালাম জানিয়ে একে একে আমি বেগম সাহেবাদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলুম। তাদের বয়স এবং সৌন্দর্য বিচার করে একে একে প্রত্যেককে আমি যথাযোগ্য মহলে স্থান করে দিলুম। মুখ্য বেগমের মহলে নিয়ে গেলুম সিরাজাই বেগমকে।

শাহ নাদির এতক্ষণ আমার কাজ দেখছিলেন। সিরাজাই বেগমকে মুখ্য বেগমের মহল দিতে তিনি আমার উপর যার পর নাই সন্তুষ্ট হয়ে বললেনঃ আগা, আমি পূর্বে তোমার কথা শুনেছিলুম। এখন তোমার কর্মতৎপরতা দেখলুম। তুমি যথাযোগ্য স্থানে প্রত্যেক বেগমকে স্থান দিতে পেরেছ। তোমার বিচার বুদ্ধির তারিফ করছি। তোমাকে এ-জন্যে আমার রত্ন-অঙ্গুরীটি উপহার দিচ্ছি। এ রত্ন-অঙ্গুরীর বলে ইরাণের সর্বত্র তোমার অবাধ যাতায়াতের অধিকার থাকবে। তোমাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি?

আমি আভূমি নত হয়ে ইরাণের দরবারী নীতি অনুসরণ করে শাহের পদচুম্বন করে বললুমঃ শাহেন শা, এ বান্দার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারেন। আমি শাহী মহলের জন্য উৎসর্গীকৃত-প্রাণ—এক সামান্য খোজা। আমার চরিত্র ভূমির মত। যে দখল করে আমি তার। আমি রাষ্ট্রশক্তির অনুগত একজন ভৃত্য মাত্র।

নাদির বললেনঃ তোমার কথা শুনে পূর্বেই আমি তোমার উপর

প্রীত ছিলাম। এখন আরো খুসী হলাম। রুচি সম্পন্ন খোজা। তুমি হাফিজ, সাদী প্রভৃতি পড়তে পার। সমস্ত হারেমের উপর তোমার অপ্রতিহত ক্ষমতা থাকল। আমি আশা করি তোমার তত্ত্বাবধানে হারেমে শৃঙ্খলা ও শান্তি বিরাজ করবে।

আমি কুর্নিশ জানিয়ে বললুম: শাহের মেহেরবানী থাকলে আমার কর্তব্য আমি সুষ্ঠুভাবে পালন করবার চেষ্টা করব।

শাহ খুসী হয়ে দরবারের দিকে চলে গেলেন।

শাহ আমাকে হুকুম দিয়ে গেলেন হারেমে শান্তি অক্ষুন্ন রাখতে। কিন্তু প্রথমেই আমি সমস্যায় পড়লুম সিরাজাই বেগমকে নিয়ে। এই নীলনয়না ইরাণী রমণীটি অত্যন্ত ক্রুর এবং ষড়যন্ত্র পটু। অপরের সৌভাগ্যে এত ঈর্ষাকাতর নারী আমি আমার জীবনে কোনদিন দেখিনি।

শাহ হারেম ত্যাগ করতে না করতেই সিরাজাই বেগম আমাকে তাঁর মহলে তলব করে পাঠালেন।

আমি গিয়ে কুর্নিশ করে দাঁড়াতেই তিনি বললেন: আগা, সর্বপ্রথমই তোমাকে আমার কতকগুলি নির্দেশ দেবার আছে।

আমি বললুম: হুকুম করুন বেগমসাহেবা।

বেগম বললেন: আমার প্রথম নির্দেশ এই যে, সফাভিদ কোন বেগম যেন ভবিষ্যতে শাহ কুলির চোখের সামনে বের হতে না পারে, তুমি সেই ব্যবস্থা করবে। আর দেখতে হবে, কোন বান্দা বাঁদী যেন ঘুণাক্ষরেও কখনো কোন সুন্দরী বেগমের কথা শাহের কানে না তুলতে পারে। সুন্দরী যে-সব অল্প বয়েসের বাঁদী আছে, তাদের তুমি জবাব দাও। ডবগা বাঁদীদের বিশ্বাস নেই। তারা চোখে চোখে ঘুরে বেড়ায় শাহের নজরে পড়বার জন্য।

আমি বললুম: বেগম সাহেবার হুকুম তামিল করা হবে।

বেগম বললেন: হ্যাঁ, আমার হুকুম মত চলবে। যদি আমাকে

খুস মেজাজে রাখতে পার, তবে অনেক বক্‌শীস তোমাকে দেওয়া হবে। কিন্তু আমার হুকুম যদি তামিল না করা হয় তবে তোমাকে জীবন্ত পুঁতে কুত্তা দিয়ে খাওয়াব। হারেমে নিয়ে আসব সুন্দর আর্মেনীয় খোজা। তোমার মত কুৎসিৎ খোজাকে রাখা হয়েছে শুধু মাত্র তোমার যোগ্যতার কথা শুনে।

আমি সালাম জানিয়ে চলে যাচ্ছিলুম—বেগমসাহেবা আমায় ডাকলেন—হ্যা, শোন। শুনেছি তুমি হাফিজ, সাদী, রুমি, জামি সব পড়েছ। আমার কাছে কাব্য মোটে ভাল লাগে না। কখনো ও-সব আবৃত্তি করবে না। আমি শুধু চাই কাজ আর কাজ। এমন কাজ যে কাজে আমার উন্নতি হবে। যাও।

বেগম সাহেবাকে সালাম জানিয়ে আমি বাইরে এলুম। তখনো আমি ঘামছিলাম। আফ্রিকার একটা সিংহের মুখে পড়লেও বোধ হয় আমার এত অস্বস্তি হত না। স্বয়ং শাহ চোখ রাঙালেও এতটা ঘাবড়ে যেতাম না বোধহয় আমি। কিন্তু রমণীদের আমি অনেকটা চিনেছি। ক্ষমতাভিলাসী সম্ভোগপ্রত্যাশি রমণীরা বাঘিনীর চেয়ে হিংস্র হয়, সিংহের চেয়ে দুর্ধর্ষ হয়, শয়তানের চেয়ে ক্রূর হয়। তারা করতে পারে না হেন অপকর্ম নেই—বিশেষ করে সে যদি সুন্দরী দুষ্টা রমণী হয়।

শাহ নাদিরের যদি কোন বিপদ ঘটে, তবে তা এই সিরাজাই বেগম থেকেই ঘটবে। এর মোহে রূপমুগ্ধ শাহ পাগল। সিরাজাই বেগমের উপর কারো পরামর্শই শাহের কর্ণে গিয়ে পৌঁছোবে না।

এর একমাত্র দাওয়াই হতে পারে সিরাজাই বেগমের চাইতেও সুন্দরী আর কূটকৌশলী কোন রমণী যদি শাহের দৃষ্টিপথে পতিত হয় তবেই।

কিন্তু সেকি সহজে সম্ভব ?

॥ দুই ॥

সিংহাসনে বসেই নাদির ভয়ানক অশান্তির মধ্যে পড়লেন। পশুচারককে সহজে তাদের প্রভু বলে মেনে নিতে অনেকেই রাজী হতে চাইল না। বিদ্রোহ করল সফাভিদ আমিরেরা, কিজিবিলাসেরা, এবং আফগানেরা। হারেমে বসে আরামে দিন যাপন করবার ফুরসৎ পেলেন না নাদির। ঘোড়ার পিঠে চেপে, শিবির নিয়ে, সামন্ত নিয়ে, তৎক্ষণাৎ বের হতে হল বিদ্রোহ দমনের জন্য। উল্কার বেগে ছুটতে হল এ প্রান্ত থেকে সে প্রান্তে। যাবার আগে সিরাজাই বেগমের মহলে এলেন তিনি।

রূপের মোহ জগজ্জয়ী বীরও কি অস্বীকার করতে পারেন? সিরাজাই বেগমের রূপের জালে নাদির আবদ্ধ। সারা রাত কাটালেন তিনি বেগমের মহলে। সেদিন বেগমের সাজসজ্জা দেখেছিলুম আমি। নীল নয়নের পাতায় তিনি এঁকে দিয়েছিলেন কাজল-সুর্মার রেখা। দীর্ঘ বিনুনী পাকিয়ে তাতে গুজে দিয়েছিলেন বস্‌রার গোলাপ। উত্তুঙ্গ বক্ষযুগল কাচুলীতে সুন্দর করে বেঁধেছিলেন। হিন্দুস্থানের মস্‌লিনের ওড়না পরেছিলেন। যেন একটা কাঁচের পোষাক, যার মধ্যে দিয়ে সব দেখা যায়। দেখা যায় মোমের মত নরম ত্বক্‌, মসৃণ নিতম্ব প্রদেশ, সুডৌল বাহু, সব।

নাদির প্রবলভাবে সেদিন সিরাজাই বেগমের দেহের জন্য আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন। ভারে ভারে সিরাজী নিজে হাতে ভৃঙ্গারে করে ঢেলে দিয়েছিলেন তিনি নাদিরের পানপাত্রে। নাদির বলেছিলেন: তুমি কেন? বাঁদীরা কই?

বেগম চোখে ঠমক টেনে বলেছিলেন: আমার প্রিয়তমের পরিচর্যার ভার কি বাঁদীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায়? তাই আমি নিজে হাতেই সব করছি শাহেন শা।

বাইরে থেকে সে-কথা শুনে আমি বুঝেছিলুম, আজ বেগম সাহেবা নাদিরকে দিয়ে তাঁর কোন উদ্দেশ্য হাসিল করতে চান। সে-উদ্দেশ্য কি হতে পারে? সিরাজ্জাই বেগমকে অদেয় নাদিরের কি আছে? আমি শিউরে উঠেছিলুম। নিশ্চয়ই আজ রাতে ভয়ঙ্কর কোন একটা কিছু তিনি নাদিরের কাছে চাইবেন।

বলিষ্ঠ পুরুষ নাদির সেদিন নিতান্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন মোহিনী সিরাজ্জাই বেগমকে দেখে। তিনি সারারাত বেগম মহলে কাটাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

শাহ আমাকে ডেকে বলেছিলেনঃ আগা, আজ সারা রাত আমি এখানে থাকবো। তুমি স্বয়ং দুয়ারে প্রহরী থাকবে।

আমি বলেছিলামঃ শাহেন শা, আপনি নিশ্চিন্তে বেগম মহলে নিশি যাপন করুন, আমার দেহে একবিন্দু রক্ত থাকতে কর্তব্য পালনে আমি ত্রুটি করব না।

বেগম মহলের দুয়ারে রেশমী পর্দা নেমে গিয়েছিল। মশালের আলোতে উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে সেদিন আমি সারা রাত মুখ্য বেগমের মহল পাহারা দিয়েছিলুম।

ভোরবেলা নাদির বেরিয়েছিলেন হারেম থেকে। সেই দৈত্য সদৃশ পুরুষের চোখের কোণেও সেদিন আমি কালি দেখেছিলুম—সারারাত উচ্ছৃঙ্খল বিলাসের কলঙ্ক চিহ্ন।

জড়িত আলস্যের দেহ নিয়ে নাদির ভোর বেলা বাইরে এসে দাঁড়িয়ে দেখেছিলেন, মশালের আলোর নিচে আমি একটা পাথরের মূর্তির মত উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে দুয়ারে দাঁড়িয়ে। বাইরে তখন সেনা শিবিরে সিঙা বাজছিল। এখনি সেনাবাহিনী অভিযানে বেরিয়ে পড়বে, শুধুমাত্র শাহের অপেক্ষা।

নাদির বাইরে এসে আমাকে বলেছিলেনঃ আগা তোমার কর্তব্যনিষ্ঠাতে আমি খুব খুসী হয়েছি। আমি বাইরে যাচ্ছি

বিদ্রোহীদের দমন করতে। ফিরে এসে তোমাকে যথাযোগ্য পুরস্কৃত করব। তবে আমার শত্রু শুধু বাইরে নয়, ভেতরেও আছে। হারেমের দিকে তুমি সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। আর বেগম সাহেবা যে হুকুম করবেন, তা তামিল করবে।

আমি বুঝলুম, বেগম সাহেবা তুরুপের তাস তাঁর নিজের হাতেই তুলে নিয়েছেন। সারারাত ভরে নাদিরকে সন্তুষ্ট করে তাঁর কাছ থেকে নিশ্চয়ই তিনি কোন বিশেষ অধিকার চেয়ে নিয়েছেন। সে অধিকার হয়তো তাঁর অনুপস্থিতিতে হারেমের উপর বেগম সাহেবার একচেটিয়া কর্তৃত্বের দাবি। তেমনি দাবি তিনি যদি করে থাকেন, তবে সে দাবি কেন করেছেন? আমি নিজের মনে পূর্বাহ্নেই একটা অমঙ্গলের আশঙ্কা করে রাখলুম। সিরাজাই বেগমের স্বার্থ কখনো নির্ভেজাল সাধারণ মানুষের স্বার্থের মত হতে পারে না। তার আনন্দ পৈশাচিকতায়, তার উল্লাস নির্যাতনে।

নাদির দুর্ধর্ষ কিন্তু তত হিংস্র নন। সিরাজাই বেগমের স্বভাব নেকড়ের মত। কারণে অকারণে অপরের ক্ষতি করতে পারলেই তার আনন্দ। এই ক্রুর রমণীর প্রভাব যদি নাদিরের উপর অনবরত পড়তে থাকে, তবে দুর্ধর্ষ নাদির হয়তো হিংস্র স্বভাবের একটা দৈত্যে পরিণত হবেন। খুদাতালা জানেন, ইরাণের মানুষের কপালে কি আছে! নিজের জন্য আমি ভাবিনা কিছু। আমি অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন ভবিষ্যৎহীন এক খোজা। আমি বেঁচে আছি কেন, কি কারণে, বুঝিনা। জীবন স্পন্দনেরই বোধহয় একটা বিশেষ আকর্ষণ আর আনন্দ আছে। আমি বুঝি সেই জন্যই শুধু বেঁচে আছি। নইলে আশাহীন এই জীবনের বোঝা বয়ে নিয়ে খোজারাও বেঁচে থাকে কেন? আমি বেঁচে আছি, এই মাত্র। মরে গেলে খুব বিরাট একটা শোক আফসোস নেই। সুতরাং আমার নিজের জন্য আমার চিন্তা নাই। চিন্তা মানুষের জন্য, যাদের দুঃখবেদনা বোধআছে,তাদের জন্য।

নাদির হারেম ত্যাগ করে চলে গেলেন। রাজপথ অশ্বখুরের শব্দে উচ্চকিত হয়ে উঠল। সেই মুহূর্তে আকাশ আলো করে সূর্য উঁকি দিল পূব আকাশে। সঙ্গে সঙ্গে মহলের ভেতর থেকে বেগম সাহেবার ডাক শুনলুম : আগা!

বললুম : হুকুম করুন বেগম সাহেবা!

—বাঁদীদের শীষমহলে পানি দিতে বল, আমি গোছল করব। বুঝলুম, সারারাতের পঙ্কিল তিনি দিনের বেলা ধুয়ে ফেলতে চাচ্ছেন। একটা পুরুষ সিংহকে বশ করে তাঁর কাছ থেকে মনের মত বর চেয়ে নেবার মূল্য ক্ষুদ্র হতে পারে না। অনেক মূল্য তাকে দিতে হয়।

কিন্তু এই মূল্যের বিনিময় যে বেদনা, একথা আমি বলতে পারি না। মদ খেলে, বুক জ্বলতে জ্বলতে পানীয় ভেতরে যায়। কিন্তু তবু লোকে মদ খায়। একটা ঝির ঝির নেশার আনন্দ। পুরুষকে দেহ সম্ভোগ করতে দিলে ব্যাথা পেলেও তেমন একটা নেশার আনন্দ নারীরা পায় বুঝি। তাই প্রতি সন্ধ্যায় দেখি বেগম মহলে দেহ দান করবার জন্য বাঁদী থেকে বেগম, সকলের সেকি উন্মত্ত উন্মাদনা। এই সিরাজাই বেগম কোনদিন নাদির তাঁর হারেমে না এলে ছটফট করেন। পানপাত্র ভাঙেন। বাঁদীদের চাবুক কষেন। আমায় কুৎসিৎ ভাষায় গালাগাল করেন। তারপর আকণ্ঠ সিরাজী পান করে চেতনা হারাতে চান। সেই নেশাগ্রস্ত নারীমনের ব্যাকুল আর্তনাদ আমি শুনতে পাই তার অস্ফুট আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করার মধ্যে। বেগম সাহেবা নিজেই জানে না তার অবচেতন মনে কি আছে। তিনি বিড় বিড় করে বলেন : আঃ কি বলিষ্ঠ চেহারা ঐ আগার! যদি ও উল্লুকটা পুরুষ হত!

সারারাত বেগম সাহেবা পুরুষের সান্নিধ্য না পেলে ছটফট করেন। আগুনে ঝলসানো একটা রুগীর মত বিছানার উপর এপাশ

থেকে ও পাশে গড়িয়ে যান। বাইরে দাঁড়িয়ে আমি তার ছটফটানীর শব্দ শুনি।

কিন্তু যে-দিন নাদির আসেন, সেদিন প্রথম রজনীর উন্মাদ দেহ বিলাসের পর তিনি নিস্তেজ হয়ে পড়েন, ঘুমান। পরদিন খোস্ মেজাজে বাইরে এসে আমার সেলাম নেন।

আজও তার মেজাজ খুস্ ছিল। দেহ তার তৃপ্ত। এবার একটু শীতল জলে স্নান করে তিনি শান্তি চান। কাল সারারাত ঘুম হয়নি, আজ সারাদিন তিনি ঘুমোবেন।

বেগম সাহেবা বাইরে এলে আমি তাকে সালাম জানালুম। বাঁদীর কাঁধে হাত রেখে তিনি গোছল খানায় গেলেন।

বেগম সাহেবা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি তেমনি মহলের দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকলুম। শীতল গোলাপ জলে স্নান করে, শীষ্ মহলের সহস্র প্রতিবিম্বে নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সহস্রবার ভাল করে দেখে, সর্বাঙ্গে ফুলের নির্যাস ছড়িয়ে, বেগম সাহেবা মহলে ফিরে এলেন। আমায় দেখে বললেন ঃ আগা, তুমি এবার যাও, বিশ্রাম কর। সন্ধ্যাবেলা আমার সঙ্গে ভেট করবে।

আমি খোজা বটে, কিন্তু রক্তমাংসের দেহধারী মনুষ্যাকৃতি একটি জীব। মানুষের মত আমার মন আছে, প্রাণ আছে, আবেগ আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু আশা নেই। মানুষেরই মত আমার দেহেও ক্লান্তি আছে। সমস্ত রাত্রি জাগরণে আমার দেহে ক্লান্তি নেমেছিল। বেগম সাহেবাকে সেলাম জানিয়ে আমি আমার ঘরে ফিরে এসে শয্যায় এলিয়ে পড়লুম।

কিছুক্ষণ শরীরটাকে আয়েস দিয়ে আবার উঠলুম আমি। গোছল খানায় গিয়ে গোছল করলুম। খানা সারলুম। তারপর ঘুমোতে গেলুম। আমি খোজা, নিশাচর প্রাণী, কুকুরের মত দিনের বেলা আমি ঘুমোই। রাত্রিবেলা জেগে প্রভুকে পাহারা

দিই। কুকুরের মতই আমি প্রভুভক্ত। নইলে খোজা হওয়া যায় না।

কিন্তু সেদিন আমার ভাল ঘুম হল না। মনের মধ্যে কি এক আশঙ্কা আমার টিব্ টিব্ করছিল। অসংলগ্ন কত স্বপ্ন দেখলুম সেই দিবানিদ্রার মধ্যে। দেখলুম নাদিরের বাহিনী উল্কার বেগে ইরাণের এ প্রান্ত থেকে সে প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছে। সহস্র সহস্র ছিন্ন মুণ্ড গড়াগড়ি যাচ্ছে ইরাণের সবুজ মৃত্তিকার উপর। দেখলুম, ঢেউ খেলানো পাহাড়ের সারি। দেখলুম শ্বেতশুভ্র বরফাচ্ছাদিত আফগান পর্বতশ্রেণী। বরফ গলে স্রোত ছুটলো। সে স্রোতের রং লাল। দেখলুম আলুলায়িতাকেশ সিরাজাই বেগম ছুটে বেড়াচ্ছেন তরবারি হাতে নিয়ে হারেমের চত্বরে। কালো শিরা শিরা দাগ সফাভিদ বেগমদের মুখে। তারা হায় আল্লা! হায় আল্লা বলে করুণ চিৎকারে ক্রন্দন করছেন।

অপরাহ্নে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। জেগে উঠে আমি খুদাতালাকে স্মরণ করলুম। এ দুঃস্বপ্ন যেন একটা অমঙ্গলের পূর্বাভাষ।

যে-দিন সফাভিদ বংশের দ্বিতীয় তামাশকে নাদির গদিচ্যুত করে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিলেন, তার পূর্বদিন এমন সব অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিলুম। যেদিন শা তৃতীয় আব্বাসের মৃত্যু হল সে-দিনও আমি এমন বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছিলুম।

ঘুম ভেঙে আমি অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়েছিলুম। আল্লা জানেন কি ঘটবে।

সন্ধ্যাবেলা আমি নৈশ-পোষাক পরে বেগম সাহেবার মহলের কাছে গেলুম।

আরাম কেদারায় দেহ এলিয়ে দিয়ে বাঁদীর হাত থেকে পানপাত্র নিয়ে ধীরে ধীরে পান করছিলেন বেগম সাহেবা। বাইরে আমারু

উপস্থিতি টের পেয়ে ডাকলেন: আগা, ভেতরে এস। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

আমি পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকে বেগম সাহেবাকে কুর্ণিশ জানালুম।

সিরাজাই বেগম শেষ পানপাত্র বাঁদীর হাত থেকে নিয়ে তাকে ধমকে উঠলেন: এই উল্লুকটা, এবার পালা। আগার সঙ্গে আমার গোপন কথা আছে।

সঙ্গে সঙ্গে বাঁদীটা ছুটে পালাল। যাবার আগে আমার দিকে সে তেরছা ভাবে তাকিয়ে একটু হেসে গেল। সে হাসির মধ্যে কি কোন ইঙ্গিত ছিল? সে কি আমাকে বোঝাতে চেয়েছিল যে, নিশাসঙ্গী করবেন আমাকে বেগম সাহেবা? উন্মাদ বেগমদের উন্মাদনার পরিচয় ইতিমধ্যে আমি পেয়েছি: অক্ষম খোজার কাছে পুরুষত্ব দাবি করে তারা কত না নাজেহাল করেন খোজাদের। সে অস্বস্তি, অপমান, সে লজ্জার চেয়ে মৃত্যুও শতাধিক শ্রেয়। আমার বুকের মধ্যে শঙ্কিত রক্ত উদ্বেলভাবে কাঁপতে লাগল।

বেগম সাহেবা আমাকে বললেন: আগা, আমি তোমাকে যে হুকুম করব তা পালন করতে পারবে?

কি আদেশ কে জানে! যদি বলেন নৈশ-বিহার করব তোমার সঙ্গে, তবে? ভেতরে ভেতরে আমি কাঁপতে লাগলুম।

বেগম সাহেবা আমাকে তাঁর পরিকল্পনার কথা বললেন।

এর চাইতে যদি নৈশ বিহারে অভিলাস প্রকাশ করে বুভুক্ষু বেগমদের মত আমাকে চরম লাঞ্ছনা করে লজ্জা দিতেন, সেও বুঝি ভাল হোত। তাঁর ভয়ঙ্কর পরিকল্পনার কথা শুনে আমার হাত পা আড়ষ্ট হয়ে এল।

বেগম সাহেবা বললেন: সমস্ত সফাভিদ বেগমদের আমার কাছে ধরে নিয়ে আসতে হবে। যে-কয়েক জনের এখনও সুন্দর

যৌবন আছে, তাদের চোখ উপরে নিয়ে মুখের উপর গরম লোহা দিয়ে দেগে দিতে হবে। বাঁকিগুলোর মুখে গরম লোহার কালশিরা পরিয়ে দিলেই হবে।

অমন পৈশাচিক পরিকল্পনার কথা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। এ পরিকল্পনাতে কিছুতেই আমার মন সায় দিল না। বেগম সাহেবাকে ফেরাবার জন্যে বললুম: —কিন্তু শাহেন শা ফিরে এসে যদি এতে রাগ করেন ?

খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলেন বেগমসাহেবা: বেকুব! শাহেন শা! শাহেন শা আমার নির্দেশের বাইরে কখনো যেতে পারেন? শাহেন শা সমস্ত ইরাণের অধীশ্বর। আমি শাহেন শার অধীশ্বরী। যা বললুম—তাই কর। সফাভিদ বেগমদের এখানে নিয়ে আয়।

তবু আমি তাকে ফেরাবার চেষ্টা করে বললুম: বেগম সাহেবা, কাউকে শাস্তি দিতে গেলে কারণের প্রয়োজন আছে। বেগম সাহেবাদের অন্ধ করে দেবার জন্যে কি কৈফিয়ৎ দেবেন?

অট্টহাসি হেসে সিরাজাই বেগম বললেন: নাদিরের বেগম কারো কাছে কৈফিয়ৎ দেয় নাকি রে? তবু, হ্যা? যখন বলছি, কৈফিয়ৎ দিচ্ছি। বেগমেরা নাদিরকে হত্যার পরিকল্পনা করে ছিলেন।

—দেখলুম পিশাচের মত পৈশাচিক উদ্ভাবনী ক্ষমতা সিরাজাই বেগমের আছে। সেই মুহূর্তে আমার মনে পড়ল ম্রিয়মাণ সেই সব বেদনার্ত সফাভিদ বেগমদের কথা। নাদির যেদিন হারেমে ঢুকেছিলেন, কি করুণ আকূতি ভরা দৃষ্টিতে তারা তাকিয়ে ছিলেন নাদিরের দিকে। সেই হতভাগ্য সহায়হীন কয়জন বেগমের নাদিরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবার সাহস কখনই হতে পারে না। এ-সব অভিযোগ সিরাজাই বেগমের মনগড়া অভিযোগ। আসলে

তিনি ভয় পান সফাভিদ বেগমদের। উগ্র সৌন্দর্যের পরিপুষ্ট যৌবন তাদের নাও থাকতে পারে, কিন্তু শান্তশ্রী একটা লাবণ্য আছে তাদের মধ্যে। পুরুষের মনে তা কখনো রেখাপাত করতেও তো পারে?

পুরুষ শুধুমাত্র যৌন উপভোগই চায়না তো রমণীর কাছ থেকে। কেউ কেউ ভালবাসাও চায়। হঠাৎ যদি নাদির ভালবাসতে চান কাউকে? তাই সফাভিদ বেগমদের হৃতশ্রী কুৎসিৎ করে রাখতে চান সিরাজাই বেগম।

আমি তখনো দাঁড়িয়ে ছিলাম।

ধমকে উঠলেন সিরাজাই বেগম। বললেন; আগা, আমার হুকুম নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছে তুমি? এ হুকুম পালনে বিলম্ব হলে কি হবে জান?

আমার জীবনের কোন মূল্য নেই। তবু জীবনের প্রতি কি মায়া! ভয়ে ভয়ে বললুম: আপনার হুকুম আমি শুনেছি বেগম সাহেবা। এই মুহূর্তে হুকুম তামিল করছি।

তখনি আমার অনুগত খোজা প্রহরীদের কাছে আমার মারফৎ বেগম সাহেবার হুকুম পৌঁছে গেল। দেখতে দেখতে মুখ্য বেগম মহলের চৌকোণ চত্বরে টানাহিঁচড়ে করে খোজারা সফাভিদ বেগমদের নিয়ে এল, ঠিক যেমন করে বোরখা পরা অনিচ্ছুক বধূকে জোর করে নিজের গৃহে নিয়ে যায় তাদের স্বামীরা। খোজা দিয়ে ঘর থেকে টেনে বের করা মানেই তাদের সামনে চরম সর্বনাশ, একথা বেগমেরা জানেন। সঙ্গে সঙ্গে করুণ কান্নায় হারেমের বাতাসকে তারা করুণার্দ্র করে তুললেন।

আমি খোজা, আমার মধ্যে কাম রিপুর আবেগ না থাকলেও অন্যান্য মানুষের মত স্নেহ, দয়া, মায়া, প্রীতি আছে। এই সব বৃত্তিগুলো সুক্ষ্ম ভাবে আমাকেও নাড়া দিতে পারে। আমার

কেবলই মনে হতে লাগল, মানব জন্ম আমার না হলেই ভাল হত। খুদাতালা আছেন কিনা জানিনা, যদি থাকেন, বিনা অপরাধে আমাকে চরম শাস্তি দিয়ে চির জীবনের সুখ কেড়ে নিয়েছেন। আবার মানুষের চরম সর্বনাশের মুখে নীরব সাক্ষী করে আমাকেই দাঁড় করিয়েছেন। হারেমের প্রাসাদ, মিনার, ইট, কাঠ, এই সব অচেতন পদার্থের মত আমিও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

চোখ দুটোকে বন্ধ করতে পারলে ভাল হত। কিন্তু সিরাজাই বেগমের ভয়ে আমি তা পারলুম না। চোখে পড়ল সফাভিদ বেগমদের করুণ নয়নগুলি। এদের মধ্যে আছেন শাহ দ্বিতীয় তামাশ-এর বেগমরা, আর শাহ তৃতীয় আব্বাসের সেই তরুণী বধূও। এই কিছুদিন আগেও ওরা আমার মনিব ছিলেন। বেগম সাহেবা বলে দু-বেলা আমি সকলকে সেলাম জানাতুম। তাদের সে করুণ চাহনি আমার কাছে মর্মভেদী ঠেকল, যেন তারা আকুতি জানাচ্ছে রক্ষা করবার জন্যে। কিন্তু আমার মত অসহায় এ-দুনিয়াতে কে আছে? দেখলুম, শাহ আব্বাসের অপরিণত বয়স্ক বালিকা বেগমকে। সে কাঁদছে না। কিন্তু সব দেখে শুনে কেমন বিহ্বল হয়ে গেছে।

সিরাজিয়া বেগম আমাকে ডেকে হুকুম করলেন: আগা জল্লাদকে লৌহ শলাকা উত্তপ্ত করতে বলেছ?

আমি জানালুম: আমি তাকে বেগম সাহেবার হুকুম জানিয়েছি।

—যাও তাকে উত্তপ্ত শলাকা নিয়ে আসতে বল।

আমি তৎক্ষণাৎ জল্লাদদের কাছে খবর পাঠালুম।

হুকুম পাবা মাত্র উত্তপ্ত লৌহ শলাকা নিয়ে জল্লাদেরা বেগম মহলের চত্বরে উপস্থিত হল। ক্রুদ্ধ আক্রোশের মত শলাকার মুখ-গুলি আগুনে উত্তপ্ত হয়ে আছে।

বেগম সাহেবা হুকুম করলেন বাঁধানো উঠানে জোর করে

বেগমদের শুইয়ে দিতে। জোর করে আকাশের দিকে মুখ করে কয়জন বেগমকে শুইয়ে দেওয়া হল। বেগম সাহেবার নির্দেশ অনুযায়ী কয়েকজন বাঁদী তাদের বুকের উপর গিয়ে বসল। কেউ বা দুই দিক থেকে হাত দুটো সটান করে মাটির উপর চেপে ধরল। একটা কাতর গোঙানী করুণ আর্তনাদে হারেমের দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। ঐ উত্তপ্ত লৌহ শলাকা জল্লাদেরা বেগম সাহেবাদের চোখের পাতার উপর দিয়ে টেনে নিয়ে গেল। কুর্বানীর মুখে যেন কয়েকটা মেষ-শাবক অসহায় ভাবে চিৎকার করছে। উত্তপ্ত লৌহ শলাকার স্পর্শে আমারই চোখের সামনে বেগম সাহেবাদের চোখের মণি ঝলছে গেল। চোখের দৃষ্টি নিভে গেল চিরদিনের জন্য। শুধু কি তাই? এতেও ক্ষান্ত হলে হত। বেগম সাহেবা হুকুম করলেন, ঐ উত্তপ্ত শলাকা দিয়ে তাদের মুখের উপর ঘনঘন দাগ কেটে দিতে।

তাঁর হুকুম তামিল হল।

যুদ্ধক্ষেত্রে ছিন্নশির সৈনিকের দেহটা যেমন ছটফট করে গড়াগড়ি দেয়, তেমনি যন্ত্রণায় কাতর হয়ে উঠানে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন বেগম সাহেবারা। এর চাইতে তাদের মৃত্যু হলেও ভাল ছিল। অবশেষে আমি যখন তাদের মুখ দেখতে পেলুম, দেখলুম, বিকৃত কদাকার একদল মুখ। মুহূর্তে তাদের সুন্দর যৌবনের লাবণ্য কোথায় উধাও হয়েছে। এই ক্ষণস্থায়ী যৌবনের জন্য মানুষের এত অহংকার।

সিরাজাই বেগম স্বচক্ষে সফাভিদ বেগমদের এই নিপীড়ন দেখলেন। আমাকে হুকুম করলেন, আগা, এদের এবার মাটির নিচে অন্ধ কারাগারে চালান দাও। মনে মনে ভাবলুম, এদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্য এই বদান্যতাটুকু আর কেন? এদের কোতল করলে এর চাইতে আর বেশী পাপ হয় না। হায়রে মানুষের নির্মম

রীতি। কিন্তু কে কাকে দোষ দেয়। এযুগের রীতিই এমনি। মনুষ্যত্ব এ যুগে নেই। আদম হাওয়ার সন্তানেরা ক্ষমতা লিপ্সায় অন্ধ। ন্যায় অন্যায় ভুলে গেছে। ভুলে গেছে, খুদাতালা আছেন জাগ্রত প্রহরী সকল কিছুর। জীবনের পরই মানুষ ফুরিয়ে যায় না। তার শেষ বিচার হয় রোজকেয়ামতের দিনে।

আমার স্বপ্নগুলির মধ্যে একটি নিষ্ঠুর ভাবে সত্য হল। ভাবতে লাগলুম, আর একটি স্বপ্নও তবে মিথ্যে হবে না। নাদিরের চরিত্র কে না জানে। পশু-মেষ যিনি পালন করেছেন, মানুষ মেষের দলকে অনায়াসেই তিনি তরবারির আঘাতে রসাতলে দিতে পারেন। হয়তো দিচ্ছেনই। সফাভিদ আর কিজিবিলাসদের খতম না করে তিনি ফিরবেন না।

আমার অনুমান সত্য হল। রাজধানীতে পুত্র রেজা খাঁর কাছে তিনি সংবাদ পাঠালেন নিজের বিজয় বার্তা দিয়ে। জানালেন—সফাভিদ আমিরদের চক্রান্ত চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছে। হাজার হাজার সফাভিদ আমির নাদিরের তরবারির মুখে তাদের শির লুটিয়ে দিয়েছে। কিজিবিলাসদের তিনি তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন দলভ্রষ্ট গুটিকয় মেষ শাবকের মত।

কিজিবিলাসদের দমন করে তিনি ঢুকবেন আফগান মহল্লা কান্দাহারে। বড় স্পর্ধা বেড়েছে আফগানদের। বহুদিন যাবত ইরাণের শাহী শাসনকে অস্বীকার করছে তারা। এদের শায়েস্তা করতে নাদির শা' বদ্ধপরিকর।

সংবাদ পেয়ে বেগম মহলে সিরাজাই বেগম প্রচুর স্ফূর্তি করলেন। চিড়াগ জ্বালিয়ে দু-রাত বেগম মহল আলোকিত রাখা হল। সিরাজাই বেগমের মহলে ভাড়ে ভাড়ে দ্রাক্ষাসুধা এল। বেগম সাহেবা আমায় ডেকে বললেন : আগা, শাহ ফিরে এলে তোমাকে আমি যথাযোগ্য পুরস্কৃত করব। বল তোমার কি চাই ?

পাপের পুরস্কার নিয়ে দোজখের পথ প্রশস্ত করবার আমার ইচ্ছে ছিল না। আমি বিনয় দেখিয়ে বললুম : বেগম সাহেবা—আমি বান্দা। হুকুম তামিল করেই আমার আনন্দ। আমি আর কিছু চাই না। শুধু চাই, শাহ ভালয় ভালয় ফিরে অসুন। তিনি অক্ষত দেহে সহস্র দুষ্‌মন বন্দীদের নিয়ে রাজধানীতে ফিরুন।

আমার এই স্তুতিবচনে বেগম সাহেবা আরো প্রীত হলেন। বললেন : তোমার উপর আরো খুস্‌ হলাম। শাহ ফিরলে তোমার তরবারির কোষ সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেব।

কিছুদিন পরে খবর পেলাম—শাহ অসভ্য আফগানদের দমন করতে স্বয়ং কান্দাহার গিয়েছেন। বিদ্রোহীদের ঘাটি ভেঙে তছনছ করে দিয়েছেন তিনি। আর সঙ্গে করে নিয়ে আসছেন কান্দাহার প্রবাসী হিরাতের আবদালি বংশকে। এই বংশের নতুন নেতার নাম—আহমদ আবদালি।

আহমদ আবদালির চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে শা তাকে নিজের দেহরক্ষী নিযুক্ত করেছেন। রাজধানীতে সংবাদ পাঠিয়ে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তার। পুত্র রেজা খাঁকে জানিয়েছেন : ইরাণ, তুরাণ আর হিন্দুস্থানে আহমদের মত অক্লান্ত কর্মী আর চরিত্রবান লোক আর কেউ নেই।

আরো একটি সংবাদ পাঠিয়েছেন শাহ আমাকে—হারেমের একটি সুন্দর মহল গুছিয়ে রাখবার জন্যে। আফগান দস্যুরা লুঠ করেছিল ইস্‌পাহানের এক সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যাকে। সে কন্যা ছিল ইস্‌পাহানেরই কবি আলিকুলির বাগদত্তা। তার নাম খাদিজা সুলতান। নাদিরের ভয়ে সফাভিদ রাজবংশের সমর্থক সেই কবি পালিয়েছে হিন্দুস্থানে, তার বাগদত্তাকে আফগানদের হাত থেকে আবার ছিনিয়ে নিয়ে আসছেন নাদির। সে নাকি এক খণ্ড রত্নের মত।

সংবাদ পেয়ে আমি খুসী হইনি। কবি-প্রিয়ার রাজমহিষী হয়ে কোন সুখ নেই। শাহের হারেমে ঐশ্বর্য আছে, কিন্তু শান্তি নেই, সুখ নেই। যেখানে ভালবাসা নেই, সেখানে ঐশ্বর্যের মূল্য কি? শাহের মর্জিতে আজ যা সুন্দর, কাল তা কুৎসিত হতে কতক্ষণ? বিশ্বাস নেই সর্পকে, নেকড়েকে আর শাহের মর্জিকে।

খবর রাখতেন সিরাজাই বেগমও। নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য সদা জাগ্রত দৃষ্টি তার। খবর পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে আমাকে মহলের মধ্যে তলব করে পাঠালেন। ক্রোধে তার নাসারন্ধ্র স্ফীত। মুখ-মণ্ডল রক্তাভ লাল। নিশ্বাস উত্তপ্ত, যেন আগুন। আমাকে বললেন: আগা, শাহ তোমাকে কি খবর পাঠিয়েছেন, আমাকে সত্য বল।

আমি বললুম: বেগম সাহেবা, শাহেন শা আমাকে খবর পাঠিয়েছেন, হারেমের একটি বেগম মহলকে সাজিয়ে রাখবার জন্য।

—কেন?

—শাহেন শার মর্জি, আমি সামান্য বান্দা, কি করে জানবো বেগম সাহেবা।

কি একটু চিন্তা করে বেগম সাহেবা আমাকে বললেন: আগা, তোমার কি মনে হয়, শাহ কোন সুন্দরী রমণী ধরে নিয়ে আসছেন?

আমি বললুম: লুণ্ঠনের সামগ্রির মধ্যে জেনানা আদমিও পড়ে বেগম সাহেবা। হয়তো হারেমের যোগ্য কোন রত্ন শাহের চোখে পড়েছে। তাই তিনি কুড়িয়ে আনছেন।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে সিরাজাই বেগম ভাববার চেষ্টা করলেন। আমি বুঝতে পারলুম, তাঁর অন্তরে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছে। সুন্দরী প্রতিদ্বন্দ্বী নারীকে তার বড় ভয়, পাছে শাহের উপর সে সিরাজাই বেগম অপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার করে।

এই ক্রুর নাগিনীর সন্দেহ অপনোদন করা দরকার ভেবে

আমি তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম : বেগম সাহেবা, শাহের নতুন সংগ্রহের জন্য, আপনার কোন চিন্তার কারণ নেই। সে নিঃসন্দেহে সৌন্দর্যে প্রতিযোগিতায় আপনার পাশে দাঁড়াতে পারবে না। সৌন্দর্যের আকর্ষণে শাহকে যদি সে মুগ্ধ করতে পারত, তবে শাহ তার জন্য হারেমের মুখ্যমহল সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে বলতেন। কিন্তু আমায় তিনি সেরকম হুকুম করেন নি। শুনেছি, যে-মেয়েকে তিনি ধরে নিয়ে আসছেন, সে বিদূষী, কলাকৌশলী, রুচিসম্পন্না। কিন্তু তার সৌন্দর্যের কথা শাহ কিছু জানান নি। হয়তো এটা শাহের একটা সাময়িক খেয়াল মাত্র।

বেগম সাহেবা ঘাড় নেড়ে বললেন : হ্যাঁ, তোমার যুক্তি অর্থহীন মনে হচ্ছে না। কিন্তু ধর সে যদি আমার চাইতেও সুন্দরী হয়…?

আমি বেগম সাহেবাকে শান্ত করবার জন্য স্তুতির ভঙ্গিতে বললুম : আপনার চাইতেও সুন্দরী মেয়ে সারা ইরাণে কোথাও আছে বলে শুনিনি। বহু মালিকের হাত-ফের হয়ে আমি শাহী হারেমে এসেছি। কিন্তু অদ্যাবধি এমন সুন্দরী আমার চোখে পড়েনি। সুতরাং আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

একটু তৃপ্তির হাসি হাসলেন সিরাজাই বেগম। বললেন : তোমার চোখের দৃষ্টির তারিফ্ করতে হয়। শাহ নিজে আমাকে ঐ কথা বলেন। আগা, তোমার এই রুচিজ্ঞানটুকু আছে বলেই আমি তোমাকে হারেমে রেখেছি। নইলে তোমার যে কুৎসিৎ চেহারা, আমার মহলে, অন্ততঃ আমি তোমাকে আসতে দিতুম না।

এই উদ্ধত ক্রূর মেয়েমানুষটার উক্তি শুনে মনে মনে হাসলুম। শঠতা, নিষ্ঠুরতার যে জীবন্ত প্রতীক, সে শুনাচ্ছে রুচিজ্ঞানের কথা। অথচ এই বেগম সাহেবাই পয়লা দিন আমাকে হুসিয়ার করে দিয়েছেন, যেন তাঁর সামনে কদাচ আমি হাফিজ, সাদী বা রুমির বয়েত আবৃত্তি না করি।

সিরাজাই বেগম বললেনঃ শাহ ফিরুন। মেয়েটাকে দেখি। তারপর প্রয়োজনবোধে সব ব্যবস্থাই করা যাবে। কি বল আগা? মাটির নীচে অন্ধকুঠুরী এখনো নিশ্চয়ই খালি আছে?

বেগম সাহেবার পৈশাচিক প্রবৃত্তিকে আবার চাড়া দিয়ে উঠতে দেখে আমি শিউরে উঠলুম। এ কল্পনা তিনি যাতে আর বেশী না করতে চান, সে জন্যে বললুমঃ অনেক কুঠুরী খালি আছে বেগম সাহেবা, সে নিয়ে আপনি মাথা ঘামাবেন না। প্রয়োজনে সব ব্যবস্থাই করা যাবে।

সে-কথা শুনে বেগম সাহেবা আমার উপর যথেষ্ট প্রীত হয়ে কয়েকটি আসরফি দান করলেন।

প্রায় একবছর ইরাণের নানাপ্রান্তে বিদ্রোহীদের দমন করে, কান্দাহার হয়ে দরবারে ফিরে এলেন নাদির। কান্দাহার থেকে নিয়ে এলেন, কান্দাহার প্রবাসী হিরাতের গোটা আবদালি বংশকে। সেই সঙ্গে নিয়ে এলেন খাদিজা সুলতানকে, স্নিগ্ধ একখানি প্রস্ফুটিত যৌবন।

দরবারে ফিরেই সিরাজাই বেগমের নিষ্ঠুরতার কাহিনী শুনতে পেয়েছিলেন নাদির। খাদিজা সুলতানের ভাগ্যে তেমন কিছু না ঘটে, সেজন্য প্রথমেই তিনি আমাকে ডেকে তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে বললেন।

আমি পাঁচজন খোজা নিযুক্ত করলুম, খাদিজা সুলতানকে দেখাশুনা করবার জন্যে। দরবারে গিয়ে একদিন দেখে এলুম শাহের দেহরক্ষী হিসাবে নব নিযুক্ত আফগান তরুণ আহমদ আবদালিকে। গোটা আবদালি বংশটাকেই শাহ নিয়ে এসেছেন রাজধানীতে। একখণ্ড ঝকঝকে ইস্পাতের ফলার মত আহমদ আবদালি। শাহের সিংহাসনের নিচে সে ছবির মত দাঁড়িয়ে ছিল।

॥ তিন ॥

শাহের ভাগ্যে বিশ্রাম নেই। হারেমে দুদিন থাকতে না থাকতেই আবার রণদামামা বেজে উঠল আবার জমে উঠলো সেই পুরানো বিরোধ হিন্দুস্থানের সঙ্গে, মোগল বাদশা আর ইরাণের শাহের মধ্যে শক্তি আর মর্যাদার প্রতিযোগিতা। নিভন্ত আগুনটাকে খুচিয়ে খুচিয়ে নাদিরই আবার গনগনে করে তুললেন। নইলে মোগলেরা বাদশা শাজাহানের সময় সেই যে কান্দাহার ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তা উদ্ধার করবার জন্য আর আদিখ্যেতা করেনি। আর করবে কি ? মোগলদের সেই ক্ষমতা আর যোগ্যতা এখন আছে নাকি ?

হিন্দুস্থানে শেষ মোগল বাদশা ছিলেন ঔরংজেব। তার পরে আর সবই নাম মাত্র ; শুধু ক্ষমতাহীন বাদশাহী মর্যাদার একটা দৈহিক প্রতীক। বাহাদুর শা, জাহান্দার শা, ফররুকসিয়র সব সমান। বর্তমান বাদশা মহম্মদ শা'রতো কথাই নেই।

মোগল শৌর্য আর বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নেই তাঁর মধ্যে। সংগ্রাম ক্ষেত্রের কথা ভুলে গিয়ে তিনি এখন রমণী রমন রণে মেতে আছেন। শুনতে পাই যে আমীর তাকে বেশী রমণীরত্ন উপহার দিতে পারেন তিনি তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়েন। দিল্লীর দরবারে চলে বাদশার উপর প্রাধান্য স্থাপন নিয়ে আমীরদের মধ্যে পরস্পর প্রতিযোগিতা।

দিল্লীর আমির দল এখন দুই ভাগে বিভক্ত। ইরাণী আর তুরাণী দল।

তুরাণী দলের নেতা কামরুদ্দিন। তিনি এখন ওয়াজীর। এতদিন কোকিজী নামে এক নর্তকীর সাহায্যে তিনি বাদশার উপর প্রাধান্য রেখেছিলেন। সেই প্রাধান্য এখন কেড়ে নিয়েছেন ইরাণীদলের প্রধান,

আমির খাঁ। একটা অতি মনোরমা হিন্দু বাঈজীকে তিনি নাকি বাদশার কাছে ভেট পাঠিয়ে তাঁর মন জয় করে নিয়েছেন।

বাঈজীটার নাম উধম বাঈ। বাদশা তাকে হারেমে তুলে নাম দিয়েছেন বৈজুসাহিবা। এখন বাদশার যতকিছু ওঠা নামা সেই বাঈজীটার নির্দেশেই। রাজকার্য চুলোয় গেছে। দরবারের মধ্যে বাঈজী-নাচ হচ্ছে।

দিল্লীর দরবার এখন কোথায় নেমেছে তার হিসেব আমরা ইরাণে বসেই পাচ্ছি। হিন্দুস্থানের বাজারে ইরাণের যে জিনিষটার চাহিদা আজ সব চাইতে বেশী, সেটা হচ্ছে সিরাজ প্রদেশের দ্রাক্ষা সুধা। যার নাম সিরাজী। দ্বিতীয় চাহিদা হচ্ছে ইরাণী নর্তকী। দলে দলে ব্যবসায়ীরা নর্তকী ধরে চালান দিচ্ছেন দিল্লীর বাজারে। আগে এ ব্যবসা ছিল ক্রীতদাসের। বাদশা নিজের পার্শ্বচর আর দেহরক্ষী করবার জন্য বাজার থেকে উপযুক্ত বান্দা কিনতেন। আজ শুধু বিক্রী হচ্ছে বাঈজী আর নর্তকী।

এই অপদার্থ পুরুষত্বহীন মোগল বাদশার সঙ্গে আমাদের শাহের বিরোধ ঘনিয়ে এসেছে। শাহ ভয়ানক ক্ষেপে উঠেছেন দিল্লীর মোগল বাদশার উপর।

শাহ যখন কান্দাহার দুর্গ অবরোধ করে আফগানদের শায়েস্তা করতে উদ্যত হয়েছিলেন, তখন বহু অসভ্য আফগান কান্দাহার ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল দিল্লীর মোগল প্রদেশ কাবুলে। শাহের এটা পছন্দ নয়। তিনি প্রতিবাদে দূত পাঠিয়েছেন দিল্লী দরবারে। সেটাও প্রায় বছর খানিক হয়ে গেল। আশ্চর্য! দিল্লী-দরবার সৌজন্য পর্যন্ত ভুলে গেছে। মোগলেরা শাহের প্রতিবাদের কোন উত্তর তো পাঠায়ই নি, উল্টো ইরাণী দূতকে আটকে রেখেছে।

আমাদের শাহ মোগল বাদশার এই অসভ্যতার জন্য দারুণ ক্ষেপে গেছেন। বিরাট এক বাহিনী নিয়ে তিনি দিল্লী যাবেন ভাবছেন।

দরবারে তাই নিয়ে আলোচনা হয়েছে। একদল আমিরের তাতে খুবই মোদত। তাঁরা শাহকে উৎসাহ দিচ্ছেন। কারো লোভ হিন্দুস্থানের অফুরন্ত ঐশ্বর্যের প্রতি। কান্দাহারের আহম্মদ খাঁ তো প্রকাশ্য দরবারেই বলেছেন যে, ভারতবর্ষের সুন্দরী জেনানাদের দেখবার তার ভারি ইচ্ছা। তিনি শুনেছেন, ভারতীয় রমণীর মত সুন্দরী রমণী নাকি পৃথিবীতে জন্মায় না। তুর্কী রমণীদের সৌন্দর্য উগ্র। ইরাণীদের সৌন্দর্যে লাবণ্য। ভারতীয় রমণীর সৌন্দর্যে নাকি সৌন্দর্য, লাবণ্য আর শান্তশ্রীর এক অপূর্ব সমন্বয়।

রূপ আর ঐশ্বর্যের লোভ শাহেরও কিছুটা থাকতে পারে। সেদিন রাতভর দরবারে তিনি হিন্দুস্থান আক্রমণের পরিকল্পনা তৈরী করেছেন।

হারেমে সিরাজাই বেগমের মনে আবার নতুন করে অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে। শাহ রাজধানীতে ফিরেও হারেমে নিত্য আসছেন না। কেন? তিনি কি তবে নতুন যে রূপসী খাদিজা সুলতানাকে ধরে নিয়ে এসেছেন, তার প্রণয়ে মুগ্ধ?

আমাকে ডেকে তার মনের কথাটা সিরাজাই বেগম আমাকে বললেন। বললেন: আগা, শাহ যে কান্দাহার থেকে একটা নতুন উল্লুকী ধরে নিয়ে এসেছেন, তাকে তুমি দেখেছ?

বললুম: দেখেছি বেগম সাহেবা।

—সে উল্লুকীটা দেখতে কি রকম?

কি জবাব দেব বেগম সাহেবাকে, আমি ভাবতে লাগলুম। এই ঈর্ষা কাতর মেয়েমানুষটাকে বিশ্বাস নেই। সে যে-কোন জঘন্য কাজ করতে পারে। খাদিজা সুলতানাকে আমি দেখেছি। উগ্র সৌন্দর্য তার নেই, কিন্তু অপূর্ব শান্তশ্রীতে সে ভরে আছে। সৌন্দর্য তো শুধু দেহে নয়, মনের প্রতিবিম্বতেও। সিরাজাই বেগম যথেষ্ট

সুন্দরী, কিন্তু মন তার কুৎসিৎ। তাকে তাই আমার ভাল লাগে না। খাদিজা সুলতানার মন ফুলের মত সুন্দর। বাইরেও তার প্রকাশ ঘটেছে চাল চলনে। তাই সে আমার কাছে সুন্দর। সুন্দর একটা বৃন্তচ্যুত পুষ্পের মত।

খাদিজা বৃন্তচ্যুত বৈকি! তার যে মানসিক পটভূমি, শাহী হারেমের দেয়ালের মধ্যে তা শোভা পায় না। যোদ্ধার অঙ্গভূষণ হবার জন্যে ও মেয়ের জন্ম হয়নি, জন্ম হয়েছে কবি-সঙ্গিনী হবার। কিন্তু দুর্ভাগ্য, প্রিয়তমের বাহুচ্যুত করে তাকে আফগান দস্যুরা একদিন ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এবার সে পড়েছে নাদিরের হাতে। বৃন্তচ্যুত হয়ে খাদিজা ম্লান। বসন্ত কালের ম্লান সন্ধ্যার গোধূলীর মত সে সুন্দর। তাঁর কবি-প্রেমিক আলিকুলি তাকে কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

শোনা যায় ছোটবেলা একই মাদ্রাসাতে পড়ত দুজন। কৈশোরের প্রান্তেই আলিকুলি ভালবেসেছিলেন খাদিজাকে, খাদিজা আলিকুলকে। সহজাত কবি-প্রতিভার অধিকারি আলিকুলি ছাত্রাবস্থাতেই খাদিজাকে নিয়ে কবিতা লিখতেন। সেটা ভারি লজ্জার ছিল। তাই একদিন খাদিজা আলিকুলিকে বারণ করে বলেছিলেন: আমার নাম নিয়ে কবিতা লিখো না। উত্তরে আলিকুলি তখনই কাব্য করে বলেছিলেন—

"তুমি বলছ, কাব্যে তব লিখোনাক আমার নাম —

কাব্যে কিসের মূল্য? যদি তোমার নামই না দিলাম?

সে কবিতা আজ লোকের মুখে মুখে ইস্পাহানে চলে। প্রেমিকরা গোপন পত্রে, প্রিয়ার কাছে সে কবিতার উল্লেখ করে। খাদিজা সেই কাব্য-সৌন্দর্য-লোকে কবির মানসী। তার রূপ লাবণ্য সাধারণ মানুষ কি বুঝবে? সৌন্দর্যের অর্ধেক বাইরে, অর্ধেক মনের কল্পনায়। যে যে-রকম দেখে।

কিন্তু তবু এই জিঘাংসাপরায়না মেয়েটিকে শান্ত করবার জন্য আমি বললুম: বেগম সাহেবা, খাদিজা সুলতানার কথা আপনাকে কি বলব। আপনি যদি চাঁদ, সে জোনাকি। আপনার সঙ্গে তার রূপের কোনই তুলনা হয় না।

সিরাজাই বেগম বললেন: কিন্তু আমি শুনেছিলুম মেয়েটা সুন্দরী। একটা কবি নাকি তাকে উন্মাদের মত ভালবেসেছিল। সে-বেটা এখন শাহের ভয়ে দিল্লীতে মোগল বাদশার দরবারে আশ্রয় নিয়েছে। এই ছুঁড়িটাকে নিয়ে সে নাকি অনেক কবিতা লিখেছিল।

আমি বললুম: বেগম সাহেবা, কবিদের কথা বাদ দিন। তাদের বদ্ধ পাগল বলেও ধরে নেওয়া যেতে পারে। যারা ঘাস, পাখি, ফল, ফুল দেখে আত্মহারা হয়, তারা যৌবনবতী একটি নারী দেখলে উন্মাদ হবে তাতে আর আশ্চর্য কি? সৌন্দর্য বিচার করবার ক্ষমতা তাদের আছে নাকি?

ইস্‌পাহানে যে খাদিজা সুলতানাকে ভালবেসে উন্মাদ হল, দিল্লীতে গিয়ে সে একটা দরবারের নর্তকীকে দেখে পাগল হয়ে তাকে সাদি করল। তার কাছ থেকে সৌন্দর্যের বিচার আপনি কি আশা করেন।

বেগম সাহেবা সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে বললেন: তুমি হক্ কথা বলেছ আগা। সেইজন্যে তোমায় ভাল লাগে। আচ্ছা বলতো—সেই কবিটা যদি আমায় দেখতো, তবে কি হত!

আমি বললুম: বেগম সাহেবা, আপনার রূপের ঝলক সহ্য করতে না পেরে সে আত্মহত্যা করত।

একথা শুনে এত সন্তুষ্ট হলেন বেগম সাহেবা যে, তৎক্ষণাৎ দুটো আসরফি ছুঁড়ে দিলেন আমার দিকে। তারপর দুটো আঙ্গুর দানা মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে আমাকে বললেন: শুনছি, শা হিন্দুস্থানে যাবেন, একথা সত্যি কি?

আমি বললুম : একথা সত্যি বেগম সাহেবা।

—তিনি হিন্দুস্থানে যাবেন কেন ?

বললুম : হিন্দুস্থানের মোগল বাদশাটা বড় বেশী বেয়াদপি করছেন। তিনি শায়ের শত্রুদের কাবুলে আশ্রয় দিয়েছেন। শায়ের দূতকে দিল্লীতে আটকে রেখেছেন।

বেগম সাহেবা বললেন : কিন্তু আমার বাঁদী রহিমা বলছিল শা নাকি হিন্দুস্থানে যাচ্ছেন সুন্দরী মেয়েছেলে খুঁজতে। কান্দাহারের আহম্মদ খাঁর কাছে নাকি তিনি শুনেছেন, দিল্লীতে খুব খবসুরত জেনানা আদমি পাওয়া যায়।

আমি হোঃ হোঃ করে হেসে বললুম : এ-সব বানানো কথা বেগম সাহেবা। মেয়ে মানুষের খোঁজে কেউ আর একটা দেশের সঙ্গে যুদ্ধ করে না কি ?

বেগম সাহেবা বললেন : কেন, করবে না। তুমি শোননি ট্রয়ের রাজকুমার গ্রীসের রাণী হেলেনকে চুরি করে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে ছিল ? শুনেছি হিন্দুস্থানের এক পাঠান বাদশা আলাউদ্দিন খিলজী রাজপুত রাজ্য চিতোর আক্রমণ করেছিল একটা মেয়েছেলের রূপে মুগ্ধ হয়েই।

আমি বেগম সাহেবাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললুম : বেগম সাহেবা আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি স্থির নিশ্চয় জানি, শাহের মনে সে-রকম কোন পরিকল্পনা নেই।

কি একটু ভাবলেন সিরাজাই বেগম। তারপর বললেন : আচ্ছা আগা। শাহ, হিন্দুস্থানে গেলে তো অনেক দিন তাকে থাকতে হবে ?

বললুম : যাতায়াত করতেও তো বেশ কিছুদিন সময় লাগবে বেগম সাহেবা।

বেগম সাহেবা বললেন : তোমার হাতে খাদিজা সুলতানার ভার, তাকে একবার দেখাতে পারবে না ?

আমি চুপ করে গেলুম। যার মনে যে ভাব। যত কিছুই

প্রতিদ্বন্দ্বিনীর চিন্তাতেই সিরাজাই বেগম অস্থির। প্রতিদ্বন্দ্বিনীকে ধূলিসাৎ না করে তাঁর স্বস্তি নেই।

আমাকে নীরব থাকতে দেখে তিনি বললেন: কই কিছু বললে না?

আমি বললুম: আমি বান্দা, হুকুমের ভৃত্য। শাহেন শার যদি তেমন হুকুম হয়, আপনি নিশ্চয়ই দেখবেন।

বেগম সাহেবা বুঝলেন, শাহের হুকুম ছাড়া, খাদিজা সুলতানাকে আমি তার সামনে আনব না। সুতরাং তিনি আর কোন কথা বললেন না।

শেষ পর্যন্ত শাহ হিন্দুস্থান আক্রমন করবার স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

ঋতু পরিবর্তন হচ্ছিল। ইরাণের দূর পর্বত শ্রেণীর শিখর দেশে পেঁজাতূলোর মত বরফ পড়ছিল। আকাশটা আরো প্রগাঢ় নীল হয়ে উঠছিল। উত্তরের শীতার্ত হাওয়া হু হু করে বইতে শুরু করেছিল। হিন্দুস্থানে অভিযান নিয়ে যাবার পথে এটাই নাকি প্রশস্ত সময়। তীব্র গরম পড়ে হিন্দুস্থানে। সেখানে গ্রীষ্মকালে অভিযান নিয়ে যাওয়া কষ্টকর। বর্ষায় হিন্দুস্থানের বাদশারাও যুদ্ধ করেন না। সেখানকার নদী নালা কূল ছাপিয়ে সমতল ভূমি ডুবিয়ে দেয়। কর্দমাক্ত পথে হাতী ঘোড়া চলতে পারে না। ভারি কামানের গাড়ী টেনে নেওয়া কষ্টকর। তাই শীতের মরশুমেই মধ্যএশিয়া থেকে হিন্দুস্থানের দিকে অভিযান যায়। শাহ নাদিরও এই মরশুম বেছে নিলেন।

কয়দিন ধরে রাজধানীতে সৈন্যদের কুচকাওয়াজ চলল। শাহ হিন্দুস্থান আক্রমন করতে যাবেন শুনে দলে দলে যোদ্ধা সৈনিকেরা এসে শাহী বাহিনীতে যোগ দিতে লাগল। হিন্দুস্থান সৈনিকদের

কাছে চিরদিনের লোভের দেশ। হিন্দুস্থানের ঐশ্বর্যের কাহিনীতে সৈনিকেরা চিরদিন মুগ্ধ। হিন্দুস্থানে গেলে নাকি রাতারাতি বড় লোক হয়ে ফিরে আসা যায়।

গজনীর সুলতান মামুদের সঙ্গে যারা হিন্দুস্থানে গিয়েছিল সকলেই দেশে ফিরে এসেছিল ধনী হয়ে। সঙ্গে গিয়েছিলেন যে তারিখওয়ালা সেই উটবি, হিন্দুস্থানের চোখ ঝলসানো ঐশ্বর্যের কথা বর্ণনা করে গেছেন। সেই বর্ণনা শুনেই একদিন তৈমুরলঙ গিয়েছিলেন ভারতবর্ষে। এক একটা বান্দা কত যে ঐশ্বর্য নিয়ে ফিরেছিল তার লেখাজোঁকা নেই। বাবুর বাদশা হিন্দুস্থান জয় করে কোটী কোটী টাকার উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন মধ্য এশিয়ার আত্মীয় স্বজনদের কাছে। তাই দেখে দলে দলে লোক গিয়েছিল ভারতবর্ষে। পারশ্য থেকে হাজার হাজার লোক একদিন এই ঐশ্বর্যের লোভেই দিল্লী গিয়েছিল। আজ তাদের অনেকেই দিল্লীর বাদশাহী দরবারে গণ্যমান্য আমীরে পরিণত হয়েছেন। সুতরাং সৈন্য সংগ্রহে শাহকে কোন বেগ পেতে হল না।

বিশাল এক বাহিনী তৈরী করে নাদির হিন্দুস্থান আক্রমণ করবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। অশ্বারোহী, পদাতিক আর গোলন্দাজ বাহিনী বিরাট এক জন-সমুদ্রের সৃষ্টি করল। হাজার হাজার কুলি এলো শিবিরের সরঞ্জাম, খাদ্য, হারেম প্রভৃতি বহন করে নেবার জন্যে।

হিন্দুস্থান যাবার মুখে নাদির হারেমের কিছু কিছু জেনানাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া স্থির করলেন। এদের মধ্যে সর্বাগ্রে নাম উঠল সিরাজাই বেগমের।

নিজের অনুপস্থিতে তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র রেজা খাঁর উপর রাজ্য পরিচালনার ভার দিয়ে যাওয়া স্থির করলেন।

সংবাদ শুনে সিরাজাই বেগম আমাকে তলব করলেন: শুনছি, শাহ হিন্দুস্থান অভিযানে আমাদেরও সঙ্গে নিয়ে যাবেন?

বললুম : ঠিকই শুনেছেন আপনি বেগম সাহেবা।

বেগম সাহেবা বললেন : কিন্তু তিনি আমাদের সঙ্গে নিচ্ছেন কেন ?

বললুম : দূর দেশে যুদ্ধ যাত্রাকালে সঙ্গে হারেম নিয়ে যাবার রীতি তো আছে বেগম সাহেবা। সময় কতদিন লাগবে কে জানে! শাহ কি এর মধ্যে প্রিয়জন বিচ্ছেদের বেদনা অনুভব করবেন না ?

বেগম সাহেবা কিছুকাল চুপ করে থাকলেন। তার মনের মধ্যে অন্যরকম পরিকল্পনা ছিল। তিনি স্থির করে নিয়েছিলেন নাদিরের অনুপস্থিতিতে গতবারের মত হারেম থেকে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিদের একে একে নির্মূল করবেন। শাহ বোধহয় এটা বুঝতে পেরেছিলেন, তাই সিরাজাই বেগমকেও সঙ্গে নিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন।

হারেমকে গুছিয়ে নেবার দায়িত্ব পড়েছে আমার উপর।

বেগম সাহেবা চুপ করে নিজের মনে মনেই কি ভাবতে লাগলেন। তার মানসিক প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ ধরতে আমার এতটুকু বিলম্ব হল না।

তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে আমি কৌশলে কথা বললুম। বললুম : আপনার এতে বিন্দুমাত্র চিন্তান্বিত হবার কারণ নেই বেগম সাহেবা। শাহ আপনাকে সর্বাপেক্ষা বেশী পেয়ার করেন বলেই সঙ্গ-ছাড়া করতে চাইছেন না। দূর বিদেশে প্রিয়তম জনের কাছে থাকতে সকলেই চায়। এটাতো শুধুমাত্র যুদ্ধযাত্রা নয়, নতুন দেশ দেখাও। সেইজন্য দেখছেন না, শাহের সঙ্গে চলেছে দরবারের কবি, দার্শনিক, তারিখ-ওয়ালা সবাই। পূর্ব দেশে মোগলেরা অপূর্ব স্থাপত্য কীর্তিতে দিল্লী আগ্রাকে সাজিয়েছেন। সম্ভবতঃ আপনাকে এইসব কীর্তি দেখানোও শাহের ইচ্ছা।

তবু যেন বেগম সাহেবা কোন কথা বললেন না।

আমি তখন অন্য কৌশল প্রয়োগ করলুম। বললুম: বেগম সাহেবা আপনার নিজের স্বার্থের জন্যই শাহের পাশে আপনার থাকা উচিত। হিন্দুস্থানে অজস্র সুন্দরী আছে শুনেছি। তার দু-একজন লুণ্ঠন কালে শাহের শিবিরে এসে পড়তেও পারে। যদিও কোন বর্ণনাতে আপনার সমকক্ষ সুন্দরীর কথা আমি শুনিনি,—তথাপি আপনার পাশাপাশি তুলনা করতে না পেলে শাহ অপেক্ষাকৃত কম সৌন্দর্যেও মুগ্ধ হতে পারেন। সুতরাং নিজের স্বার্থের কথা বিবেচনা করেই শাহের সঙ্গে হিন্দুস্থানে যাওয়া আপনার উচিত।

একটু হাসি ফুটলো সিরাজাই বেগমের মুখে। তার সবচেয়ে দুর্বল জায়গায় আমি ঘা দিয়েছি।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমার কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করলেন। বললেন: আগা, তোমার বুদ্ধি আছে। আমি এতটা ভেবে দেখি নি। তোমার কথাই ঠিক।

আমি বললুম: আমি সব সময় বেগম সাহেবার মঙ্গল কামনা করি। আপনি মনের মধ্যে বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তাকে প্রশ্রয় দেবেন না।

বেগম সাহেবা হাসলেন।

আমি তখন কাজের কথা পাড়লুম। বললুম: বেগম সাহেবা আফগানিস্তানের বরফাচ্ছাদিত পর্বতাকীর্ণ পথের মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে হবে। মাঝে মাঝে পাহাড়ী তুষার ঝড় ওঠে। সেই প্রচণ্ড শীত প্রত্যক্ষ না করলে তার ভয়ঙ্কারিতা উপলব্ধি করা যায় না। আরব যোদ্ধারা হিন্দুকুশ পর্বত আর সোলেমান পর্বতের মাথায় রাশি রাশি জমানো বরফ দেখে, এবং তুষার ঝড়ের চরিত্র লক্ষ্য করে, এতটা ভয় পেয়েছিলেন যে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ দিয়ে হিন্দুস্থানের দিকে কখনো যেতে চান নি। তাই হিন্দুস্থান জয় করাতে মুসলমানদের এত দেরী হয়েছিল। পথে সেই ভয়ঙ্কর ঝড় এবং তুষারপাতের জন্য আমাদের প্রস্তুত হয়ে যেতে হবে।

শাহের নির্দেশে আমি আপনাদের জন্য প্রচুর গরম পোষাকের আদেশ দিয়েছি। কারখানা থেকে সেই সব পোষাক এখনি বাঁদীরা নিয়ে আসবে। আপনি সর্বাপেক্ষা মনোরম পোষাকগুলি আপনার জন্য গ্রহণ করবেন।

এই বলে আমি বেগম সাহেবার মহল ত্যাগ করতে প্রস্তুত হলুম।

বেগম সাহেবার মধ্যে তখন কিছুটা বিমর্ষ ভাব ছিল।

আমি রেশমী পর্দার কাছে যেতেই তিনি আবার আমাকে ডাকলেন।

বললুম : হুকুম করুন বেগম সাহেরা।

সিরাজাই বেগম বললেন : আগা, শিবিরে তুমি সর্বদা আমার কাছেই থাকবে তো?

আমি বিনীতভাবে কুর্নিশ জানিয়ে বললুম : শাহেন শা, আমাকে সেই ভাবেই হুকুম করেছেন বেগম সাহেবা।

সে-কথা শুনে সিরাজাই বেগমের মুখে যেন একটু হাসি ফুটল।

আমি হারেম থেকে বাইরে এসে হিন্দুস্থান যাত্রার জন্য গোছগাছ করতে লাগলুম।

হিজ্‌রী ১১৩৬ সালে শাহ তার বিরাট বাহিনী নিয়ে হিন্দুস্থানের দিকে যাত্রা করলেন। যাত্রার পূর্বে জ্যেষ্ঠ পুত্র রেজাখাঁকে আলিঙ্গন করে উপদেশ দিয়ে গেলেন, কি ভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে হবে। যুবরাজ রেজাখাঁকে আমি বহুবার দেখেছি। ধীর স্থির বুদ্ধিমান যুবরাজ তিনি। নাদিরের অনুপস্থিতেতে তিনি যে সুষ্ঠু ভাবে কাজকর্ম পরিচালনা করতে পারবেন, এ বিশ্বাস আমার ছিল।

নাদির পুত্রের কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

শাহী বাহিনী রাজধানী ত্যাগ করে হিন্দুস্থানের দিকে যাত্রা শুরু করল।

পারস্যের সীমানা ছাড়িয়ে শাহী বাহিনী যাত্রা শুরু করল কান্দাহারের দিকে। পথে পথে তখন তুষারপাত শুরু হয়ে গিয়েছে। শীতার্ত হাওয়া হু হু করে ছুটছে। সেই পথের উপর দিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হল।

শাহী বাহিনীর সর্বাগ্রে ছিল যন্ত্রবিদেরা। তাদের সঙ্গে ছিল কোদাল, কুড়াল, আর শাবল হাতে কুলির দল। পথের বিঘ্ন সরিয়ে দিয়ে তারা অগ্রসর হবে। তার পিছনে ছিল একদল অশ্বারোহী। তার পিছনে পদাতিক। তারপর স্বয়ং শাহ। শাহের পশ্চাতে হারেম। হারেমের চতুর্দিকে খোজা প্রহরী। তারপর আবার পদাতিক। তার পিছনে খাদ্য আর রসদ। তারপর আবার পদাতিক সৈন্য। সর্বশেষে পশ্চাৎ রক্ষক অশ্বারোহী বাহিনী।

শাহী বাহিনীর প্রথম শিবির পড়ল কান্দাহারে এসে। কিছুদিন আগেই কান্দাহার দুর্গ শাহ জয় করে গেছেন। কান্দাহার দুর্গ থেকে বেশ কিছু সৈন্য এসে আমাদের বাহিনীতে যোগদান করল।

বাইরে মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে একটা বিরাট আকর্ষণ আছে। শিবিরে দিন এবং নিশিযাপনের মধ্যে এক বিরাট রোমাঞ্চ।

ইতিপূর্বে কোন দিন আমি শাহী বাহিনীর সঙ্গে সমর-অভিযানে কোথাও বের হই নি। শাহ তামাশ যোদ্ধা ছিলেন না। শাহ তৃতীয় আব্বাস হারেম ছেড়ে কখনো বেরুতে পারেন নি। শাহ নাদির যখন বিদ্রোহ দমনের জন্য ইরাণের পথে প্রান্তরে ঘুরে বেরিয়েছেন আমাকে সঙ্গী করেন নি। রাজধানীতে হারেম তদারকের দায়িত্ব ছিল তখন আমার উপর।

এই প্রথম একটি সামরিক বাহিনীর সঙ্গে আমি পথে বেরিয়েছি। আমার ভাল লাগছে। উর্ধে নিষ্কলঙ্ক নীল আকাশ। সোলোমন

হিন্দুকুশ পর্ব্বত শিখরে শ্বেতশুভ্র তুষার। কামড়ানো উত্তুরে শীতার্ত হাওয়া ঝির ঝির করে পেঁজা তুলোর মত বরফ পড়ছে। কখনো কুয়াসার মেঘ সামনে সব পথ ঢেকে দিচ্ছে। দিবা দ্বিপ্রহরকে মনে হচ্ছে নিশীথ রাত্রি। আবার কখনো বা মন্ত্রবলে কুয়াসা উধাও হয়ে দেখা দিচ্ছে ঝলমলো সূর্যকিরণ। শ্বেতশুভ্র বরফের উপর পড়ে সূর্যরশ্মি আরো চোখ ধাঁধাঁনো ঔজ্জ্বল্য পেয়েছে। বরফ পড়ছে গাছের পাতায়। নুইয়ে পড়েছে ঝাউগাছের দীর্ঘ পত্রশ্রেণী। চেনার গাছগুলো শঙ্কিত ভাবে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে। বরফ জড়ানো পাইনের পাতায় হাওয়া সুর কেটে চলেছে। পাখিরা পালিয়েছে হিন্দুস্থানের দিকে। দুএকটা দীর্ঘলোম বন্য পশু পাইন বনের আড়াল থেকে বেরিয়ে শাহী বাহিনী দেখে আবার লুকিয়ে পড়ছে। গভীর রাত্রে গর্জন শুনতে পাচ্ছি শীতার্ত ভালুকের। বরফের নিচে পাহাড়ী লোকগুলোর ঘরবাড়ী কিছু দেখা যায় না।

মানুষ-কারিগরের চেয়ে প্রকৃতি কত বড়, আমার শুধু তাই মনে হচ্ছে। ইস্পাহানের মিনার, কান্দাহারের মস্জিদের গম্বুজ, সব কিছুকে গাম্ভীর্যে হারিয়ে দিয়ে ঋতুরাজের আপন সৃষ্টি শৈলদুর্গ অফুরন্ত সৌন্দর্য ছড়িয়ে হাসছে।

আমি খোজা। আমার রক্তের মধ্যেই একটা নেশা লেগেছে। নিজেকে ফিরদৌসির শাহনামার বীরদের সঙ্গে কল্পনা করে দিগ্বিদিকে দেশে দেশান্তরে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে আমার।

বাইরে বেগম শিবিরের পাশে, ইরাকী ঘোড়ার পিঠে ভালুক চর্মের কোর্তা গায় দিয়ে, বনবেড়ালের চামড়ার ফেজ পরে, আমার অদ্ভুত এক শিহরণ লাগছে। আমি বুঝতে পারছি, কেন বীর পুরুষেরা দুর্গম পথ অতিক্রম করে দেশ দেশান্তরে তাদের বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। যুদ্ধ জয়ে গৌরব আছে, ঐশ্বর্য আছে, রমণী রত্ন প্রাপ্তি আছে। কিন্তু এই উদার প্রকৃতির প্রশান্ত ব্যাপ্তি, যা

অফুরন্ত সৌন্দর্যের রহস্য ছড়িয়ে বসে আছে, তারো কোন কি আকর্ষণ নেই? তারো আকর্ষণ নিশ্চয় আছে। তাই গৃহী ঘর ছাড়া হয়েছে, শাহ হারেম ছেড়েছেন। শাহ নাদিরের চোখেও কি এই সৌন্দর্য এক আশ্চর্য তুলি বুলিয়ে দিচ্ছে না?

বীরের হৃদয়তো শুধুমাত্র তরবারির ঝঙ্কারেই নেচে উঠে না, প্রকৃতিতেও বিমুগ্ধ হয়।

শুনেছি সেকেন্দার শা আফগান পর্বত অতিক্রম করে হিন্দুস্থানের দ্বারদেশের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁর অন্যতম সেনাপতি সেলুকসকে বলেছিলেন: কি বিচিত্র এই দেশ সেলুকস!

গান্ধার রাজ্যে ময়ূর দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। এখনো আমাদের চোখে ময়ূর পড়ছে না। গজনী ছাড়িয়ে, কাবুল অতিক্রম করে, হিন্দুস্থানের পাঞ্জাবে প্রবেশ করলেই শ্যামল তরুশ্রেণী হেসে উঠবে, বিচিত্র বর্ণের পাখিদের দেখা যাবে। সেইখানেই ময়ূর আছে, পাঞ্জাবের শিবালিক পর্বতে। চাই কি গজনীর কাছে প্রাচীন গান্ধার রাজ্যেও ময়ূর দেখতে পারি।

শ্যামল সৌন্দর্য যাক। এই পর্বতশিরে দীর্ঘ বিস্তার বরফের চূড়া কি কম সৌন্দর্যের? তুষার ঝঞ্ঝার শোঁ শোঁ শব্দ কি কম আকর্ষণের।

এই আকর্ষণও মুগ্ধ করেছিল আর একজন বীরকে, হিন্দুস্থানে মোগল বাদশাহীর প্রতিষ্ঠাতা বাবুরকে। বাবুরের ফার্সীতে অনুদিত আত্মকাহিনী আমি পড়েছি। তুষার সৌন্দর্য তার মনকে এতটা কেড়ে নিয়েছিল যে, হিন্দুস্থানের শ্যামল প্রান্তরে মৃত্যুর পর তিনি চির শয়নে শায়িত হতে রাজী ছিলেন না। তাই তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁকে যেন কাবুলে কবর দেওয়া হয়।

কান্দাহারের দুর্গ চত্বরে দাঁড়িয়ে দূরে হিন্দুস্থানের আকাশ প্রান্তে তাকিয়ে হিন্দুস্থান অভিমুখে পরপর বহু অভিযানের কথা আমার

মনে পড়তে লাগল। এই পথে হিন্দুস্থানে গিয়েছিল যুগের পর যুগ ধরে বহু জাতি। তারা সকলেই হিন্দুস্থানের রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে। এই পথেই বহু প্রাচীনকালে শকেরা গিয়েছে, হূণেরা গিয়েছে। গিয়েছে কুষাণ গুর্জর আর ইউরেশিয়রা। শ্রেষ্ঠ কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের রাজধানী ছিল গজনী ছাড়িয়ে কিছুদূরে পেশোয়ারে। পুরাকালে তার নাম ছিল পুরুষপুর।

আমাদের সামনে গজনী। সেখানে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন সুলতান মামুদ। সতের বার তিনি হিন্দুস্থানে সমতল প্রান্তরে কাফেরদের দমন করবার জন্য অভিযান নিয়ে গিয়েছিলেন। গজনী আর হিরাতের মধ্যে ছোট্ট পার্ব্বত্য দুর্গ ঘূর। সে-পথে আমরা আসিনি। ঘূরের ঘূরী সুলতানেরাও গিয়েছেন হিন্দুস্থানে। তাদের চেষ্টাতেই তো আজ কাফের হিন্দুদের দেশে ইস্‌লামের বিজয় কেতন উড়ছে। আমরা যেখানে যেখানে বিশ্রাম করছি এপথ দিয়েই একদিন মানব সভ্যতার সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু মোঙ্গল বীর চিঙ্গিস খাঁ গিয়েছিলেন ভারতের দিকে। এই পথেই তার দুর্ধর্ষ বাহিনী নিয়ে হিন্দুস্থানের শ্যামল প্রান্তরে একটা পার্বত্য ঝঞ্ঝার মত নেমেছিলেন তুর্কী বীর তৈমূর লঙ। এই দুই রক্তের ধারায় গঠিত মোগল, তারা আজ ভারতবর্ষে রাজত্ব করছেন।

আমাদের শাহের পরিকল্পনা—কান্দাহার থেকে গজনীতে গিয়ে প্রথম নামবেন। তারপর দখল করবেন কাবুল। কাবুল থেকে ঝঞ্ঝার বেগে তিনি এগিয়ে যাবেন জামরুদ আর পেশোয়ারের দিকে। যে সামান্য মোগল সীমান্ত প্রহরী আছে সেখানে, তাদের উড়িয়ে দিয়ে অটকের কাছে সিন্ধু নদী অতিক্রম করে লাহোরে গিয়ে দাঁড়াবেন তিনি।

এই দুর্গম মধ্য এশিয়ার পার্বত্য লোকেরা দুনিয়াতে কিছুকেই ভয় করে না। কিন্তু তাদের বড় ভয় প্রশস্ত দরিয়াকে। হিন্দুস্থানে

বিরাট বিরাট দরিয়ার অভাব নেই। আফগানিস্থানের খরস্রোতা অথচ ক্ষীণকায় নদীর মত নয় হিন্দুস্থানের নদীগুলো। তাদের এপার থেকে ওপারের দূরত্ব কয়েক ক্রোশ। এই নদীর ভয়ে চিঙ্গিস সিন্ধু অতিক্রম করেননি। এই নদীর ভয়ে তৈমূরের তুর্কী বাহিনী হিন্দুস্থানের প্রান্তরে নামতে ইতস্ততঃ করেছিল। হিন্দুস্থানের আর এক ভয় হাতী। হাজার হাজার হাতী নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে দেয়াল সৃষ্টি করে দাঁড়ায় ভারতের জোয়ানেরা। সেই হাতী দেখে পাহাড়ী মানুষের বড় ভয়। কিন্তু এ ভয় ইদানীং আর নেই। হাতীর রণকৌশল আয়ত্ব করেছে মধ্য এশিয়ার মানুষেরাও। আমাদের শাহেরও হাতীশালে হাতী আছে। রণসজ্জায় কয়েকটা হাতীকেও সাজিয়ে নিয়ে চলেছি আমরা। আমাদের বেগম সাহেবা স্বয়ং চলেছেন একটি হাতীর পিঠে। হাতীতে চাপতে তাঁর বড় ভয়। হাওদার দোলনায় তার গা গুলোয়। মাঝে মাঝে নেমে তিনি তাই ইরাকী ঘোড়ার পিঠে চাপছেন।

কান্দাহারের শিবিরে রাত্রিবেলা আমাকে বেগম সাহেবা ডেকে পাঠালেন। সৌন্দর্য অনুভব করবার মত সূক্ষ্ম শিল্পরুচি বেগম সাহেবার নেই। ঢেউ খেলানো হিন্দুকুশ আর সোলোমন পর্বত-শ্রেণীর ভয়ঙ্কর মনোহারী গাম্ভীর্য তাঁকে শুধু ভয়ই পাইয়ে দিয়েছে। মনের মধ্যে কোন সৌন্দর্যের দ্যোতনা সৃষ্টি করতে পারেনি।

শিবিরে ঢুকতে দেখলাম, বেগম সাহেবা অনেকটা শুকিয়ে উঠেছেন। আমাকে বললেন: আগা হিন্দুস্থান আর কতদূর?

আমি বললুম: বেগম সাহেবা, এখনো আমরা আমাদের সাম্রাজ্যসীমাই অতিক্রম করিনি। হিন্দুস্থান এখনো বহুদূর।

ক্লান্তভাবে বেগম সাহেবা বললেন: বহুদূর!

—হ্যাঁ বহুদূর। কেন বেগম সাহেবা, এই বরফাচ্ছন্ন পথের

উপর দিয়ে তুষারপাতের খেলা দেখে দেখে আপনার চলতে ভাল লাগছে না ?

সিরাজাই বেগম বললেন: তুমিতো জান আগা যে, কাবা আমি কোনকালেই পছন্দ করিনে। এই ভয়ঙ্কর পথ দেখে শুধু ভয় করে। আমার মনে হয়, শাহ হিন্দুস্থান অভিযানে না এলেই ভাল করতেন।

আমি বললুম: বেগম সাহেবা, আপনি বৃথাই চিন্তা করবেন না। পাহাড়ী পথে চলতে প্রথম প্রথম একটা ক্লান্তি অনভ্যস্ত লোকদের আসেই। দুদিন অভ্যস্ত হলে দেখবেন এই পাহাড়ী পথে চলতেই ভাল লাগবে।

সিরাজাই বেগম বললেন: পাহাড়ী পথে তুমি আগে চলেছ আগা ?

আমি বললুম: বেগম সাহেবা আমি বান্দা। বহু বণিকের হাত ফের হতে হয়েছে আমাকে। অনেক জায়গা আমি দেখেছি। শাহী দরবারে আমাকে বিক্রী করা হয় এই কান্দাহার থেকেই।

—তোমার পথ চলতে ভাল লাগছে আগা ?

বললুম: খুব ভাল লাগছে বেগম সাহেবা। যদি সম্পূর্ণ নতুন হতুম, তবে আরো ভাল লাগতো। খুদাতালার অপূর্ব সৃষ্টি এমন করেতো হারেমের মধ্যে দেখা যায় না বেগম সাহেবা।

বেগম সাহেবা বললেন: তোমার তাহলে বিন্দুমাত্র কষ্ট হচ্ছে না।

আমি বললুম: সেকথা বললে মিথ্যে বলা হয় বেগম সাহেবা। একটানা ঘোড়ার পিঠে চলতে অনেক সময় আমার কোমরটা ব্যাথা করছে। সৈনিক হিসাবে আমিতো কখনো তামিল নিইনি। আর কষ্ট হচ্ছে, যখন আমার পশমী অঙ্গবস্ত্র ভেদ করে কন্‌কনে উত্তুরে শীতার্ত হাওয়া হাড়ের মধ্যে গিয়ে কামড়াচ্ছে। তা সত্ত্বেও সব মিলিয়ে আমার ভালই লাগছে বেগম সাহেবা।

সিরাজাই বেগম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : আগা, কান্দাহারে শিবির ফেলা হল। কিন্তু শাহতো আমার শিবিরে নিশি যাপন করতে এলেন না ?

সিরাজাই বেগমের মনের দুর্বলতা বুঝতে পারলুম। তার সর্বদা ভয়, শাহ বুঝি তার হাতের বাইরে চলে যাচ্ছেন।

আমি তাকে বললুম : বেগম সাহেবা এজন্যে আপনি বিন্দুমাত্র চিন্তা করবেন না। শাহ এখন যুদ্ধের পরিকল্পনা নিয়ে সেনাপতিদের সঙ্গে ব্যস্ত। দিগ্বিজয়ী যোদ্ধা যুদ্ধকালে অন্য কোনরকম চিন্তা করতে পারেন না। কিন্তু তিনি যখনই ক্লান্তি বোধ করবেন, তখন নিশ্চয়ই হারেম-শিবিরে এসে আপনার সঙ্গে নিশি যাপন করবেন। বেগম সাহেবা আমার কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হলেন কিনা জানি না। তিনি চুপ করে থাকলেন।

আমি বাইরে আসবার চেষ্টা করলে তিনি আমায় বললেন : আগা, শাহের সঙ্গে দেখা হলে তুমি তাকে জানিও যে, বেগম সাহেবা তাকে সালাম জানিয়েছেন।

আমি তাঁকে আশ্বস্ত করে বললুম : নিশ্চয়ই শাহকে আপনার সালাম জানাব বেগম সাহেবা।

সিরাজাই বেগমের শিবির থেকে বাইরে এসে আমি কান্দাহার দুর্গের দিকে তাকালাম। এই দুর্গ নিয়েই ইরাণের শাহের সঙ্গে ভারতের মোগল বাদশাদের বিবাদের সূত্রপাত।

বাবুর হিন্দুস্থান জয় করলেন লোদীদের হাত থেকে। আফগানদের বদলে হিন্দুস্থানের গদীতে বসলেন মোগলেরা। কিন্তু বাবুরের মৃত্যুর পর কিছুদিন যেতে না যেতেই আফগানদের অভ্যুত্থান হোল শের খাঁর নেতৃত্বে। হুমায়ূনকে হিন্দুস্থান থেকে বের করে দিয়ে তিনি নিজেই হলেন শাহ।

হুমায়ুন মানে সৌভাগ্য। কিন্তু নামের এমন বিপরীত অর্থ

একমাত্র এই মোগল শাহজাদা ছাড়া আর কারো ক্ষেত্রে দেখা যায় নি। গদিচ্যুত হয়ে তিনি পালালেন হিন্দুস্থান ছেড়ে। নিজের ভাই কামরাণও তাঁকে কাবুলে আশ্রয় দিল না। আর এক ভাই হিন্দালও তাঁকে কোন রকম সাহায্য দিতে রাজী হল না। মরুভূমি ঘুরে, পাহাড় পর্বত অতিক্রম করে, অবশেষে তিনি এসে আশ্রয় নিলেন ইরাণে। শাহ তামাশ তাঁকে আশ্রয় দিলেন।

সাহের সাহায্যে সেখান থেকে একটা মুষ্টিমেয় বাহিনী নিয়ে হুমায়ুন অধিকার করলেন কাবুল আর কান্দাহার। কথা ছিল হুমায়ুন কান্দাহার পারস্যের শাহকে ছেড়ে দেবেন। দিলেনও। কিন্তু কিছুদিন পরে আবার নিজে সেটা দখল করে নিলেন। তার পরেই শেষকালে ভারতে এসে আবার তিনি গদি উদ্ধার করলেন।

কিন্তু হিন্দুস্থান উদ্ধার করেও শাসন করতে পারলে না তিনি। নামাজের আজান শুনে পুঁথি ঘর থেকে নামতে গিয়ে পা হড়কে পড়ে মারা গেলেন তিনি।

সিংহাসনে বসলেন আকবর। হিন্দুস্থানের ইতিহাসে এত বড় সাম্রাজ্যবাদী বাদশা আর তখ্‌তে বসেন নি কখনো। ছোট বেলার গোলমালে সিংহাসন নিয়ে তিনি যখন ব্যস্ত, সেই ফাঁকে ইরাণের শা আবার দখল করে নিলেন কান্দাহার। হিন্দুস্থানে নিজের শক্তিকে কায়েম করে আবার কান্দাহারে বাহিনী পাঠালেন মোগল বাদশা। এবার আর লড়তে হল না, ঘুষ দিয়ে কান্দাহার দুর্গ হাত করে নিলেন। বিশ্বাসঘাতকতা করে দুর্গের সিপাহশালার দুর্গ ছেড়ে দিলেন আকবরের হাতে। কড়া মোগল পাহারা বসল। কিন্তু ইরাণের শাহের জেদ, কান্দাহার পুনর্দখল করতে হবেই।

ইরাণের প্রথম শাহ আব্বাস হিজ্‌রী ১০০৩ সালে বিরাট বাহিনী পাঠালেন কান্দাহার দুর্গ অধিকার করতে। কোন সুবিধে

হল না। অস্ত্র ছেড়ে তিনি কৌশলের আশ্রয় নিলেন। প্রীতি-সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে ঘন ঘন দূত পাঠাতে লাগলেন দিল্লীতে। ইরাণীদের তরফ থেকে ভয়ের কারণ নেই বুঝে মোগলেরা যেই একটু ঢিলে লাগাল প্রতিরক্ষাতে, হিজ্‌রী ১০১৯ সনে হঠাৎ দুর্গ অধিকার করে নিলেন শাহ আব্বাস। তখন দিল্লীর বাদশা জাহাঙ্গীর। তিনি শাহাজাদা খুরমকে হুকুম করলেন কান্দাহার যেতে। পাছে তাঁর অবর্তমানে দরবারে ষড়যন্ত্র হয়, এই ভয়ে শাহাজাদা যেতে রাজী হলেন না। সম্রাজ্ঞী নূরজাহান পেছনে লেগেছিলেন খুরমের। শাহজাদা বিদ্রোহ করলেন। গৃহযুদ্ধ বাধলো। কান্দাহার পুনর্দখলের চেষ্টা ভেস্তে গেল।

হিজ্‌রী ১০২৫ সালে শাহজাদা খুরম বসলেন দিল্লীর তখ্‌তে। পর বৎসরই মারা গেলেন শাহ প্রথম আব্বাস।

শা সফি বসলেন ইরাণের সিংহাসনে। সেই ফাঁকে কান্দাহারের ইরাণী সিপাহশালার আলিমর্দনকে ঘুষ দিয়ে মোগলেরা পুনরায় দুর্গ দখল করে নিলেন।

সফি মারা গেলেন হিজ্‌রী ১০২৯ সালে। ইরাণের গদিতে বসলেন শাহ দ্বিতীয় আব্বাস। বয়সে ছেলেমানুষ। কিছুদিন কাটল আভ্যন্তরীণ গোলমালে। অবশেষে দ্বিতীয় আব্বাস বিপদ কাটিয়ে উঠে রাজকার্য বুঝতে শিখেই হিজরী ১০৪৬ সালে আবার কান্দাহার দখল করে নিলেন।

মোগলদের মান ইজ্জৎ ধূলোয় মিশল। বাদশা শাজাহান তড়িৎ ঘড়িতে বাহিনী পাঠালেন শাজাদা আরংজেব আর সাদুল্লা খাঁর নেতৃত্বে। তাগদ দেখিয়ে যুদ্ধ করলেও মোগলেরা দুর্গ পুনর্দখল করতে পারল না। দ্বিতীয় বাহিনী এল হিজরী ১০৪৯ সালে সেই সাদুল্লা খাঁ আর আরংজেবের নেতৃত্বে। এবারও কোন ফয়দা হোল না। পর বৎসর বাদশার প্রিয় পুত্র শাজাদা দারা এলেন

বিরাট বাহিনী নিয়ে। তিনিও কিছু করতে পারলেন না। মোগল সাম্রাজ্যের প্রবেশ পথের চাবি কাঠি থাকল ইরাণীদের হাতে।

কিন্তু এ-যাবৎ কাল শাহেরা হিন্দুস্থানে যাবার তাগিদ অনুভব করেন নি। এই প্রথম চললেন শাহ নাদির কুলি। এবার। হিন্দুস্থানের প্রান্তরে শাহী ফৌজ আর বাদশাহী ফৌজে লড়াই হবে।

দুদিন কান্দাহারে বিশ্রামের পর শাহের হুকুমে তাবু উঠল। এবার আমাদের গজনীর দিকে যাত্রা। সেই তুষার শুভ্র বন্ধুর পথ - গিরিখাতের ভয়ঙ্কর বিভীষিকা। পাইন আর বার্চের সারি। বিমর্ষ চ্যুতপত্র চেনার বৃক্ষশ্রেণী। কখনো কুয়াশা, কখনো আলো। আলো ছায়ার খেলার মধ্য দিয়ে অবশেষে আমরা এসে পৌঁছুলাম গজনী।

বেগম সাহেবার সঙ্গে নাদির কান্দাহারে দেখা করেন নি। দেখা করলেন গজনীতে এসে। সুন্দর সুখ-নিশি যাপন করলেন বেগম সাহেবা গজনী এসে। নাদিরের মত একটা দীর্ঘকায় অমন বলিষ্ঠ মানুষ যে-কোন নারীকে তৃপ্তি দিতে পারে বৈকি।

পরদিন খুব খুশ মেজাজ দেখা দিলো বেগম সাহেবার। সেই সুযোগ আমি নিলুম। গজনীতে একদিন অপেক্ষা করে কাবুলের দিকে এগিয়ে যাবে শাহী ফৌজ। সেখানে সিপাহশালারের সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ হতে পারে। গজনীর কাহিনী অনেক শুনেছি আমি, সহরটা ঘুরে দেখবার ইচ্ছে ছিল আমার। আমীর সবুক্তিগীনের পুত্র সুলতান মামুদ সামান্য এক পার্বত্য সহরকে ইস্‌লামের দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় সহর তৈরী করে গিয়েছিলেন বেগম সাহেবার কাছে আমি অনুমতি চাইলুম দুই দণ্ড গজনী সহরটা ঘুরে দেখবার। খুশ মেজাজ ছিল বেগম সাহেবার, তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন।

যে গজনীর বর্ণনা পড়েছি উট্‌বি, বৈহাকীতে, সে গজনী আর নেই। নতুন সহর উঠেছে প্রাচীনের পাশাপাশি। ইতস্ততঃ

বহু স্থানেই ভাঙাচোড়া ইমারতের ভগ্নস্তূপ, পোড়ানো ছাইয়ের চিহ্ন। আমার মনে পড়ে গেল 'ফিরোজ কো'-র ঘুরীরা আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল গজনীকে। ঘুরীদের একজন নেতাকে জাহান্নামে পাঠান গজনীর এক সুলতান—বাহরাম। ক্রুদ্ধ ঘুরেরা আক্রমণ করেন গজনী। সুলতান বাহরম ভয় পেয়ে হিন্দুস্থানে গিয়ে আশ্রয় নেন। এমনি এক শীতের দিনে বাহরম আবার নতুন দলবল নিয়ে ফিরে আসে গজনীতে। ঘুর রাজবংশের দুইজন রাজপুত্র প্রাণ হারার্ণ বাহরমের হাতে। তাদের তৃতীয় ভাই আলাউদ্দীন হাসান রেগে আগুন হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন গজনীর উপর। লোক মেরে, বাড়ীঘর ভেঙে, জিনিষ-পত্র তছনছ করে, তিনি একাকার কাণ্ড করলেন। শেষে ধরিয়ে দিলেন আগুন। সাতদিন সাত রাত ধরে গজনী পুড়ল। সুলতান মামুদের সেই অপূর্ব স্থাপত্য সৃষ্টির আর কিছুই রইল না। এমন কি কবর খুঁড়ে পর্যন্ত মৃতের হাড় বাইরে ছুঁড়ে ফেলেছিল ঘুরেরা। শুধু মাত্র সুলতান মামুদের কবরের উপর হাত দেয়নি, নইলে আর কিছুই রাখেনি তারা। সেই কবর আমি দেখলাম। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আন্দাজ করবার চেষ্টা করলাম, কোথায় ছিল সেই মামুদের মাদ্রাসা, যেখানে দুনিয়ার সমস্ত বিষয় পড়ানো হত। কোথায়ই বা সেই অপূর্ব মসজিদ। যার নাম সুলতান স্বয়ং দিয়েছিলেন বেহেস্তের কনে। কিছু নেই, সব ভাঙা ইঁটের টুকরো আর ছাইগাদার নিচে লুকিয়ে আছে। আছে শুধু কবর আর সেই কবরের সামনে হিন্দুস্থানের গুজরাট থেকে নিয়ে আসা কাফেরদের মন্দিরের প্রবেশ পথ।

আমি হাত বুলিয়ে সেই কাফের কারিগরদের কাজ দেখলাম। অপূর্ব! গোড়া সুন্নী মুসলমান হয়েও তাই এই প্রবেশ পথটি ধ্বংস না করে নিজের সমাধি সৌধের পাশে বসিয়েছিলেন সুলতান। কি নির্মম, অথচ কি রোমাঞ্চকর ইতিহাস। এমন বিরাট ধ্বংসলীলা চোখে

পড়ে না। আলাউদ্দীন হাসান আজো লোকের কাছে 'জাহনে সজ' নামে পরিচিত হয়ে আছেন। অর্থাৎ তুনিয়া পোড়ানেওয়ালা।

গজনী থেকে কয়েকদিন পর আবার শাহী ফৌজ রওনা হল। এবার আমাদের উদ্দেশ্য কাবুল। শাহ ধারণা করে নিলেন, কাবুলে নিশ্চয়ই মোগল ফৌজ আমাদের বাধা দেবে। তাই সেনাপতিদের তিনি হুঁসিয়ার করে দিলেন।

পথের পাশে দৃশ্য এখনো প্রায় একই রকম। এখনো ঊর্ধে নীল আকাশ। তবে পর্বত তরঙ্গ ক্রমশঃ বেশী হয়ে আসছে। চেনার, পাইন, আর পাহাড়ী ঝাউ, শীতের স্পর্শ লেগে সঙ্কুচিত বোধ কচ্ছে। ইতস্তত, পথের ধারে ঝর্ণার রেখা ধরে পাহাড়ী বস্তী। ছোট ছোট নুড়ি বিছানো পাহাড়ী নদী এঁকে বেঁকে বিষধর সর্পের মত বয়ে গেছে। মাঝে মাঝে দ্রাক্ষা ক্ষেত। কোথাও পথের উপর পাহাড় ধ্বসে পড়েছে। ইরাণের সবুজ শ্যামলিমা নেই। ক্রমশঃ একটা রুক্ষতা ফুটে উঠছে। হয়তো কাবুলের কাছে প্রকৃতি তার দৃশ্য পাল্টাবে। বাবুর বাদশার আত্মচরিতে কাবুলের মনভোলানো প্রকৃতির বর্ণনা আছে।

যতই হিন্দুস্থানের দিকে এগুচ্ছি, সিরাজাই বেগমের মনে ততই নতুন নতুন চিন্তা দেখা দিচ্ছে। হারেমের অভ্যস্ত বিলাস-জীবনের সঙ্গে অভিযাত্রী জীবনের ধারায় পার্থক্য তো থাকবেই।

সিরাজাই বেগমের পাশাপাশি যাচ্ছিলাম আমি ঘোড়ার পিঠে চেপে। বেগমসাহেবার জন্য বিশেষ পাহাড়ী ঘোড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এরা বিশেষ ভাবে পাহাড়ে চলতেই অভ্যস্ত। অনভ্যস্ত সওয়ারকেও এরা নিরাপদে বহন করে নিতে পারে।

বেগম সাহেবা আমায় জিজ্ঞেস করলেন: আগা, মোগল কারা? তারা কি রকম, আমায় বলতে পার?

আমি বললুম: বেগম সাহেবা, মোগলরা আমাদেরই মত মানুষ।

মধ্য এশিয়ার তুর্কী আর মোঙ্গলদের সংমিশ্রনে মোগল জাতির উৎপত্তি। এই রকম পার্বত্য দেশেই তারা প্রথম বাস করত। ওমর শেখ মির্জা ছিল ফারগানার শাসক। তার পুত্র বাবুর। তিনি শৈবানী খাঁর কাছে হেরে, কাবুলে এসে নতুন রাজ্য গড়েন। সেখান থেকে যান হিন্দুস্থানে। বাবুরের বংশধরেরাই মোগল বাদশা হয়ে হিন্দুস্থান শাসন করছেন।

সিরাজাই বেগম বললেন : মোগলরা কি খুব শক্তিশালী ?

বললুম : একদা খুব শক্তিশালী ছিল বলে শুনেছি। বর্তমানে কি রকম বলতে পারি না। তবে যতদূর জানি, বাদশা আলমগীরের পরে কোন যোগ্য উত্তরাধিকারী দিল্লীর সিংহাসনে বসেন নি। নিত্য আত্ম-কলহ লেগেই আছে। চরিত্র বলতে আর মোগল বাদশাদের কিছু নেই। চরিত্রহীন পুরুষের শক্তি আছে বলে আমার জানা নেই। মোগলদের শক্তি কি রকম, কাবুলে গেলেই তা বুঝতে পারব। আমার মনে হয়, আমাদের কোন বাঁধার সম্মুখীন হতে হবে না। আমরা বহুক্ষণ মোগল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছি। কিন্তু আমাদের বাঁধা দেবার জন্য মোগল বাদশারা কোন আয়োজন করেছেন বলে তো মনে হয় না।

আমার কথায় বেগম যেন একটু সাহস পেলেন। তখন নারী-সুলভ কৌতূহল জাগল তাঁর মধ্যে। তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন : আমাদের যাত্রা শেষ হবে কোথায় গিয়ে ?

বললুম : বেগম সাহেবা, আমাদের যাত্রা কোথায় গিয়ে শেষ হবে তা নির্ভর করবে শাহের মর্জির উপর। যদি মোগল বাদশা কাবুলেই শাহের বশ্যতা স্বীকার করে তাঁর দাবি মেনে নেন, তাহলে হয়তো নদীনালা পার হয়ে হিন্দুস্থানের অভ্যন্তরে আর প্রবেশ করবার প্রয়োজন হবে না। তা না হলে শেষ পর্যন্ত হয়তো দিল্লীতেই যেতে হবে আমাদের।

বেগম সাহেবা জিজ্ঞেস করলেন : দিল্লী সহর কি রকম দেখতে ?

বললুম : বেগম সাহেবা আমার ইতিপূর্বে হিন্দুস্থানে আসবার সৌভাগ্য হয়নি। তবে দিল্লীর কথা আমি শুনেছি। মুসলমানেরা হিন্দুস্থান জয় করে প্রথম স্বাধীন সুলতানীর প্রতিষ্ঠা করেন দিল্লীতেই। লোদীদের আমলে আর মোগলদের আমলে কিছুদিন আগ্রা ছিল রাজধানী। বাদশা আকবর ফতেপুর সিক্রীতে নতুন রাজধানী তৈরী করেন। জাহাঙ্গীর বাদশা আগ্রাতেই থাকতেন। জাহাঙ্গীর বাদশার পুত্র বাদশা শাজাহান দিল্লীতে আবার নতুন করে রাজধানী স্থাপন করেন। বহু মনোমুগ্ধকর হর্ম্যরাজীতে তিনি রাজধানীকে সাজিয়েছেন বলে শুনেছি। মোগল হারেম নাকি দুনিয়ার আশ্চর্য সুন্দর জিনিযের মধ্যে একটি। মণিমুক্তাখচিত দেওয়ান-ই-আমে মোগল বাদশারা দরবার বসান। বাদশা শাজাহান মণিমুক্তাখচিত অপরূপ এক ময়ূর সিংহাসন তৈরী করেছেন। সেই সিংহাসনে বসে বাদশা দরবার করেন। তাঁর উষ্ণীযে জগতের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান হীরক খণ্ড শোভা পায়।

কোহিনুর মণি এবং ময়ূর সিংহাসনের কথা শুনে সিরাজাই বেগমের চোখে প্রবল কৌতূহল ফুটে উঠল। তিনি বললেন : আমি শাহের কাছে ঐ কোহিনুর এবং ময়ূর সিংহাসন চাইব।

বললুম : শাহের আপনাকে অদেয় কিছুই নেই। এ অভিযানে যদি আমাদের শাহ সাফল্য অর্জন করেন, তবে আপনার দাবি পূরণ করা তাঁর পক্ষে মোটেই অসম্ভব হবে না।

মণিমুক্তার কাহিনী শুনে আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে সিরাজাই বেগমের মনে। তিনি বললেন : তুমি দেখো আগা, আমি বলছি, এ-যুদ্ধে শাহ নিশ্চয়ই জয়লাভ করবেন।

বেগম সাহেবাকে মোগলদের সম্পর্কে অনুমান করে আমি যা

বলেছিলুম তাই সত্য হল। কাবুল রক্ষার জন্যও মোগলেরা তেমন ব্যবস্থা করেনি। কাবুলে ঢুকবার মুখে, কোন ফৌজ দুর্গের বাইরে এসে আমাদের বাধা পর্যন্ত দান করল না। শাহ নিতান্ত অবজ্ঞা ভরে কাবুল দুর্গ অবরোধ করলেন। কয়েকদিন অবরোধ করবার পরই দুর্গ প্রায় বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ করল।

দুর্গ অধিকার করে শাহ কয়েকদিন বিশ্রাম নিলেন কাবুলে। তারপর হিন্দুস্থানের সমতল প্রান্তরে নামতে লাগলেন। কাবুলে দেখবার খুব বেশী কিছু নেই। আছে কয়েকটি বাগিচা। আমীরদের কয়েকটি দ্রাক্ষাকুঞ্জ, আর প্রাচীন ধরণের একটি বাজার। কাবুলে থাকতেই বাবুর শাহের সমাধি দেখে নিলুম। পর্বতাকীর্ণ এক দুর্গম অঞ্চল কাবুল। এখানকার অধিবাসীরা দীর্ঘকায় পাঠান। অধিকাংশই উপজাতি। দুর্গম পাহাড়ের কোলে ঝর্ণার ধারে এরা বাস করে। এরা প্রকৃত পক্ষে কোন রাজা বাদশাকেই মানে না। চলে আপন খেয়ালে। সুসংবদ্ধ শক্তি নেই বলে, সহজেই কাবুল আমাদের করায়ত্ত হল। নইলে এই দুর্ধর্ষ জাতিকে জয় করতে সেকেন্দর শাকেও হিমসিম খেতে হত।

কাবুল থেকে হিন্দুস্থানের সমতলভূমির দিকে নামতে পারিপার্শিকের দ্রুত পরিবর্তন হতে লাগল। সেই পুরু বরফের আস্তরণ কমে গিয়ে ক্রমশঃই হাল্কা বরফের অঞ্চলে আসতে লাগলাম। প্রকৃতির মনোরম উপভোগ্যতা ক্রমশঃ রুক্ষ আকৃতি ধারণ করতে লাগল। আমাদের সামনে ভয়ঙ্কর গিরিবর্ত্ম। তার দুই ধারে অসভ্য উপজাতি সম্প্রদায়ের বাস। জামরুদ আর পেশোয়ারে আছে মোগল সেনানিবেশ। এই দুর্গম পথের মধ্য দিয়ে আমাদের নামতে হবে পাঞ্জাবের সমতল ভূমিতে।

শাহের হুকুমে একটা পার্বত্য ঝঞ্ঝার মত মোগল বাহিনী ভেদ করে শাহী ফৌজ এগিয়ে গেল। জামরুদ আর পেশোয়ারের মধ্য

দিয়ে যখন হারেম-শিবির অতিক্রম করল, তখন মোগলদের দাড়িটি পর্যন্ত দেখতে পাওয়া গেল না।

শীতের কামড় কমে আসছিল। পশমের পোষাকগুলিকে আর তত প্রয়োজনীয় বলে বোধ হচ্ছিল না। তথাপি সামান্য শীত ছিল। কিন্তু দুরন্ত হিন্দুকুশ সোলোমন পর্বতশ্রেণীর তুষার ঝড়ের কাছে এ কিছুই নয়। কান্দাহারের পর হাওয়া যেন দেহে চাবুক কষছিল। এখন স্নেহস্পর্শ বুলাতে লাগল। তখন নতুন পত্র গজাবার দিন। গাছে গাছে সবুজ পত্র দেখা গেল। আমি বেগমসাহেবাকে বললুম: বেগম সাহেবা, আমরা সমতল ভূমিতে নামছি।

সৌন্দর্য উপভোগ করবার দৃষ্টি বেগম সাহেবার নেই। তবু তাকেও দেখালাম—কেমন আশ্চর্য দৃষ্টিতে সব তাকিয়ে দেখছেন। পাষাণের কাঠিন্য কমে, ক্রমেই পায়ের নীচে মাটী দেখা দিচ্ছে। ঘাসগুলো ক্রমশঃ সবুজ হচ্ছে।

অবশেষে একদিন সকালবেলা অবাক চোখে আমরা সকলে আশ্চর্য হয়ে দেখলুম, সামনে আমাদের বিস্তৃত রুপোর পাতের মত প্রসারিত কলকল. ছলছল স্রোত। সামনে আমাদের সিন্ধু নদ। আমরা এসে গেছি অট্টকের কাছে। নদী পার হলেই ওপারে লাহোর। শাহের লক্ষ্য প্রথম লাহোরে গিয়ে শিবির সন্নিবেশ করা।

অপরূপ এক দেশের উপর দিয়ে আর এক অপরূপ দেশে আমরা এসে গেছি। তুষারের উজ্জ্বল হাসির স্রোত ছাড়িয়ে সূর্যের নির্মল আলোর ছটা।

যে বেগম সাহেবা আপন স্বার্থ এবং অর্থ ছাড়া কিছুই বোঝেন না, সিন্ধু দরিয়া দেখে তিনি যেন আনন্দে আত্মহারা হলেন। যেন হাততালি দিয়ে উঠলেন তিনি। আগা, আগা, আমাদের সামনে এটা কি?

বললুম: বেগম সাহেবা, একেই দরিয়া বলে। আফগান

পর্বতের আনাচে কানাচে যে-সব গিরিখাদ-রেখাকে এ-পর্যন্ত আমরা দরিয়া বলে বর্ণনা করেছি, তা প্রকৃতপক্ষে বেগবতী পাহাড়ী ঝর্ণা ছাড়া আর কিছুই নয়। সামান্য বৃষ্টি বা শিলাপাতে মুহূর্তে যে ভয়ঙ্কর উচ্ছল তরঙ্গে তরঙ্গিতা, পরমুহূর্তেই তার বক্ষতলে স্রোতশূন্য ছড়ানো উপলখণ্ড। এ-দরিয়া কখনো জলশূন্য হয়না। এর ব্যাপক প্রসার হাজারো কমলেও কখনো ঝর্ণার মত শীর্ণরেখা হয়না। এর গভীরতা আমাদের কল্পনার বাইরে। আমাদের এই বিরাট বাহিনী নিয়ে যদি আমরা দরিয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়ি তবে সকলেই তলিয়ে যাব।

আমার কথা শুনে, ভীত, বিস্মিত, বিস্ফারিত নেত্রে বেগম সাহেবা সিন্ধু নদের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আমি বললুম: সমস্ত পাঞ্জাবের উপর দিয়ে এর বহু শাখা-প্রশাখা গিয়েছে। সে-সব অতিক্রম করে আমরা যাব দিল্লীর দিকে। দিল্লীর প্রান্তেও একটি বিরাট দরিয়া আছে, তার নাম যমুনা। আরো পূর্বে গঙ্গা, হিন্দুস্থানের সর্ববৃহৎ নদী। চির শ্যামল প্রকৃতির দেশ এই গঙ্গার ধার দিয়েই। তারপর আরো, আরো, আরো বহু নদ নদী।

বেগম সাহেবা বললেন: এ এক বিচিত্র দেশ আগা। কখনো ভুলবার নয়।

আমি বললুম: এই হিন্দুস্থানের তিন দিক অসীম জলরাশির দ্বারা বিস্তৃত, তার নাম সমুদ্র।

অবাক চোখে তাকিয়ে বেগম সাহেবা বললেন: এই দরিয়ারই মত বড়?

হাসলুম আমি: দরিয়া কি বলছেন বেগম সাহেবা? তার কোনই কূলই নেই। শুধু পানি পানি আর পানি—কান্দাহারের পর যেমন আমরা দেখেছি শুধু ঢেউ খেলানো পাহাড় আর পাহাড়।

বেগম সাহেবা বললেন: আগা, এই দরিয়া পার হয়ে আমাদের ওপার যেতে হবে?

—আজ্ঞে বেগম সাহেবা।

—কেমন করে যাব?

বললুম: একটু অপেক্ষা করুন, এক্ষুনি তা দেখতে পাবেন।

পূর্বাহ্নেই অগ্রবর্তী ফৌজেরা এসে শাহী ফৌজকে ওপারে নিয়ে যাবার জন্য জেলেদের নৌকা সংগ্রহ করেছিল। পর পর শক্ত করে নৌকা বেঁধে এপার থেকে ওপার পর্যন্ত একটা ভাসমান সেতু তৈরী করা হল। দ্বিপ্রহরে শাহী ফৌজ সেই সেতুর উপর দিয়ে নামল ওপারে। আশ্চর্য! নদী পার হবার সময়ও মোগল ফৌজেরা তেমন বাঁধা দিতে পারল না। সহজেই লাহোরের সিপাহশালার পরাজিত হলেন। শাহীফৌজ লাহোরে শিবির গড়ল।

মোগলদের কীর্তি লাহোরেও অনেক আছে। প্রথম কীর্তি সকলেরই চোখে পড়ল—লাহোর দুর্গ। লালপাথরের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। চারিদিকে পরিখা। উচ্চে একদিকে হারেম। আর একদিকে সেনানিবাস। লাল পাথরের পাশাপাশি অনেক শ্বেত মর্মর খচিত গৃহ। শুনেছি বাদশা আকবর থেকে জাহাঙ্গীর পর্যন্ত মোগল স্থাপত্যে লাল পাথর ব্যবহার হত বেশী। শাজাহান ধারা পাল্টে দেন। তিনি শ্বেত মর্মের ভক্ত ছিলেন। দুর্গের উপর স্থাপত্যকর্মগুলি দুইটি ভিন্ন রুচির সাক্ষী। বহু মসজিদ লাহোরে। হিন্দুস্থানী আর মুসলমানী প্রথাতে তৈরী বহু ইমারৎ। উর্ধ গগনের দিকে শত শত গম্বুজ।

শুনেছি, এই লাহোরের কাছেই চরম খেয়ালী এবং বিলাসী বাদশা জাহাঙ্গীরের কোথায় সমাধি আছে। সময় যদি উপযুক্ত হত তবে দেখে আসতুম। কিন্তু এখন একটা যুদ্ধের আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। লাহোরও সহজে আত্মসমর্পন করেছে বটে, কিন্তু শাহ সংবাদ পেয়েছেন—দিল্লীর বাদশার টনক নড়েছে। তিনি স্বয়ং বেরিয়েছেন লালকেল্লা থেকে বাছাই বাছাই সেনাপতিদের নিয়ে।

তিনি অনেকদিন খালের ধারে কার্নাল নামক স্থানে বিরাট বাহিনী নিয়ে আমাদের শাহের পথ রোধ করবার জন্ত শিবির গড়েছেন।

লাহোর থেকে কার্নালের দূরত্ব খুব বেশী নয়। শাহ লাহোরে নেমেই কোন্ পথে কার্নালে যাবেন সেনাপতিদের নিয়ে সেই পরামর্শ করতে বসেছেন। এ-সময় কোন কিছু ঘুরে দেখবার সময় নয়। সুতরাং আমি মনের বাসনাকে মনের মধ্যেই চেপে গেলাম।

ছদিন অপেক্ষা করবার পর শাহ কার্নাল রওনা হলেন। কার্নাল সহরের কাছে বসে ছিল মোগল ফৌজ। সহর থেকে পশ্চিমে ছুই ক্রোশ দূরে আমাদের শাহ তাঁর সৈন্ত সমাবেশ করে ব্যূহ রচনা করলেন। বেগম শিবিরের পাশে দাঁড়িয়ে আমি দূরে মোগল শিবির এবং অসংখ্য হিন্দুস্থানী ফৌজ দেখতে পেলাম।

যে পথে আমরা এসেছি হিন্দুস্থানের মধ্যে প্রবেশ করবার এটাই মুখ। এর কাছেই তরাইণ, যেখানে রায় পিথোরাকে পরাজিত করে মহম্মদ ঘুরি হিন্দুস্থানে ঢুকেছিলেন। এখানেই কাছে পানিপথ, যেখানে বাবুর বাদশা ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে আগ্রার সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। দ্বিতীয় বার এই পানিপথেই আকবর রাজা হিমুকে পরাজিত করে মোগলদের জন্ত হিন্দুস্থান উদ্ধার করেছিলেন। ছু-একদিনের মধ্যে কার্নালে আবার হিন্দুস্থানের ভাগ্য পরীক্ষা হবে।

যে ছুর্ধর্ষ তুর্কী-রক্ত এবং মোগল-রক্ত বাবুর বাদশাকে অদম্য সাহসে উজ্জীবিত করেছিল, দেখলুম সে সাহস আর রক্তের তেজ মোগল বাদশাদের মধ্যে আর অবশিষ্ট নেই। ভীরু মোগল বাদশা মহম্মদ শা আমাদের আক্রমণ করবার জন্ত শিবির ছেড়ে আর এগিয়ে আসতে পারলেন না।

বাদশাকে সাহায্য করবার জন্ত আসছিলেন তাঁর অযোধ্যার

সিপাহশালার, সাদাত খাঁ বুরহান উল্‌মুলক। সংবাদ পেয়ে আমাদের শাহ গোপনে কিছু ইরাণী ফৌজ পাঠালেন। সাদাত খাঁর পশ্চাতে রসদ আর যুদ্ধ সরঞ্জাম দখল করবার জন্য। সাদাত খাঁ যখন কার্নালে এসে পৌছুলেন, হঠাৎ পশ্চাৎ থেকে আমাদের শাহী ফৌজ তার রসদ আর যুদ্ধ সরঞ্জাম আটক করলে। বিন্দুমাত্র বিশ্রামের অবসর পেলেন না সাদাত খাঁ। তৎক্ষণাৎ তাঁর পশ্চাৎ শিবির উদ্ধার করবার জন্য ঝাপিয়ে পড়লেন ইরাণী ফৌজের উপর। বুরহান উল্‌মুলকের সাহায্যে এগিয়ে এলেন, খান দৌরান। রক্তাক্ত যুদ্ধ চলল শাহী ফৌজ আর বাদশাহী ফৌজের মধ্যে।

কামানের শব্দ, বারুদের ধূয়া, অশ্বের হ্রেসা, সেনাবাহিনীর চিৎকার, সব মিলে এক ভয়াবহ পরিবেশের সৃষ্টি করল।

অমন যে ভয়ানক রমণী সিরাজাই বেগম, তার মুখও দেখলুম শুকিয়ে উঠেছে। বেগম সাহেবা ভীতি বিহ্বল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন : —কি হবে আগা ?

আমি বললুম : বিন্দুমাত্র চিন্তা করবেন না, বেগম সাহেবা। আমাদের ফৌজ জয়লাভ করবেই।

বেগম সাহেবা বললেন : কারা জিতছে, কারা হারছে, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না আগা ?

বললুম : বেগম সাহেবা, অভিজ্ঞ যোদ্ধার চোখ ছাড়া, যুদ্ধের চরিত্র অনুধাবন করা কষ্টকর। আমিও স্পষ্ট কিছু দেখতে পাচ্ছি না। মনে হয় কোন উঁচু কিছু আশ্রয় করতে পেলে যুদ্ধের গতিটা নিরুপণ করা যেত।

আমাদের শিবরের পাশে কয়েকটা ভারবাহী উট দাঁড়িয়েছিল। সিরাজাই বেগম বললেন : আগা তুমি এই উটের উপর উঠে দূরে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা কর।

প্রস্তাবটা মন্দ মনে হল না। যুদ্ধের অবস্থা জানবার জন্য আমি

ব্যস্ত ছিলুম। একটা উটের পিঠে উঠে দূরে তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করলুম। হাজার হাজার সৈন্য ইতিমধ্যেই রণক্ষেত্রে মৃত্তিকা আশ্রয় করেছে। আমাদের শাহী-ফৌজ অপেক্ষা বহুগুণ বেশী পড়েছে বাদশাহী ফৌজ। কিন্তু আশ্চর্য! বাদশা মহম্মদ শা নিজাম উল্‌মুল্‌ককে নিয়ে নিষ্ক্রিয় দাঁড়িয়ে আছেন। বুঝলুম, হয় বাদশাহী দরবারে আমিরদের মধ্যে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে, নয়তো হিন্দুস্থানের বাদশাটা একটা কাপুরুষ।

বেগম সাহেবা নিচু হয়ে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, কি দেখছ আগা?

বললুম: বেগম সাহেবা, কোন চিন্তার কারণ নেই, আমরা জয়লাভ করছি।

সিরাজাই বেগম বললেন: খোদা হাফেজ।

সিরাজাই বেগমের মুখে খোদার নাম উচ্চারিত হতে শুনে আমি হাসলুম।

শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ শেষ হল। বাদশাহী বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। শাহী ফৌজের প্রচণ্ড উল্লাসে কর্ণালের প্রান্তর মুখরিত হয়ে উঠল।

আমি উট থেকে নামলুম।

বেগম সাহেবা জিজ্ঞেস করলেন: কি হল?

বললুম: আমরা জয়লাভ করেছি।

বেগব সাহেবা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

উটের পিঠ থেকে আমি দেখতে পেয়েছিলুম একজন উল্লেখযোগ্য কোন বাদশাহী সেনাপতিকে বন্দী করে আনা হয়েছে। আর একজন বাদশাহী সেনাপতি আহত, কিন্তু তাকে পলাতক বাদশাহী ফৌজেরা নিজেদের শিবিরে নিয়ে গেছে।

এই মুহূর্তে শাহের শিবিরে গেলে অনেক সংবাদ পাওয়া যেত। সুতরাং আমার মনের বাসনা বেগম সাহেবাকে ভেঙে বললুম।

বেগম সাহেবার আগ্রহ আমার চাইতেও বেশী ছিল। সুতরাং তৎক্ষণাৎ আমায় তিনি অনুমতি দিলেন। আমি অন্যান্য খোজাদের সতর্ক করে দিয়ে শাহের শিবিরের দিকে চললুম।

দেখলুম, আমার ধারণাই ঠিক। শাহী সেনাপতিদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে আমাদের শাহ বসে রয়েছেন। অজেয় সেনাপতি বীর রুস্তমের মত দেখা যাচ্ছে তাঁকে। শাহ নাদিরের দীর্ঘ শিংস্ত্রাণে বসানো মণিমুক্তাগুলি ঝলমল করে জ্বলছে। যোদ্ধাবেশে নাদিরকে অপূর্ব দেখায়। এমন পৌরুষ-ব্যঞ্জক দীপ্তি খুব কম মানুষেরই দেখা যায়।

নাদিরের সামনে বন্দী একজন আহত মোগল সেনাপতি। নাম জানলুম, সাদাত খাঁ বুরহান উল্‌মুল্‌ক। অভূতপূর্ব বিক্রমে ইনিই যুদ্ধ করছিলেন।

নাদির বীর পুরুষের মর্যাদা দিতে জানেন। যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে আহত বুরহান উল্‌মুল্‌ককে বসবার আসন দিলেন। তারপর মোগল সেনাবাহিনীর প্রকৃত অবস্থা তাঁর কাছে জানতে চাইলেন।

আমাদের শাহ, বুরহান উল্‌মুল্‌ককে দেখে মোগলদের সম্পর্কে ভুল বুঝছিলেন। ভাবলেন, মোগলেরা যুদ্ধে এখনো পরান্মুখ নয়। তিনি বাদশা মহম্মদ শার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করবার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

সাদাত খাঁ বুরহান উল্‌মুল্‌ক বললেন : হঠাৎ যুদ্ধ আরম্ভ হবে, বাদশা মহম্মদ শা এটা বুঝতে পারেন নি। আমি আমার রসদ আর যুদ্ধ সরঞ্জাম উদ্ধারের জন্য বাদশার নির্দেশ ব্যতিরিকেই যুদ্ধ আরম্ভ করেছিলাম।

নাদির জিজ্ঞাসা করলেন : মহম্মদ শার শিবিরে এখন কত সৈন্য আছে বলে আপনার অনুমান ?

সাদাত খাঁ বললেন : বাছাই বাছাই আশি হাজার সৈন্য বাদশার নিজস্ব পরিচালনাধীনে রয়েছেন। এ ছাড়া রয়েছে, নিজাম উলমুল্কের অধীনেও বিরাট একটি বাহিনী। মোগলদের মূল বাহিনীর সঙ্গে এখনো আপনার সংঘর্ষ হয়নি।

শাহ গম্ভীর ভাবে কি একটু ভাবলেন। কোন উত্তর দিলেন না।

আহত মোগল সেনাপতি আপনা থেকেই বললেন : শাহেন শা, আমি মুসলমান হিসাবে আপনার কাছে অনুরোধ করছি, অযথা মুসলমানের রক্তে তরবারি কলঙ্কিত করবেন না। কিছু ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করে স্বদেশে ফিরে যাওয়াই আপনার পক্ষে শ্রেয় হবে।

আমাদের শাহ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সাদাত খাঁ বুরহান উল্ মুল্কের মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন বিচার করে দেখলেন। তারপর কিছুক্ষণ ভেবে বললেন : পারস্যে ফিরে যাবার ক্ষতিপূরণ হিন্দুস্থানের বাদশা কত দিতে পারেন বলে আপনার মনে হয় ?

উল্মুল্ক বললেন : আপনি হিন্দুস্থানের বাদশার কাছ থেকে এ বাবদ দুই কোটী স্বর্ণমুদ্রা দাবি করতে পারেন।

সঙ্গে সঙ্গে দেখলুম আমাদের শাহের চোখ দুটো চক্ চক্ করে জ্বলে উঠলো। ইরাণে এত ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি নেই। ক্ষতিপূরণের এই বিরাট অঙ্ক শাহ নিজেই কল্পনা করতে পারেন নি।

শাহ বললেন : এ সম্পর্কে আমি চিন্তা করে দেখব। আজ আপনি বিশ্রাম করুন।

সাদাত খাঁকে বন্দী শিবিরে নিয়ে যাওয়া হল। যাবার পূর্বে সাদাত খাঁ শাহকে আর একবার আবেদন জানিয়ে গেলেন যেন তাঁর প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখা হয়।

আমি জানতুম, শাহ এবং তার মন্ত্রীপরিষদের উত্তর কি হতে পারে। এই বিরাট অঙ্কের অর্থ তিনি অস্বীকার করতে পারেন না। শাহ রাজী হলেন।

সাদাত খাঁর একজন বিশেষ দূত, এই প্রস্তাব নিয়ে গেলেন মোগল শিবিরে। বাদশা মহম্মদ শা এ সম্পর্কে আলোচনা করবার জন্য শাহের শিবিরে নিজাম উল্‌মুল্‌কে পাঠালেন। কিন্তু খুদাতালার মনে অন্য ইচ্ছা ছিল। চুক্তি পাকা হতে গিয়েও হল না।

সাদাত খাঁ বুরহান উল্‌মুল্‌কের সঙ্গে আর একজন মোগল সেনাপতি যিনি বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে আহত হয়েছিলেন পরদিন মারা গেলেন। তিনি ছিলেন মোগল বাদশার মির বকশী। এই পদটার দিকে লোভ ছিল সাদাত খাঁ আর নিজাম উল্‌মুল্‌ক দুয়েরই।

সুযোগ নিলেন নিজাম উল্‌মুল্‌ক। আমাদের শাহ দু:কোটী স্বর্ণমুদ্রা পেয়ে হিন্দুস্থান ত্যাগ করতে রাজী হয়েছিলেন। নিজাম বাদশাহকে বোঝালেন, তাঁরই চেষ্টায় নাদির শাহ হিন্দুস্থান ত্যাগ করে যেতে রাজী হয়েছেন। সুতরাং এতবড় একটা কাজ করবার পুরস্কার হিসাবে, মির বকশীর পদটা তাঁরই পাওয়া উচিত। বাদশা মহম্মদ শা মির বকশীর পদটা তাঁকেই দিলেন।

শুনে শাহের শিবিরে বন্দী সাদাত খাঁ এত ক্ষুব্ধ হলেন যে কি বলব। বাদশার অকৃতজ্ঞতার কথা ভেবে তিনি তাঁকে শাস্তি দিতে উদ্যত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শাহের শিবিরে এসে তিনি জানালেন, পূর্বে তিনি যা বলেছেন সেটা বানানো কথা। ভীরু মোগল বাদশার শিবিরে এমন কোন শক্তি নেই যা দিয়ে তিনি ইরাণের শাহকে আটকে রাখতে পারেন। সুতরাং শাহের উচিত মোগল বাদশার কাছ থেকে দুকোটী স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্তে বিশকোটি স্বর্ণমুদ্রা দাবি করা।

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শাহ, তাঁর মন্ত্রিপরিষদ আহ্বান করলেন। হিন্দুস্থানের উপর ইরাণিপক্ষে যার জ্ঞান সর্বাপেক্ষা বেশী ছিল তিনি কান্দাহারের আহমদ খাঁ। আহমদ খাঁ আমাদের শাহকে বোঝালেন, তার বরাবরই ধারণা, হিন্দুস্থানে প্রচুর ঐশ্বর্য আছে, যার কাছে দুই

কোটী বা বিশ কোটী স্বর্ণমুদ্রা অত্যন্ত তুচ্ছ। শাহের উচিত দিল্লী লুণ্ঠন করা।

আমাদের শাহের ঐশ্বর্যের প্রতি বিরাট একটা দুর্বলতা ছিল। শুধুমাত্র আমাদের শাহের কেন, মধ্যএশিয়ার সকল লোকেরই ঐশ্বর্যের লোভ। কারণ আর্থিক সঙ্গতি রাজা থেকে প্রজা কারোইর সেখানে তেমন নেই।

শাহ তৎক্ষণাৎ তাঁর সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেললেন। তিনি মোগল বাদশার শিবির থেকে নিজাম উল্‌মুল্‌ককে ডেকে পাঠালেন। নিজাম আমাদের শিবিরে এসে পৌঁছানো মাত্র তাঁকে কোন কৈফিয়ৎ না দিয়ে বন্দী করা হল। সঙ্গে সঙ্গে শাহী ফৌজ পাঠিয়ে মোগল বাদশার শিবিরে ঘিরে ফেলা হল।

একটা ভীরু নারী-বিলাসী বাদশা প্রকৃতপক্ষে বিনাযুদ্ধে আমাদের শাহের হাতে বন্দী হলেন।

আমাদের শাহ মোগল বাদশা মহম্মদ শাকে শিবিরে ডেকে প্যঠালেন।

মোগল বাদশার শিবির থেকে ইতিমধ্যেই অনেক আমির পালিয়েছিলেন। আমাদের সন্দেহই সত্য ছিল। মোগল আমিরদের মধ্যে তখন রীতিমত অন্তর্দ্বন্দ্ব চলেছে—তুরাণী আর ইরাণী আমিরদের মধ্যে। ইরাণ থেকে ভাগ্যান্বেষী বেশ কিছু লোক এসে মোগল দরবারে বড় বড় রাজপদ নিয়ে জাঁকিয়ে বসেছিলেন। মোগল বাদশাকে তাঁরা নিজেদের হাতের মুঠোর মধ্যে আনবার চেষ্টা করছিলেন। আমাদের শাহের হিন্দুস্থান আক্রমণে তাঁদের সুবিধাই হয়েছিল। তুরাণীরা ভয়ে পালালেও—বাদশার শিবিরে ইরাণী আমিরেরা থেকে গিয়েছিলেন। আমাদের শাহের তলব পেয়ে মোগল বাদশা ভয় পেয়ে এই ইরাণী আমিরদের সঙ্গে নিয়ে শাহী শিবিরে এলেন।

আমাদের শাহ অত্যন্ত বদমেজাজী লোক। আমরা ভাবলাম এই

কাপুরুষ মোগল বাদশার প্রতি না জানি কি দুর্ব্যবহার করেন। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলুম, শাহ তাদের অভ্যর্থনা জানাতে ত্রুটি করলেন না। নিজের বামপার্শ্বের আসনে তিনি মোগল বাদশা মহম্মদ শাকে বসবার নির্দেশ দিয়ে তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা করলেন।

মোগল বাদশাকে আমি ভাল করে তাকিয়ে দেখলুম। মধ্য-বয়সের এই বাদশাহর সর্বদেহে লাম্পট্যের ছাপ। মদ্যপান আর উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য চোখের কোণে কালি। আধপাকা দাড়ি। বয়স ঢাকবার জন্য তাতে তিনি মেহেদী পাতার রং লাগিয়েছেন। তাঁর দুই চোখে আমাদের শাহ-ভীতি।

মোগল বাদশা ইরাণী আমির ইশাক খাঁ, আমির খাঁ আর আসাদ খাঁকে আমাদের শাহের সঙ্গে কথা বলবার জন্যে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। তারা সকলেই শাহ নাদির কুলিকে কুর্নিশ জানালেন।

আমাদের শাহ মোগল বাদশাকে বললেন: শুনেছি, হিন্দুস্থান রূপকথার ঐশ্বর্যের দেশ। আমি সেই ঐশ্বর্য সংগ্রহ করতে এসেছি।

হিন্দুস্থানে সময়টা গ্রীষ্মের হলেও তখনো শীত শীত ভাব ছিল। তথাপি আমাদের শাহের সামনে মোগল বাদশা রীতিমত ঘর্মাক্ত হচ্ছিলেন। তিনি নীরব ভঙ্গিতে আমাদের শাহের কথায় অনুমোদন জানালেন।

মোগল বাদশার হয়ে উত্তর দিলেন মহম্মদ ইশাক খাঁ। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন: শাহেনশার ধারণা মিথ্যে নয়।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মোগল বাদশার এই আমিরটিকে তাকিয়ে দেখলেন আমাদের শাহ। তারপর মহম্মদ শাকে জিজ্ঞেস করলেন: আপনার এ সভাষদটি কে?

মহম্মদ শা বললেন: ইনি একজন আমির। ইরাণ থেকে হিন্দুস্থানে এসেছিলেন। বর্তমানে আমার সভাষদ। এখন আপনার বান্দাদের মধ্যে একজন।

আমাদের শাহ ইশাক খাঁকে প্রশ্ন করলেন : দিল্লীতে সে রূপ-কথার পরিচয় নিশ্চয় আমরা পাব? দিল্লীর প্রাসাদ নিশ্চয়ই আমাদের হতাশ করবে না?

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে ইশাক খাঁ বললেন : শাহেন শা সে দিল্লী আর নেই। তবে একদিন সত্যই দিল্লী রূপকথার রাজধানী ছিল। দিল্লীর সেই হারানো দিন যদি আজ থাকতো, তবে শাহেন শার বাহিনী কার্ণাল তো দূর স্থান, হিন্দুস্থানের পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে আসতে পারতো কিনা সন্দেহ।

বুঝলুম ইরাণের অধিবাসী হলেও হিন্দুস্থানে এসে মহম্মদ ইশাক খাঁ এ দেশকে ভালবেসে ফেলেছেন। তার চোখ দুটো অশ্রুর আবেগে ছল ছল করছিল। আমাদের শাহও তাঁর যন্ত্রণাটা কোথায় তা বুঝলেন। তবু আঘাত দেবার জন্যেই যেন বললেন : নদী মরে গেলেও তার রেখা থাকে। দিল্লীতে সে পরিচয় নিশ্চয়ই কিছুটা পাব, কি বলেন?

ইশাক সে প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না।

শাহ, বাদশা মহম্মদ শাকে বললেন : দিল্লীতে গেলে সম্রাট নিশ্চয়ই অতিথি আপ্যায়নের ত্রুটি করবেন না?

করুণ চোখে মহম্মদ শা শাহ নাদিরের দিকে তাকালেন। এ কথার তিনি কি উত্তর দেবেন? প্রকৃত পক্ষে দিল্লী এখন নাদির শাহেরই। তাঁর করুণার উপরই মহম্মদ শার অস্তিত্ব নির্ভর করছে। নাদিরের ইঙ্গিতের অর্থ সকলেই কাছেই স্পষ্ট। নাদির দিল্লী লুণ্ঠন করতে চান।

মহম্মদ শার চোখের কোণে জল দেখতে পেলুম। তিনি বললেন : শাহেন শা, আপনার অভিপ্রায়ের উপর আমাদের কিছু বক্তব্য নেই। দিল্লী এখন আপনার। আপনার যা মর্জি তাই করবেন।

শাহের চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, দিল্লী লুণ্ঠনের জন্য তিনি

স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেছেন। তাঁকে আর কোন রকমেই ফেরানো যাবে না।

শাহ মহম্মদ শাহকে মোগল শিবিরে ফিরবার অনুমতি দিলেন।

সমস্ত দেখে শুনে আমি সিরাজাই বেগমের শিবিরে ফিরে এলুম। আমি জানি বেগম সাহেবা অধৈর্য হয়ে সমস্ত কিছু জানবার জন্য অপেক্ষা করছেন।

আমি শিবিরে গিয়ে পৌঁছুতেই বেগম সাহেবা অধীর আগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন: আগা, আমাদের শাহের খবর কি বল?

বললুম: বহুৎ খুস খবর বেগম সাহেবা। আমাদের শাহ দিল্লী যাবেন বলে স্থির করেছেন।

—কেন?

—দিল্লীতে অফুরন্ত ঐশ্বর্য আছে। আমাদের শাহের ইচ্ছা সেই ঐশ্বর্য তিনি লুণ্ঠন করবেন।

ঐশ্বর্যের কথা শুনে আমাদের বেগম সাহেবার চোখ দুটোও যেন জল জল করে জ্বলে উঠল। মধ্য এশিয়ার যে-কোন লোকেরই ঐশ্বর্যের কথা শুনলে এমনি করে চোখে আলো ফুটে উঠে।

বেগম সাহেবা বললেন: দিল্লীতে কত ঐশ্বর্য আছে?

বললুম: সে ঐশ্বর্য অফুরন্ত। মুখে তার বর্ণনা দেওয়া যায় না বেগম সাহেবা। মামুদ শা হিন্দুস্থান লুণ্ঠন করে হাজার হাজার উটের পিঠে এ দেশের ঐশ্বর্য লুণ্ঠন করেও তাকে নিঃশেষিত করতে পারেন নি। আমির তৈমুরও অজস্র ঐশ্বর্য নিয়ে গিয়েছিলেন। এত লুণ্ঠনের পরও বাবুর শা যখন হিন্দুস্থানে আসেন সুলতানী হারেমের ঐশ্বর্য দেখে তিনি আশ্চর্য হয়েছিলেন। দুনিয়ার সমস্ত রাজা বাদশা অপেক্ষা মোগল বাদশারা সম্পদশালী। আশ্চর্য সব মণিমুক্তা মোগল হারেমে সঞ্চিত আছে।

বেগম সাহেবা বললেন: আগা, আমরা যদি দিল্লীতে যাই, বেছে বেছে হারেম থেকে মণিমুক্তা সংগ্রহ করব। তুমি আমার পাশে থেকে আমায় উপযুক্ত মণিরত্ন বাছাই করে দেবে।

আমি বললুম: বেগম সাহেবার হুকুম মতই এ বান্দা কাজ করবে।

বেগম সাহেবা তখন শাহের কথা জিজ্ঞাসা করে আমায় বললেন:—শাহ, যুদ্ধের উন্মাদনায় এ কয়দিন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নি। এবার কি তিনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন না?

বললুম: শাহ এবার খুস্ মেজাজে আছেন। এবার তিনি অতি শীঘ্রই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন বলে আশাকরি।

বেগম সাহেবা বললেন: শাহ এলে আমি তাঁর কাছ থেকে নিজেই ইচ্ছামত মণিমুক্তা সংগ্রহের অনুমতি চাইব।

আমি বললুম: শাহ আপনাকে যথেষ্ট পেয়ার করেন। আপনাকে অদেয় তাঁর কিছুই নেই।

বেগম সাহেবা যখন সৌভাগ্যের কথা চিন্তা করে রঙিন স্বপ্নে মসগুল হচ্ছিলেন, সেই সময় বোধ হয় খুদাতালা অদৃশ্যে মানুষের ভাগ্যকে পরিহাস করে হাসছিলেন।

বেগম সাহেবার সঙ্গে আমি যখন কথা বলছিলাম হঠাৎ সেই সময় শাহের শিবির থেকে আমার জরুরী তলব এল। এই মুহূর্তে শাহের জরুরী তলবের অর্থ আমি বুঝতে পারলুম না।

বেগম সাহেবা আমার মুখের দিকে তাকালেন: হঠাৎ, শাহ তোমাকে জরুরী তলব করলেন কেন আগা?

বললুম: বুঝতে পাচ্ছি না, নিশ্চয়ই শুভ সংবাদ হবে।

বেগম সাহেবা বললেন: শাহের সঙ্গে দেখা হলে, তাকে আমার সেলাম জানিও। বোল, আমি তার সাক্ষাৎ পাবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।

আমি নিশ্চয়ই শাহকে জানাব, বেগম সাহেবাকে এই আশ্বাস দিয়ে শিবির ত্যাগ করলুম।

শাহের শিবিরে গিয়ে দেখি কান্দাহারের আহম্মদ খাঁকে নিয়ে তিনি কি পরামর্শ করছেন। শাহের দুই চোখে পূর্বের ন্যায়ই লোভের আলো। ভাবলুম, শাহ বুঝি আরো বেশী ঐশ্বর্যের সংবাদ পেয়েছেন। আমি শাহকে কুর্ণিশ করে দাঁড়ালুম।

শাহ বললেন: আগা, আমি খুব বড় ঐশ্বর্যের সন্ধান পেয়েছি, চল, তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।

আমি কিছু না বুঝতে পেরে শাহের মুখের দিকে তাকালুম।

শাহ বললেন: আহম্মদের কাছে শুনলুম, মোগল বাদশা হারেমের কিছু বাছাই বাছাই সুন্দরী মেয়েছেলেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। বাদশার শিবিরের পিছনে তাদের শিবির পড়েছে।

হেসে বললুম: শাহেন শা, মণিমুক্তার কথা শুনে আমি অন্য প্রকার ভেবেছিলুম।

শাহ হেসে বললেন: আগা, মণিমুক্তা বলতে তুমি কি শুধু মূল্যবান পাথর বোঝ? সুন্দরী রমণীরাও কি মণিমুক্তা নয়? তুমি জাননা, পুরুষের কাছে সুন্দরী রমণী মণিমুক্তার চাইতেও মূল্যবান। শুনলুম মোগল সুন্দরীদের জগতে তুলনা মেলে না। যদি সত্যই এমন কোন রত্ন মেলে, তবে হারেমের জন্য তাকে সংগ্রহ করে নিয়ে যাব।

সেই মুহূর্তে আমার সিরাজাই বেগমের কথা মনে পড়ল। তিনি যখন এই সংবাদ শুনবেন, তখন একটা আবদ্ধ সিংহীর মত মনে মনে গর্জাতে থাকবেন। বেগম সাহেবার চরিত্র তো আমি জানি।

বেগম সাহেবা গভীর আগ্রহ নিয়ে শাহের অপেক্ষায় বসে আছেন। তাঁর ধারণা শা তাঁর রূপে একান্ত মুগ্ধ। তার সেই মোহ যাতে কোন রকমেই ভেঙে না যায়, সে-জন্য শাহের চোখের উপর থেকে সমস্ত সুন্দরী রমণীদের তিনি সরিয়ে রাখতে চান। শাহের

অনুপস্থিতিতে হারেমের সফাভিদ সুন্দরী বেগমদের উপর তিনি এই উদ্দেশ্যে নির্মম অত্যাচার করেছিলেন। খাদিজা সুলতানকে দেখবার জন্য তিনি পাগল হয়ে উঠেছিলেন। সত্যি যদি মোগল বাদশার জেনানা শিবিরে সে-রকম কোন অঘটন ঘটে?

ইতিমধ্যেই শাহ মোগল জেনানা শিবির পরিদর্শন করবার জন্যে মহম্মদ শার অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। অনুমতির প্রয়োজন ছিল না। পরাজিত শত্রুর অনুমতির মূল্য কি? তথাপি সৌজন্যবোধ থেকেই আমাদের শাহ মোগল বাদশার অনুমতি চেয়েছিলেন। শাহের সেই প্রার্থনার উত্তর কি আসবে আমাদের জানাই ছিল। বাদশা-মহম্মদ শা অনুমতি পাঠালেন।

তখন সূর্য আসমানের গায় পশ্চিম দিকে কিছুটা ঢলে পড়েছিল। হিন্দুস্থানে অপরাহ্ণ রৌদ্রের একটা মাদকতা আছে। শাহ মোগল জেনানা শিবিরের দিকে রওনা হলেন। বাছাই বাছাই দেহরক্ষী নিয়ে আহম্মদ খাঁ শাহের সঙ্গে চললেন।

বাদশা শিবিরকে বাঁয়ে রেখে আমরা মোগল জেনানা শিবিরের দিকে চললুম। মৃতের শোক নিয়ে বাদশার শিবির যেন নীরব নিস্পন্দ হয়ে আছে। আহম্মদের রক্ষীবাহিনী জেনানা শিবিরের পাশ থেকে মোগল শিবির-রক্ষীদের হটিয়ে দিল। শাহ আহম্মদ এবং আমাকে নিয়ে জেনানা শিবিরে প্রবেশ করলেন।

পূর্বেই শাহের নির্দেশ সারিবেঁধে জেনানাদের দাঁড়িয়ে থাকবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। শিবিরে ঢুকেই তাদের সারবেঁধে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলুম।

জেনানাদের মধ্যে হারেমের বেগমেরা কম ছিলেন। শুধুমাত্র ছিলেন একজন রাজপুত বেগম। মহম্মদ শায়ের সর্বাপেক্ষা সুন্দরী বেগম বৈজুসাহিবা নাকি দিল্লী হারেমেই রয়েছেন। এখানে যারা এসেছেন তারা অধিকাংশ নর্তকী এবং বাঁদী।

শিবির সন্নিবেশ প্রচুর অর্থব্যয় করে করেছেন মোগল বাদশা। ভেতরে প্রবেশ করলে আমরা যে যুদ্ধক্ষেত্রে রয়েছি একথা চিন্তা করে কার সাধ্য। যুদ্ধক্ষেত্রে কোন বেকুব এত জাঁকজমক করে আসে, একথা কখনো ভাবতে পারিনি। মোগলদের বিলাসের কথা শুনেছিলুম, এবার দেখলুম। লোকে বলে মোগলদের শিবির হল চলমান নগরী। একথা সত্য। এই জন্যেই কোন বিদেশী আক্রমণকে হিন্দুস্থানের শাসকেরা বাঁধা দিতে পারেন না। আরাম করে, আয়েস করে, বিলাস করে কি যুদ্ধ করা যায় ?

শিবিরে ঢুকতেই শাহ আমাকে বললেন : আগা, ভাল করে দেখো। সব চাইতে মূল্যবান রত্নটি আহরণ করা চাই।

আমি শিবিরে ঢুকেই শাহের নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেকটা মেয়ে মানুষের দেহ, দেহছন্দ, মুখের আদল সব লক্ষ্য করে দেখতে লাগলুম। সোনা রুপার কাজ করা মণিমুক্তা খচিত পোষাক পরেছে প্রায় সকলেই। সকলেরই প্রায় নিষ্কলঙ্ক সৌন্দর্য। যেন আসমানের বুকে নক্ষত্রের মেলা বসেছে। কোন্ নক্ষত্র অসুন্দর ?

কিন্তু এর মধ্যেও একটি আমাদের নজরে পড়ল। সমস্ত অনাবৃত মুখের মধ্যে একটি মুখ আবৃত ছিল। বোরখাতে ঢাকা। বুঝলুম উনি মহম্মদ শাহের বেগম। তার পাশে দাঁড়িয়েছিল একটি মেয়ে। মেয়েতো নয়, যেন কোন ভাস্করের পাথর কুঁদে তৈরী করা একটি মূর্তি। নিখুঁত। ঘনকালো কৃষ্ণবর্ণ কেশ বিণুনীতে আবদ্ধ হয়ে বিলম্বিত বিষধর একটি সর্পের মত কোমর ছাড়িয়ে নিতম্ব প্রদেশের বহু নিম্ন পর্যন্ত ঝুলছে যেন হিন্দুস্থানের এই অপরাহ্নের স্নিগ্ধ রং তার সর্বাঙ্গ জুড়ে। মসৃণ ত্বক। বিন্দুমাত্র তার কোথাও সামান্যতম চর্মস্ফুটের কলঙ্কও নেই। ঘন কালো দুটি তুলিতে আঁকা ভুরু। সুতীক্ষ্ণ নাসিকা। দাড়িম্বের দানার মত রঙিন ওষ্ঠ। সর্বত্র সামঞ্জস্য রক্ষা করে একটি পরিমিত মুখমণ্ডল। যেন সারি সারি দীর্ঘ ঝাউ-

পাতার মত নেত্রপল্লব! তার মধ্যে হিন্দুস্থানের আষাঢ়ের ঘন কালো মেঘের মত চোখের দুটি মণি। যৌবনের সমস্ত রসে যেন সে মণিদুটি ভরপুর। না দীর্ঘ, না হ্রস্ব, অত্যন্ত পরিমিত সুন্দর গ্রীবা। উত্তুঙ্গ স্তন যুগল সালোয়ার ঠেলে ঊর্ধে উঁকি দিয়ে আছে। সেই স্তনাগ্রে কামিজের উপর দুটো মূল্যবান পাথর জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে। সুডৌল বাহু। চম্পক ফুলের কলির মত অঙ্গুরগুলি। সুন্দর পরস্পর সন্নিবিষ্ট জঙ্ঘাদ্বয়। তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঈষৎ উত্থিত নিতম্ব দেশ। পদ্মের পাপড়ির মত পায়ের আঙুল। এরকম পরিমিত একটি নারীদেহ আমি পূর্বে কখনো কল্পনা করতে পারিনি।

গ্রীস ট্রয়ে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল যে রমণীকে নিয়ে সেই গ্রীকরাণী হেলেনও এত সুন্দর ছিলেন না বোধ হয়।

ইরাণের হারেম, আফগান পর্বতে, এমন কি তুরাণ দেশে হেন সুন্দরী রমণীর কথা আমি শুনিনি। ইরাণী, তুরাণী, বা আফগান রমণী কারো বৈশিষ্ট্যই এ রমণীর মধ্যে নেই। কোন্‌ দেশের কোন্‌ জাতের নারী এ, আমি ভাবতে লাগলুম।

শুধু আমার নয় আহম্মদ খাঁ এবং শাহের দৃষ্টিও পড়েছিল সেই রমণীর উপর। একজন মোগল খোজা আমাদের সঙ্গে ছিল। তাকে শাহ জিজ্ঞাসা করলেন: এ কোন্‌ দেশের রমণী?

খোজা বলল: ইনি হিন্দুস্থানের রাজপুত রমণী।

শাহ আর একবার তাকিয়ে দেখলেন তার দিকে।

আমি দেখলুম, সেই রাজপুত রমণীর সজল মেঘ সদৃশ আঁখিতারা থেকে তখন বজ্রের মত আগুন ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে। তার নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হচ্ছে। তার ওষ্ঠ প্রদেশ কঠিন হয়েছে।

বুঝলুম, আমাদের সকলের দৃষ্টি তার উপর পড়াতে সে ক্ষুব্ধ হয়েছে। কিন্তু আমাদের শাহের মুগ্ধ দৃষ্টি নিবদ্ধ তার উপর। তার সমস্ত পৌরুষ-ব্যক্তিত্ব ঢেলে দিয়ে শাহ যেন তাকে বশ করবার

চেষ্টা করছেন। শাহকে রমণীর রূপে এমন মুগ্ধ হতে ইতিপূর্বে দেখিনি।

আমি ভাবলুম, সিরাজাই বেগমের কপাল পুড়ল। শাহকে আর কোনদিনই সে নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে পাবে না। সিরাজাই-এর দেহে কামোন্মাদনা ব্যতীত আর কিছুই নেই। তিনি নিজেকে সেই ভাবেই সজ্জিত করেন। এই দেহের উপর কামের উর্ধে আরো কি যেন আছে। বোধহয় তা-ই নারীত্ব। এখনো বিংশ বৎসর অতিক্রম করেনি এ। দেহের পাতায় তাই নতুন পাতার মত একটা লাবণ্য।

শাহ মোগল খোজাকে জিজ্ঞাসা করলেন : এর নাম কি ?

খোজা বলল : সিতারা।

দুইবার অস্ফুট ভাবে শাহ উচ্চারণ করলেন : সিতারা ! সিতারা ! সঙ্গে সঙ্গে তিনি সিতারার দিকে এগিয়ে গেলেন।

একটা ভুজঙ্গিনীর মত ফোঁস করে উঠল সিতারা। মুহূর্ত মধ্যে কোমরে লুক্কায়িত একটা ছুরি বের করল সে। শূন্যে সেই কোমল হস্তধৃত ছুরিকাটি সাপের জিহ্বার মত লক্ লক্ করে উঠল। ঘন ঘন উষ্ণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে লাগল সিতারা।

শাহ হাসলেন। যেন মেঘের ফাঁকে কড় কড়াৎ করে বজ্রপাতের শব্দ হল। তারপর সেই শব্দের প্রতিধ্বনির মত গম্ভীর কণ্ঠে শাহ ডাকলেন : সিতারা !

থর থর করে কাঁপতে লাগল সিতারা।

শাহ নিজের হাত বাড়িয়ে দিলেন সিতারার দিকে : দাও, তোমার ছুরিকাটি আমার হাতে দাও।

বিস্ফারিত নিষ্পলক দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ সিতারা শাহের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। শাহের সেই দৃষ্টিতে যেন একটা যাদুকরের ইন্দ্রজাল ছড়িয়ে ছিল। সিতারা অভিভূত হল। মন্ত্রমুগ্ধের মত শাহের আদেশ পালন করে, সে ছুরিকাখানি তাঁর হাতে তুলে দিল।

শাহ আদেশ করলেন: "আগা, সিতারাকে আমার শিবিরে নিয়ে যাও।" আমাকে এই আদেশ দিয়ে শাহ মোগল জেনানা শিবির থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

আমি সঙ্গে সঙ্গে কল্পনা করতে পারলুম, সিতারা কোথায় চলেছে। শাহের হারেমে কোথায় তার স্থান হবে।

ভাবি বেগম সাহেবাকে আমি সঙ্গে সঙ্গে কুর্ণিশ জানালুম।

এ কথা নিশ্চয় জানলুম, সিরাজাই বেগমের কপাল পুড়লো। দিল্লী হারেমে গিয়ে তিনি আপন ইচ্ছা মত রত্ন বেছে নেবে বলে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। শাহ সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন নিজের হাতে রাখলেন। এ রত্ন নিশ্চয়ই তিনি সিরাজাই বেগমের হাতে ছেড়ে দেবেন না।

সেই মুহূর্তেই মোগল শিবিকা করে সিতারা চলে এলেন শাহের শিবিরে। সঙ্গে সঙ্গে বাদশা মহম্মদ শাহের অভিনন্দন এল, আপনি আমাদের সংগ্রহের একটি রত্ন গ্রহণ করে সন্তুষ্ট হয়েছেন জেনে খুশি হলুম।

শাহ আমাকে প্রশ্ন করলেন: আগা, সিতারাকে সিরাজাইয়ের পাশাপাশি জেনানা হারেমে রাখা সম্পর্কে তোমার কি অভিমত?

শাহ কি বলতে চান, আমি বুঝলুম। সিরাজাই বেগমের চরিত্র তিনি ভাল করেই জানেন। তিনি চান সিতারার নিরাপত্তা।

বললুম: শাহেন শা, নতুন বেগমকে পৃথক শিবিরে রাখাই আমি যুক্তিযুক্ত মনে করি। বেগম সাহেবার শিবির থেকে সিতারা বেগমের শিবিরের দূরত্ব অনেকটাই হওয়া উচিত।

শাহ বললেন: তুমি আমার দক্ষিণ পার্শ্বের শিবিরে সিতারাকে নিয়ে গিয়ে তার আপ্যায়নের যথাযোগ্য ব্যবস্থা কর। তাকে প্রয়োজনীয় বান্দা এবং বাঁদী সরবরাহ কর।

শাহের হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে সিতারা বেগমের জন্য নয়া শিবিরের ব্যবস্থা হল। আমিই হলাম তার প্রধান খোজা প্রহরী।

সিরাজাই বেগম এ ঘটনা এখনও শুনেছেন কিনা জানিনা। কিন্তু আজ হোক, কাল হোক তিনি শুনতে পাবেন।

আমি আর তাঁর কাছে আদপে কোনদিন ফিরে যাব কিনা কে জানে। আমাকে ফিরে যেতে না দেখে সিরাজাই বেগম নিশ্চয়ই নিতান্ত উৎকণ্ঠায় নানা কথা কল্পনা করবেন।

নতুন শিবিরে সিতারা বেগম এলেন। আমি তাকে গভীর মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলাম। তিনি কি একটা বন্দিনী সিংহীর মত ছটপট করছেন? না বিচ্ছেদ-কাতর একটা বিহঙ্গিনীর মতন কি তিনি? সে রকমও মনে হল না তাঁকে? সিতারার মনোস্তত্ব একটা দুর্বোধ্য রহস্যে ঘেরা। তার ইতিহাস সম্পূর্ণ না জানলে তাকে ধরা যাবে না। কেমন একটা দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে তিনি দূর শূন্যের দিকে তাকিয়ে বসে থাকলেন শিবিরের মধ্যে।

আমি ভাবতে লাগলুম, মোগল হারেমে এই অপূর্ব সুন্দরী রমণী তাঁর যথাযোগ্য মর্যাদা পেয়েছিলেন কি? যদি পেয়ে থাকবেন, তবে বেগম সাহেবা না হয়ে মহম্মদ শার একজন রাজপুত মহিষীর পরিচারিকা হয়ে থাকবেন কেন?

মহম্মদ শাহ কি এই অনিন্দ্য সুন্দরী তরুণীকে কোনদিন ভালবাসার চেষ্টা করেছেন? মনে হয় না।

শুনেছি উধম বাঈ নামে এক নর্তকীর রূপ-লাবণ্যে তিনি মুগ্ধ। তাকে সাদি করে হারেমে উঠিয়েছেন বৈজু সাহিবা নাম দিয়ে। সে কি তবে সিতারার চাইতেও রূপসী? এর চাইতে রূপসী রমণী কেমন হতে পারে, আমার কল্পনায় এল না।

সিতারা কি কখনো ভালবাসার আস্বাদ পেয়েছে জীবনে? পুরুষের মত পুরুষের স্পর্শ কি পেয়েছে? যদি পেয়ে থাকে, তাহলে কি শাহকে সে গ্রহণ করতে পারবে? যদি না-ই পেয়ে থাকে

তবু কি শাহকে গ্রহণ করা তার পক্ষে সম্ভব হবে? শাহের সঙ্গে তার বয়সের পার্থক্য বিরাট। শাহ প্রৌঢ়ত্বে, সিতারা যৌবনের উত্তুঙ্গ শিখরে।

নারী কোন্ পুরুষকে ভালবাসে? কবি, শিল্পী, প্রেমিককে? না যোদ্ধাকে? ঐশ্বর্যকে, না মানবতাকে? জানি না। খোজা হয়ে নারীর মনের সে খবর আমি জানব কি করে?

সিরাজাই বেগম কি নাদিরকে ভালবাসেন? মনে হয় না। তিনি ভালবাসেন, নাদিরের ক্ষমতাকে, ঐশ্বর্যকে। মানুষের উপর একাধিপত্য স্থাপন করতে চান তিনি। নাদির সেই ক্ষমতার উৎস। তাই নাদিরকে আকড়ে ধরে আছেন তিনি। তার মধ্যে ভালবাসা আছে বলে মনে হয় না।

নারী যদি পুরুষকে ভালবাসে, তবে সিতারার পক্ষে নাদিরকে ভালবাসা সম্ভব। প্রৌঢ়ত্বেও নাদিরের পুরুষত্ব ক্ষুণ্ণ হয় নি। ইরাণ তুরাণ আর হিন্দুস্থানে তাঁর মত বলিষ্ঠ পুরুষ আর কে আছেন? নাদিরের চোখে অনিন্দ্য লাবণ্যে ডুবে যাওয়ার ইসারা দেখেছি। তিনি সিতারাকে ভালবাসবেন। কিন্তু সিতারা?

শুনেছি রাজপুত রমণী ভয়ঙ্করী। ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে নিয়ে যথেচ্ছ বিহার করা যায় না। প্রয়োজনে রাজপুত রমণী শত্রুর টুটি চেপে ধরতে পারে। আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হলে স্বামীকে সে দুর্গের মধ্যে ঢুকতে দেয় না। সতীত্ব নাশের সম্ভাবনা দেখলে হাসতে হাসতে সে চিতার অনলে আত্মবিসর্জন দেয়। সিতারা কি, কে জানে? ধীরে ধীরে তার রহস্য উন্মোচন করতে হবে।

সন্ধ্যায় শাহের শিবির থেকে আমার ডাক এল। শিবিরে গিয়ে দেখি, শাহের মধ্যে একটা অস্থিরতা। কামবাণে শাহ কি জর্জরিত

হয়েছেন? প্রণয়োন্মাদ বা কামোন্মাদ পুরুষের মধ্যে এমন চাঞ্চল্য দেখা দেয় বলে শুনেছি।

শাহ বললেন: আগা, তুমি সিতারাকে গুছিয়ে রাতে আমার শিবিরে পাঠিয়ে দাও।

আমি তৎক্ষণাৎ শাহের কথায় সায় না দিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

শাহ বললেন: তুমি কিছু বলবে মনে হচ্ছে আগা?

বললুম: শাহেন শা, গোস্তাকী নেবেন না। অপরিচিতা একটি মেয়েকে সম্পূর্ণ ভাল করে না জেনে শাহের নিশিসঙ্গিনী করা কি উচিত হবে? বিশেষ করে সে রাতপুও রমণী—অনভিপ্রেত ব্যাপারে ভয়ঙ্করী হয়ে উঠতে পারে। শাহের নিরাপত্তার কথা ভেবে……।

শাহ উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন। বললেন: একটা সামান্য মেয়েছেলে দেখে ভয় পেলে পুরুষের পৌরুষত্ব থাকে না আগা। পুরুষ যদি পুরুষের মত হয়, রমণীর কাছে সে কখনো অপাংক্তের হয় না। সিতারাকে তুমি চিনতে পার নি। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে আমি তাকে বুঝে নিয়েছি। তার নারীসত্তার কোন মূল্য দেয় নি মোগল বাদশা মহম্মদ শা। প্রকৃত পক্ষে সমগ্র মোগল সাম্রাজ্যে পুরুষ বলতে এখন কেউ নেই। কোন রমণী মোগল বাদশার আশ্রয়ে সন্তুষ্ট হতে পারে না। আমি তাকে ভালবাসব আগা। ভালবাসার স্বাদ সিতারা পায় নি। তার দুই চোখের দৃষ্টি দেখেই বুঝেছি, তার জীবন এক বিরাট বঞ্চনার ইতিহাস। দেখনি রুষে উঠলেও হঠাৎ আমার চোখের দিকে তাকিয়ে সে কেমন শান্ত হয়ে গেল? কারণ আমার চোখের দৃষ্টি সে চিনেছিল। বুঝেছিল, এখানে বঞ্চনা নেই।

শা পুরুষ, সিতারা রমণী। দুইয়ের মধ্যে মুহূর্তে অদৃশ্য তরঙ্গের কি ঢেউ খেলে গিয়েছে, আমার পক্ষে সেটা বোঝা সম্ভব নাও হতে পারে, কারণ আমি খোজা।

আমি শাহ্‌কে কুর্ণিশ জানিয়ে বললুম: শাহেন শা, আপনার সুখ-নিশি যাপনের আমি শীঘ্রই ব্যবস্থা করছি। আমাকে অল্পমাত্র সময় অনুমোদন করুন।

শাহ হেসে বললেন: যাও, সিতারাকে তুমি যথাযোগ্য সম্মানে আমার শিবিরে নিয়ে এস।

সিতারার মনোতুষ্টির জন্য এ শিবিরে এনেই যথাযোগ্য ব্যবস্থা করেছিলাম। শাহী হারেমের রুচিসম্পন্না বাঁদীদের এনে সিতারার সেবায় নিযুক্ত করেছিলাম। শিবিরে উপবিষ্টা সিতারার হুকুমের অপেক্ষায় তারা সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে অপেক্ষা করছিল। সিতারার মনোতুষ্টির এতটুকু ত্রুটি হলে শাহের হুকুমে তাদের গর্দান যাবে।

সম্মান প্রদর্শনে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করা হয় নি। এই মুহূর্তকয়েক পূর্বেও যে ছিল কাপুরুষ মোগল বাদশার একজন অবহেলিতা রাজপুত মহিষীর সহচারিণী, এখন সে দুনিয়ায় শাহ নাদির কুলির প্রণয়িণী রমণী। তার ইচ্ছায় এখন মুহূর্তে প্রলয় ঘটতে, মোগল বাদশার দুর্বল শির এই মুহূর্তে স্কন্ধচ্যুত হয়ে ধুলায় লুটাতে পারে। সে ইচ্ছা করলে মোগল বাদশা স্বয়ং তার পানিবরদার হতে পারে। ভাগ্যের এই অভাবিত পরিবর্তনের জন্য সিতারা কি সন্তুষ্ট হতে পারেনি? সে রাজপুত হিন্দু রমণী। মোগল বাদশা আর ইরাণের শাহ তার কাছে সমান।

আমি শিবিরে ঢুকে সিতারা বেগমকে কুর্ণিশ জানালাম।

না ক্রোধ—না আনন্দ, কেমন বিস্ময়ে ভরা দৃষ্টিতে সে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। ইতিপূর্বে বাঁদী ছিল বলে নিশ্চয়ই কেউ তাকে কুর্ণিশ করেনি।

আমি বললুম: বেগম সাহেবা, শাহ নাদির আপনার কুশল সংবাদ জানতে চেয়েছেন।

নাদিরের নাম শুনে, অপ্রসন্ন মনে হল না সিতারা বেগমকে।

এই তার মধুর কণ্ঠের প্রথম ঝঙ্কার শুনলুম : শাহকে আমার সালাম জানিও।

আমি বললুল : আপনি যদি অসন্তুষ্ট না হন তাহলে শাহ আপনার দর্শন পাবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

ছুটি চোখ নামিয়ে নিল সিতারা বেগম।

বললুম : এই বান্দাকে যদি হুকুম করেন, তবে শাহের শিবিরের পথে আপনাকে প্রহরা দিয়ে নিয়ে যেতে পারি।

সিতার বেগম উঠে দাঁড়ালেন।

আমি বুঝলুম, সিতারার জীবন একটা সাধারণ বালিকার মত সহজ সরল। সে কূটবুদ্ধিশালিনী মেয়েমানুষের মত কথা বলতে জানে না। রাজদরবারের মহিলা হবার মত উচ্চ শিক্ষাদীক্ষাও সে পায় নি। কোন মুহূর্তে তার রাজপুতানী রক্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেও তার সত্যিকার অকৃত্রিম নারীস্বভাব আবার ফিরে এসেছে। এখন সে বান্দা নয়, বাঁদী নয়, বেগম নয়,—নারী। আমি তাকে শাহের শিবিরের দিকে পথ দেখালুম।

শাহ অধীর আগ্রহে সিতারার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। শিবিরে ঢুকতেই গভীর আগ্রহে তিনি সিতারার হাত ধরে নিয়ে নিজের পাশে উপবেশন করালেন। আমি বাইরে এসে আমার তরবারি উন্মুক্ত করে দুয়ারে খোজা প্রহরী হয়ে দাঁড়ালুম।

সিতারা শাহের হাত ধরতে এবার ইতস্তত: করে নি। তার মধ্যে লজ্জানত নববধূর এক নম্রতা দেখতে পেলুম। হয়তো শাহ ঠিকই অনুমান করেছিলেন, যে পুরুষ সিতারা সারা জীবন কামনা করেছে, অদ্যাবধি তাকে পায় নি। শাহের মধ্যে সেই পুরুষকে দেখতে পেয়েছে সে। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললুম। কেন যেন আমার ভাল লাগল। হয়তো এই প্রথম আমিও জীবনে নারী দেখলুম। খাদিজা সুলতানকেও দেখে এসেছি। এ নারীত্ব তারও নেই।

প্রণয়ে হতাশা, স্বপ্নের ব্যর্থতা, আফগানদের লাঞ্ছনা, তার কোমল নারীত্বকে নষ্ট করে দিয়েছে।

সারারাত আমি দুয়ারে প্রহরী হিসাবে কাটালুম। রাত্রিতে জেগে বেগম মহল প্রহারা দেওয়াই আমার কাজ।

ভোরবেলা শাহ আমাকে ডাকলেন। আমি কুর্নিশ জানাতে জানাতে শিবিরে প্রবেশ করলুম। দেখলুম শাহের মুখে অপূর্ব তৃপ্তির আস্বাদ। ইতিপূর্বে এমন তৃপ্তির ছায়া শাহের মুখে আমি আর কখনো দেখিনি। সিতারা বেগমের সর্বাঙ্গে এক লজ্জার নম্র ছায়া নেমেছে।

শাহ বললেন: আগা, বেগম সাহেবাকে তাঁর শিবিরে নিয়ে যাও। আজ থেকে তাকে আমার প্রধানা বেগমের মর্যাদা দেবে। বেগম সাহেবার সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দের দিকে লক্ষ্য রাখবার দায়িত্ব আমি তোমার হাতে দিলাম।

আমি সিতারা বেগমকে কুর্নিশ জানিয়ে বললুম: বেগম সাহেবা, আপনার মর্জি মাফিক এই বান্দাকে যে-কোন হুকুম করবেন।

আমি বেগম সাহেবাকে পথ দেখিয়ে বাইরে নিয়ে এলুম।

শাহ দেহরক্ষী আহম্মদ খাঁকে ডাকলেন। আমি শুনতে পেলুম তিনি তাকে বলছেন: আহম্মদ তুমি আমাকে মোগল সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ রত্ন পেতে সাহায্য করেছ। তোমাকে যথাযোগ্য ভাবে পুরস্কৃত করব।

আমি জানলুম, আহম্মদ খাঁর ভাগ্য ফিরল।

॥ চার ॥

ভোরবেলাই শাহ হুকুম দিলেন শিবির উঠিয়ে দিল্লী রওনা হবার জন্যে।

মোগল বাদশা আর ইরাণের শাহের মধ্যে বিরোধ দীর্ঘ দিনের। কোন মোগল বাদশা ইস্পাহানে গিয়ে পৌঁছুতে পারেননি, কিন্তু আমাদের শাহ দিল্লী চলেছেন।

মোগল শিবির এবং শাহের শিবির দুই-ই উঠল। বাদশা মহম্মদ শা আমাদের শাহের পাশাপাশি ঘোড়ার পিঠে চেপে চললেন। নিজাম উল্‌মুল্‌ককেও শাহ বন্দী করে নিয়ে চললেন। দিল্লীর গোপন তথ্য তাঁর কাছ থেকেই সংগ্রহ করতে হবে। বাদশা মহম্মদ শা'র অকৃতজ্ঞতা দেখে তিনি ভয়ানক ক্ষুব্ধ হয়ে তার সর্বনাশে উদ্যত হয়েছেন।

শাহের পাশাপাশি চলছিলেন বাদশা মহম্মদ শা। তাঁর পেছনে বন্দী নিজাম উল্‌মুল্‌ক। পৃথক সারিতে শিবিকা করে নেবার ব্যবস্থা হল বুরহান উল্‌মুল্‌ককে।

সামনে চলল পদাতিক সৈন্য দুইদিকে ঘোড়সওয়ার। মাঝখানে ও আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলল শাহী পদাতিক ফৌজ। সব শেষে জেনানা মহল। প্রথম শাহী মহল, তারপরে বাদশাহী মহল। সর্বশেষে শাহী অশ্বারোহী ফৌজ ও রসদ বাহিনী—ঘোড়া, খচ্চর, উট, গরুর গাড়ী সব।

আমি মাঝে মাঝে পেছনে তাকিয়ে দেখতে লাগলুম। সিরাজাই বেগমের দলকে আন্দাজ করতে পাচ্ছি। কিন্তু বেগম সাহেবাকে দেখতে পাচ্ছি না। সিতারা বেগমের কথা তিনি শুনতে

পেয়েছেন ? যদি শুনে থাকেন, না জানি কি অশান্তির আগুনে জ্বলছেন তিনি।

পাণিপথ থেকে দিল্লীর দূরত্ব খুব বেশী নয়, পঞ্চাশ ক্রোশের মত। যে ভাবে চলেছি, এভাবে চললেও তিনদিনের শেষে দিল্লীতে পৌঁছাব আমরা। পথ আর বন্ধুর নয়। মৃত্তিকা সমতল। পাঞ্জাবের ভূমি উর্বর। সর্বত্রই আবাদি-জমি। মাঝে মাঝে লোকালয়। কর্ষিত শস্যক্ষেত্রে সবুজ শস্য ফুটেছে। সিন্ধুনদের শাখা নদী ইতস্ততঃ প্রবাহিত পাঞ্জাবের উপর দিয়ে। কোথাও মৃত স্রোতস্বিনীর ধারা। কোথাও বা সেচের খাল, সুলতানী আমলের কীর্তি। মাঝে মাঝে, বহু প্রাচীন দুর্গ ও ইমারৎ। দুর্গগুলির নির্মাণ কৌশল সবটাই ইস্‌লামী ঢংয়ের নয়। হিন্দুস্থানী আর মুসলমানী শিল্পরীতি এক হয়ে মিশেছে এখানে।

মাঠের মধ্যে বাবলা গাছ প্রচুর। মরা নদীর রেখা ধরে অজস্র কাঁশবন। সমতল ভূমির এক অদ্ভুত রাজত্বে প্রবেশ করেছি আমরা। হাওয়া এখানে অনেক ভারি। শীতের তীব্রতা অনেক কম। আরামদায়ক রোদে অশ্বারোহণ বেশ রোমাঞ্চকর। রাত্রিতে হাওয়ার মধ্যে একটা শীতের কামড় ফুটে উঠে।

আমাদের দিল্লী পৌঁছুতে তিনদিন লাগবার কথা। শাহ ইচ্ছা করে গতি কমিয়ে সময় করলেন চারদিন। চতুর্থ দিন বেলা প্রথম প্রহরে, সূর্য আকাশের গায়ে তপ্ত হয়ে উঠবার আগেই আমরা দিল্লীর মাটিতে প্রবেশ করলুম। দূরে গগনচুম্বী এক মিনারের শীর্ষদেশ দেখতে পেলুম—কুতব মিনার। ইরাণেরই উস্ প্রদেশের দরবেশ খাজা কুতবউদ্দিন কাকির স্মৃতির উদ্দেশ্যে সুলতান কুতবউদ্দিন আর ইলতুৎমিস তৈরি করেন এ মিনার। পুরানো দিল্লী ঐ মিনারের

কাছেই। আমরা যাচ্ছি প্রকৃত পক্ষে শাজাহানবাদে, শাজাহান কর্তৃক তৈরী নতুন দিল্লীতে। যমুনার তীরে সেখানেই লালকেল্লা, সেখানে জগৎ বিখ্যাত মোগল হারেম।

চলতে চলতেই দেখনে পেলুম হুমায়ুনের সমাধির গম্বুজের চূড়া। গম্বুজ দেখে ইরাণী স্থাপত্যের কথা মনে পড়ল। দেখলুম ফিরুজ শা তোগলকের ফিরুজ কোটলা। তার উপর এখনো হিন্দুস্থানের সর্বশ্রেষ্ঠ কাফের সম্রাট অশোকের পাষাণ স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে। দূরে দেখলুম পুরানো কিল্লা। লোকে বলে ইন্দ্রপ্রস্থ। হিন্দুস্থানের প্রাগৈতিহাসিক পাণ্ডব রাজাদের রাজধানী। সর্বশেষে দেখা দিল লাল পাথরের দেয়াল দিয়ে ঘেরা গভীর পরিখার মধ্যে যমুনা নদীর ধারে মোগলদের লাল কেল্লা। দুর্গের ভেতরে শ্বেতমর্মর খচিত মোগল হারেম। অপূর্ব! অপূর্ব! সামনে সবুজ ময়দান।

কিন্তু ময়দানে আমাদের শিবির পড়ল না। শাহের হুকুমে দিল্লী থেকে ছয় মাইল উত্তরে সালিমারবাগে আমাদের শিবির পড়ল। কিন্তু দিল্লীর অবস্থা তখন ভয়াবহ। বহু গৃহী আমাদের ভয়ে তাদের গৃহ ছেড়ে পালিয়েছে। দোকানী দোকান বন্ধ করেছে। অনেক ওমরাহ পর্যন্ত প্রাণের ভয়ে রাজধানী ত্যাগ করে গ্রামদেশে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। প্রকৃত পক্ষে অন্ধ, আতুর আর দরিদ্র ছাড়া, অধিকাংশ লোকই পালিয়েছে। এমন কি গায়ক, বাদক আর নর্তকীরা পর্যন্ত রাজধানী ছেড়ে পালিয়েছে। আমরা গিয়ে যখন দিল্লী পৌঁছলাম তখন দিল্লী একটা প্রেতপুরীর মত নিস্তব্ধ।

বহু লাঞ্ছনা ছিল দিল্লীর লোকদের কপালে। কাপুরুষ হলে লাঞ্ছনা ভোগ করা ছাড়া উপায় কি? ভেবেছিল—ধনপ্রাণ নিয়ে পালাবে, তা হল না। ধনতো গেলই, শাহী ফৌজের হাতে অনেকে শেষ পর্যন্ত প্রাণ হারালো। অধিকাংশ লোক পালিয়েছিল মথুরা অঞ্চলে। জাটদস্যুরা প্রস্তুত হয়ে ছিল। যমুনা অতিক্রম করতেই

পাকড়াও করতে লাগল। অবশেষে সর্বস্ব খুইয়ে মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে দঙ্গ বেঁধে আবার সব দিল্লীতে ফিরে এল।

দিল্লীর অধিবাসীদের কাপুরুষতা দেখে আমাদের শাহ পর্যন্ত ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু সে কথা পরে।

সালিমার বাগে শিবির গড়বার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের শাহ মোগল বাদশা মহম্মদ শাহকে তলব করে পাঠালেন। বাদশা এলে শাহ তাঁকে লালকেল্লার দিকে এগিয়ে দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানাবার ব্যবস্থা করতে বললেন। অভ্যর্থনার ক্ষেত্রে যাতে কোন প্রকার ত্রুটি না ঘটে সে সম্পর্কে তিনি মহম্মদ শাকে হুঁসিয়ার করে দিলেন।

পরাজিত সম্রাট হিসাবে মহম্মদ শার এ বিষয়ে কোনপ্রকার আপত্তি করবার উপায় ছিল না। আমাদের শাহের হুকুম নিয়ে তিনি লালকেল্লার দিকে এগিয়ে গেলেন।

দ্বিপ্রহরে শাহ একান্ত নিভৃতে আমাকে ডাকলেন।

শাহের হুকুম পেয়ে আমি তাকে কুর্নিশ করে দাঁড়ালুম।

শাহ আমাকে বললেন: আগা, নতুন বেগমকে তোমার কেমন মনে হচ্ছে।

আমি বুঝলুম, সিতারা বেগমের কথা তিনি আমার কাছ থেকে জানতে চান।

বললুম: শাহেন শা, আপনার নির্বাচনের তুলনা নেই। আমার মনে হয়, হিন্দুস্থান অভিযানের সবচেয়ে বড় রত্ন আপনি কার্ণালের প্রান্তরে কুড়িয়ে পেয়েছেন। প্রকৃত নারী আমিও বোধহয় এই প্রথম দেখলুম।

—সিতারা কি আমাদের পক্ষে আর ক্ষতিকর হতে পারে?

বললুম: শাহেন শা, এই কয়েক দিনেই আমি তাঁকে যতটুকু দেখেছি তাতে আমার মনে হয়েছে, মনের নিচুতা সিতারা বেগমের

বিন্দুমাত্র নেই। অপর পক্ষে নারীত্বের সর্বপ্রকার গুণ—কোমলতা, স্নেহ, মায়া, মমতা, সবই তার মধ্যে আছে। তার নারীত্ব এযাবৎকাল পর্যন্ত বিন্দুমাত্র সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচিত হয়নি। আপনার কাছ থেকে সহানুভূতি ও ভালবাসার স্পর্শ পেয়ে সে অভিভূত।

শাহ বললেন: তুমি ঠিকই বলেছ। আমার বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে সিতারা সেদিন কেঁদেছিল।

কেন যে কেঁদেছিল, জিজ্ঞাসা করে জানলুম। তার ভয়, এ সৌভাগ্য যদি স্থায়ী না হয়!

হিন্দুস্থানের রমণীরা বড় ভাগ্যবাদী। গণৎকারেরা নাকি তাকে বলেছে, প্রিয়তমের সুখ লাভ সিতারার জীবনে কোন দিন ঘটবে না। সে তাই নিজের সৌভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

আমি বললুম: শাহেন শা, অদৃশ্য ভাগ্যের কথা আমরা সাধারণ মানুষ কি বুঝি। তবে এইটুকু বুঝি, সিতারা বেগম এমনই নারীরত্ন—যাকে কোন পুরুষের অবহেলা করা উচিত নয়। মোগল দরবারে নারীত্বের মর্যাদা নেই বলে সে আজ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে।

শাহ বললেন: আগা তুমি ঠিক বলেছ। সিতারাকে আমি কোনদিন অবহেলা করব না। কিন্তু সিতারা যখন ভাগ্যের কথা বলছিল তখন আমারই ভয় করছিল। কাল সিতারাকে আমি আমার বহুমূল্য স্মারক অঙ্গুরী দিয়েছি। কখনো যদি তার কোন বিপদ হয়, এই স্মারক অঙ্গুরীর সাহায্যে সে শাহী সাম্রাজ্যর যে কোন প্রান্ত থেকে আমাকে স্মরণ করলে আমার দেখা পাবে।

আমি বললুম: আল্লা করুন, তার নারীত্ব যেন যথাযোগ্য মর্যাদা লাভ করে।

শাহ বললেন: সিতারা এই সৌভাগ্যকে বিশ্বাস করতে না পেরে স্বাভাবিক হতে পারছে না। তুমি তার মনের কথা জানবার

চেষ্টা কর। আমার মনে হয়, তার অতীত ইতিহাসের মধ্যেই তার মানসিক চিন্তাধারার সমস্ত রহস্য লুকিয়ে আছে। আমি যখন তার উপর প্রীত হয়ে তাকে উপহার দিতে চাইলুম, সে রত্ন মাণিক্য, অর্থ, প্রতিপত্তি কিছুই চাইলে না। শুধুমাত্র বললে, আপনার ভালবাসা পেলেই আমি ধন্য শাহেন শা। আমি আর কিছু চাইনে।

আমি বললুম: যথার্থ নারীর মতই কথা বলেছেন বেগমসাহেবা?

শাহ বললেন: কিন্তু সিতারা সম্পর্কে আমার ভয় কি জান? আত্মসম্মান রক্ষার জন্য সে বাঘিনীর মত ভয়ঙ্করী হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু আত্ম-স্বার্থ রক্ষার জন্য সে একটি অঙ্গুলী হেলন পর্যন্ত করতে পারেনা। শঠতা ও নিচুতা সে জানে না, বোঝে না। তার কি কোন তরফ থেকে বিপদের আশঙ্কা আছে বলে তুমি মনে কর?

শাহ কি ইঙ্গিত করছেন আমি বুঝলুম। বললুম: তা কিছুটা থাকতে পারে শাহেন শা।

—কার তরফ থেকে তুমি বিপদের আশঙ্কা করছ?

—শাহেন শা, আমার নিজের মুখে না শুনলেও আপনি নিশ্চয়ই তা বুঝতে পাচ্ছেন?

শাহ হাসলেন—জানি। তবু তুমি স্পষ্ট করে বল

বললুম: বেগম সাহেবা সিরাজাই বেগম সিতারা বেগমকে সহজে গ্রহন করতে পারবেন না।

শাহ বললেন: তুমি ঠিকই ধরেছ। এই জন্য সিতারার যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেদিকে সর্বদা তোমার দৃষ্টি রাখতে হবে।

আমি শাহকে কুর্নিশ জানিয়ে বললুম: শাহের সর্বাপেক্ষা প্রিয় রত্নের জন্য আমার জান মান কবুল।

শাহ হেসে বললেন: আমি তা জানি। যাও, দেখ বেগম সাহেবা কি করছেন। সর্বদা তার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করবে।

আমি শাহেন শাকে কুর্ণিশ জানিয়ে সিতারা বেগমের শিবিরের দিকে এগিয়ে গেলুম।

বেগম সাহেবা আপন মনে কি ভাবছিলেন।

আমি গিয়ে কুর্ণিশ জানাতেই বললেন: 'এই যে আগা, এস।' তার কণ্ঠস্বর বড় মধুর। এমন দরদ দিয়ে কেউ কখনো বান্দাদের আহ্বান করেন না। তিনি হয়তো এখনো বুঝতে পাচ্ছেন না, তিনি কি অসীম ক্ষমতার অধিশ্বরী হয়েছেন।

আমি গিয়ে সামনে দাঁড়াতেই তিনি বললেন: আচ্ছা আগা, প্রতিবার দেখা হতেই তুমি আমাকে কুর্ণিশ জানাও কেন?

বললুম: বেগম সাহেবা, এটা রীতি। আপনি এখন আমার মালিকান, আমি আপনার ভৃত্য।

সিতারা বেগম বললেন: ভৃত্য কথাটা শুনতে আমার মোটেও ভাল লাগে না।

আমি বললুম: সে কথাটা আমি জানি বেগমসাহেবা। সেইজন্য আপনাকে আরো বেশী শ্রদ্ধা করি। আপনাকে শুধুমাত্র একটি কুর্ণিশ কেন, শত সহস্র কুর্ণিশ জানালেও প্রাণ ভরবে না। যেখানে ভয়ে সালাম জানাতে হয় সেখানে একটির বেশী দুটির প্রয়োজন না থাকলে কেউ তা জানায় না। কিন্তু যেখানে শ্রদ্ধা জড়িত সেখানে একটি দিলে প্রাণ ভরে না।

বেগম সাহেবা স্নিগ্ধ একটা হাসি হাসলেন। বললেন: আগা, তুমি বড় সুন্দর কথা বলতে পার।

বললুম: পরের সেবার জন্যই আমাদের জীবন, বেগমসাহেবা। তাই ব্যবহার এবং কথা দুটোই আমাদের শিখতে হয়।

বেগম সাহেবা বললেন: আগা, তোমার ব্যবহার বড় মধুর। কথাবার্তা শুনে মনে হয়, লেখাপড়াও অনেক করেছ। কিন্তু আমি লিখতে পড়তে কিছুই জানি না।

বললুম : বেগমসাহেবা, অভাবকে পূর্ণ করবার জন্যেই বিদ্যাচর্চা। আপনি নিজের মধ্যে নিজে পূর্ণ। বিদ্যার্জনের আপনার কোন প্রয়োজন নেই।

হেসে সিতারা বেগম বললেন : তোমার কথার আমি জবাব দিতে পারিনে আগা।

আমি বললুম :- কথা না বলেও অনেক সময় হাজারো কথার চেয়ে বেশী কথা বলা হয় বেগম সাহেবা। আপনিই তার প্রমাণ।

—কি রকম?

বললুম : আমাদের শাহের বহু বেগম। তারা নানা জনে নানা বিদ্যায় পারদর্শিনী। তারা অজস্র ঢংয়ে কথা বলতে পারেন। কিন্তু কেউ তারা তাদের নিজেদের মনকে শাহের নিকট উদ্ঘাটিত করতে পারেন নি। আপনি নীরব থেকেও শাহের মনকে জয় করতে পেরেছেন। শাহেন শা আপনার মনের পরিচয় পেয়েছেন।

শাহের কথায় দেখলুম সিতারা বেগমের আনন্দ বোধ হল।

তিনি বললেন : শাহ কি আমায় বিশ্বাস করতে পেরেছেন?

বললুম : অবিশ্বাস করবেন কেন বেগম সাহেবা?

সিতারা বেগম বললেন : সেদিন আমি হঠাৎ তাঁকে দেখে ছুরিকা বের করেছিলুম, তাই।

বললুম : তাতে আমাদের শাহ, আপনার উপর আরো সন্তুষ্ট হয়েছেন. এই কারণে যে, তিনি বুঝতে পেরেছেন, আপনি আত্ম-সম্মান সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। কিন্তু বেগম সাহেবা হঠাৎ সেদিন ছুরিখানা আপনি শাহের হাতে আবার দিয়ে দিলেন কেন? ভয়ে?

যেন সম্মানে আঘাত লাগল সিতারা বেগমের। বললেন : আমি রাজপুত রমণী, ভয় আমি কাউকে পাই না আগা।

বললুম : সে কথা আমরা জানি। তাই তো ভাবছিলুম।

সিতারা বেগম বললেন : সেদিন প্রথম আমি ভেবেছিলুম,

অন্যান্য লম্পট পুরুষের মত আমাদের শাহ্। কিন্তু অনেকক্ষণ তার চোখের দিকে, সর্বাঙ্গে, তাকিয়ে দেখলুম—তিনি ঠিক তা নন। পুরুষের পুরুষত্বকে প্রত্যেক রমণীরই ভাল লাগে আগা।

বললুম: আমাদের শাহ বলেন, নারীর নারীত্বও প্রত্যেক পুরুষের ভাল লাগে। আপনার মধ্যে নারীত্ব দেখে তিনি নিতান্ত মুগ্ধ হয়েছেন।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সিতারা বেগম বললেন: শাহের এই ভালবাসা আমার উপর যদি স্থায়ী না হয়?

বললুম: শাহকে আমি জানি। এই প্রথম তিনি একজন রমণীকে ভালবেসেছেন। ভালবাসার স্বাদ পেলে তাকে কেউ কখনো ভুলতে পারে না বেগম সাহেবা।

বেগম সাহেবা নীরব থাকলেন।

আমি বললুম: বেগমসাহেবা যদি গোস্তাকী না হয়, তবে একটি কথা আপনাকে বলি।

আমার দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকালেন সিতারা বেগম: তুমি বল আগা।

বললুম: আপনি বোধহয় এযাবৎ কাল শুধু কাপুরুষের সাক্ষাৎ পেয়েছেন, পুরুষের নয়। তাই পুরুষ মানুষকে বিশ্বাস করতে পারেন না।

সিতারা বেগম বললেন: তুমি সত্য বলেছ আগা, আমি কাপুরুষ দেখেছি, পুরুষ আজ পর্যন্ত দেখিনি; এই প্রথম দেখলুম।

বললুম: বেগমসাহেবা যদি কিছু মনে না করেন, তবে আপনার অতীত ইতিহাস জানতে ইচ্ছে করছে। রাজপুত রমণী হয়ে আপনি মোগল হারেমে কি করে এলেন?

সিতারা বেগম বললেন: সে আমার দুর্ভাগ্যের ইতিহাস আগা, যদি শুনতে চাও বলি।

বললুম : বলুন বেগমসাহেবা, আমার ভারি কৌতূহল হচ্ছে।

সিতারা বেগম তাঁর স্মৃতির সূত্র ধরে অতীত জীবনের যে কাহিনী বললেন, তার মর্মার্থ এই : বেগমসাহেবার জন্ম রাজপুতনায়। সামান্য ঘরের মেয়ে তিনি। কিন্তু তার সৌন্দর্য সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে নি। তারা তাদের সামাজিক বিচার বুদ্ধি দিয়েই মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক বিচার করে। এই ভাবেই সে বেড়ে উঠে। তখন সে কিশোরী। একদিন গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে সে দল বেধে ইঁদারায় জল আনতে গেছে। সেই পথে যাচ্ছিল এক বিজয়ী মোগল ফৌজদার। সে তখন বৃদ্ধ। বৃদ্ধ হলেও মোগলদের কামরিপু অত্যন্ত প্রবল। কিশোরীর সৌন্দর্য তার মধ্যে প্রবল রিপুর তাড়না সৃষ্টি করল। রাস্তা থেকেই তাকে সে উঠিয়ে নিয়ে গেল নিজের হারেমে। তাকে সাদি করল। একটা অস্ফুট সৌন্দর্যকে সে রিপুর তাড়নায় অস্থির করে তুলল। সিতারার কাছে এ জীবন অসহ্য বোধ হতে লাগল। সে ভাবল, পালাবে। একদিন সুযোগ বুঝে হারেম থেকে সে পালিয়েও গেল। কিন্তু কপালে তার সুখ নেই, রাস্তায় পড়ল একদল মাড়োয়ারী বণিকের হাতে। সেখানেও তার দেহ নিয়ে চলল ছিনিমিনি খেলা। তবে তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন।

দিল্লীতে তখন সুন্দরী মেয়েছেলের ব্যবসা চলেছে জাঁকিয়ে। তারা সিতারাকে দিল্লীর বাজারে চড়া দামে বিক্রী করবার জন্যে নিয়ে এল। সেখানে বাঁদী কিনতে এসে, বাদশার এক রাজপুত মহিষীর নজরে পড়ল সিতারা। বেগমসাহেবা তাকে কিনে নিয়ে গেলেন লালকেল্লার হারেমে। একদিন লম্পট মহম্মদ শার নজরে পড়ে গেল সে। লুকিয়ে লুকিয়ে সিতারার সঙ্গে চলল প্রেমের অভিনয়। বাদশা বোঝালেন, সিতারাকে সাদি করে তিনি তাকে হারেমের পাটরাণী করবেন। অবুঝ সিতারা চাটুবাক্যে ভুলল।

সেই সুযোগে মহম্মদ শা তাকে যথেচ্ছ উপভোগ করে নিলেন। তারপর বাজারের এক নর্তকীকে দেখে ভুললেন তিনি। কিনে এনে উঠালেন হারেমে। সে বারবণিতা, নর্তকী, কাপুরুষ, পুরুষ যে-ই হোক তাকে হাত করতে জানে। কাপুরুষের কাছে সততার চাইতে ছলাকলার মূল্য বেশী। মহম্মদ শা ডুবলেন। সাদি করে তাকে হারেমে উঠালেন বৈজু সাহিবা নাম দিয়ে।

এদিকে সিতারা সত্যি সত্যি ভালবাসতে চেয়েছিল মহম্মদ শাকে। নিষ্ফল আক্রোশে সে গুম্‌ড়িয়ে গুম্‌ড়িয়ে নিজের মধ্যেই কাঁদল। কত অপেক্ষা করল প্রিয়তমের সাক্ষাৎ পাবার জন্য, কিন্তু সে এল না। সিতারা বুঝল, পুরুষ জাতের স্বভাবই এই। পুরুষ জাতির প্রতি তার ঘৃণা জন্মালো। ঠিক সেই মুহূর্তেই শাহ নাদির কুলি এলেন হিন্দুস্থান আক্রমণ করতে।

অত্যন্ত সরল চিত্তে সকল কথাই আমার কাছে প্রকাশ করলেন সিতারা বেগম। তার বঞ্চনার ইতিহাস সত্যই বেদনার। মোগলদের এই জঘন্য চরিত্র-পতনই যে তাদের বিপর্যয়ের কারণ, আমি সেটা বুঝলুম।

আমি সিতারা বেগমকে বললুম: বেগম সাহেবা, অতীতের বেদনা ভুলে যান। নতুন জীবন শুরু করুন। আমাদের শাহ, আর যা-ই করুন—বঞ্চনা করবেন না। সৌন্দর্য তাকেও অস্বীকার করে সত্য, কিন্তু ভালবাসাকে তিনি অস্বীকার করেন না।

সিতারা বেগম বললেন: ছোটবেলায় এক গণৎকার আমার হাত দেখে বলেছিলেন, আমার কপালে গৃহ সুখ নেই। তাই আমি ভয় পাই আগা, এ সৌভাগ্য যদি আমার না সয়?

আমি বললুম: আপনি মিথ্যা চিন্তা করবেন না, বেগম সাহেবা। গণৎকারেরা স্বয়ং খুদাতালা নন, যে নির্ভুল বলবেন। তাদের কথায় বিশ্বাস করে আত্মসুখ বিসর্জন দেবেন না।

সিতারা বেগম সে কথার কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকলেন। আমি বললুম ঃ আচ্ছা বেগমসাহেবা, বাদশা মহম্মদ শার উপর আপনার প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছা করছে না? এই মুহূর্তে আপনার হাতে প্রচুর ক্ষমতা। আপনি ইচ্ছা করলেই প্রতিশোধ নিতে পারেন।

সিতারা বেগম এক আশ্চর্য কথা বললেন। হেন কথা আমি কল্পনা করিনি, পূর্বে কোন হারেমের রমণীর কাছ থেকে শুনিনি। তিনি বললেন ঃ আগা, অপরে দুষ্ট হলেও আমি ভাল হবনা কেন? মহম্মদ শার ক্ষতি করলে, আমার ক্ষতিটুকুতো পূরণ হবে না আগা। সাধুসন্ন্যাসীরা বলেছেন, সকলকে ক্ষমা কর। কাউকে তাই অভিশাপ দিইনে জীবনে আমি। আর তাছাড়া আমি এখন সুখী আগা। আমার সৌভাগ্য আনন্দ বোধ না করে অপরের উপর ঈর্ষা বোধ করব কেন? ভগবানের ইচ্ছা, মহম্মদ শা আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছেন, নইলে পুরুষশ্রেষ্ঠ শাহকে তো আমি পেতুম না।

আমার মুখে আর কোন বাক্য থাকল না। মনে হল বিরাট আসমানের নিচে বহু নক্ষত্রের মধ্যে শুধুমাত্র একটি সন্ধ্যাতারাকেই দেখছি আমি। নিজের মধ্যে আমি এক শান্ত আনন্দ অনুভব করলুম। সিতারা বেগমের পাশে সিরাজাই বেগমের রূপ কল্পনা করলুম আমি। খুদাতালার কি বিচিত্র ইচ্ছা, কি বৈচিত্র্যময় সৃষ্টি। আলো-অন্ধকার, দিন-রাত্রি, শীত-গ্রীষ্ম সবই তাঁর সৃষ্টি।

দুদিন সালিমার বাগে থাকলুম আমরা। নাদিরের দুর্ধর্ষ জীবনে এক শান্তির প্রলেপ পড়েছে। এত প্রশান্তির ছায়া আমাদের শাহের মুখে আমি ইতিপূর্বে দেখিনি। কিন্তু ঝড় লক্ষ্য করেছি সিরাজাই বেগমের শিবিরে। সাহস করে সেখানে আমি যাইনি,

কিন্তু সংবাদ পেয়েছি। আবদ্ধ সিংহীর মত গর্জন করছেন সিরাজাই বেগম। সিতারা বেগমের প্রহরী আমি। তার আক্রোশের মুখে শয়তানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একটি নিষ্কলঙ্ক জীবনকে রক্ষা করতে হবে। শাহ রণক্ষেত্রে দুর্ধর্ষ। কিন্তু রমণীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে জানেন না। হারেমের দায়িত্ব আমার।

দুদিন পর লালকেল্লা থেকে সংবাদ এল। বাদশা মহম্মদ শা সংবাদ পাঠিয়েছেন তিনি আম-দরবারে শাহেন শাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্ম প্রস্তুত।

শা স্থির করলেন তার শিবির সালিমার বাগেই থাকবে। বাছাই বাছাই দেহরক্ষী শাহের সঙ্গে লালকেল্লাতে যাবে। কান্দাহারের আহম্মদ খাঁ দুর্ধর্ষ এক দেহরক্ষী বাহিনী গুছিয়ে নিল।

শাহ হুকুম করলেন তার সঙ্গে একজন মাত্র বেগম যাবেন লালকেল্লাতে—সে বেগম সিতারা বেগম।

আমার কাছে সিতারা বেগমের অতীত জীবনের কাহিনী শুনেছিলেন শাহ। লম্পট মহম্মদ শার মুখের উপর কড়া চাবুক মারবার ইচ্ছা ছিল তাঁর। শাহ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বাঁদী বলে যার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন মহম্মদ শা, শাহের বেগম হিসাবে তাকেই তাঁর কুর্ণিশ জানাতে হবে।

আমি সেই মুহূর্তে সিরাজাই বেগমের কথা ভাবলুম।

কার্ণালে মোগল হারেমের ঐশ্বর্যের বর্ণনা শুনে সিরাজাই মুগ্ধ হয়েছিলেন। আমার কাছে মনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে বলেছিলেন, মোগল হারেমে ঢুকে, নিজের ইচ্ছামত মণিমাণিক্য সংগ্রহ করবেন তিনি।

হায়রে মানুষের আকাঙ্ক্ষা! সিরাজাই জানেন না, অদৃশ্যে খুদাতালা আছেন শেষ বিচারক হয়ে। মানুষের ইচ্ছামত কাজ হয় না। তাঁর ইচ্ছামতই হয়। সিরাজাই বেগমের স্থলে সিতারা

বেগম চললেন হারেমে। দুদিন পূর্বে এই হারেমেরই তিনি নগণ্য একজন বাঈজী ছিলেন।

সিতারা বেগমকে সেকথা জানাতে তিনি খুব আগ্রহ দেখালেন না। বললেন, পাপ হারেমে ঢুকবার তাঁর ইচ্ছে নেই।

আমি তাঁকে শাহের পরিকল্পনার কথা বোঝালুম। বললুম : মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্যই বেগম সাহেবার লালকেল্লা যাওয়া উচিত।

শেষ পর্যন্ত বেগম সাহেবা স্বীকৃত হলেন।

পরদিন ভোরবেলা শাহ আমাদের নিয়ে লালকেল্লা চললেন।

সূর্যরশ্মি থেকে কমলা রং হারিয়ে যাবার আগেই আমরা দিল্লীর লালকেল্লার দোরগোড়ায় গিয়ে দাঁড়ালুম।

বিরাট কেল্লা। দেখলে মনের মধ্যে একটা সম্ভ্রমবোধের সৃষ্টি হয়। বাদশা শাজাহান হিজ্‌রী ১০৩৬ সালে এই দুর্গ তৈরী আরম্ভ করে হিজ্‌রী ১০৪৫ সালে নির্মাণকার্য শেষ করেন। দেখতে অষ্ট ভুজাকৃতি এই দুর্গ। পূব-পশ্চিমে বহুদূর পর্যন্ত দুর্গের দেয়াল প্রসারিত। লাল পাথরের দেওয়াল। অনুমানে বুঝলুম কেল্লার পরিধি প্রায় ক্রোশ দেড়েকের মত হবে। দুর্গের উত্তর দিক দিয়ে বয়ে গেছে যমুনা নদী। সেখানে প্রাচীরের উচ্চতা সর্বাপেক্ষা বেশী। দুর্গের চার পাশে গভীর পরিখা। কাঠের সেতু পার হয়ে দুর্গের ভিতর প্রবেশ করতে হয়। শেকল দিয়ে দুর্গের দেওয়ালের সঙ্গে সেতুটি বাঁধা। প্রয়োজন বোধে শেকল টেনে সেতুটি উঠিয়ে নেওয়া যায়। শত্রুর আক্রমণের মুখে দুর্গের দুয়ার এমনি করেই বন্ধ করে দেবার ব্যবস্থা।

লাহোর দরজার মুখে বাদশা মহম্মদ শা আমাদের শাহকে অভ্যর্থনা করবার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাদের শাহকে তিনি কুর্নিশ জানালেন। বেগম সাহেবাকেও কুর্নিশ জানাতে হল। শাহের নিজের মুখ থেকে বেগম সাহেবার পরিচয় শুনলেন মহম্মদ শা।

আমি তাকিয়ে দেখলুম, লজ্জায় বাদশা মহম্মদ শা আকর্ণ লাল হয়ে উঠলেন।

লাহোর দরজার অদূরেই বিরাট খিলান যুক্ত একটি ঘর। তার দুই পাশে দ্বিতল কক্ষ। মধ্যস্থলে অষ্টভূজাকৃতি বিরত। এর নাম, 'ছত্ত চৌক'। এখানে এশিয়ার সমস্ত পণ্য দ্রব্যের বাজার। এর সামনেই নহবৎখানা। আমাদের শাহের সম্মানে সানাই বাজছে।

নহবৎখানা ছাড়িয়ে আমরা দেওয়ান-ই-আমে প্রবেশ করলুম। বিরাট একটি দরবার কক্ষ। চতুর্দিকে লাল বেলে পাথরের থাম। পাথরের উপর সোনার পাতে লতাপাতা আঁকা। উজ্জ্বল শঙ্খের গুড়োর নক্সা যেন জ্বল জ্বল করছে। তাকিয়ে দেখলুম। শাহও দেখলেন। পেছনের দেয়ালের মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে বালদাচিনো অর্থাৎ ঝারোকা। রত্ন-মাণিক্য খচিত এক অপূর্ব ঝারোকা। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে দেখলুম। চারদিকে আতরের খোসবাই ছড়াচ্ছে। দিনের বেলাও কাঁচের ঝারে হাজার হাজার মোমবাতি জ্বালিয়েছেন বাদশা। মহম্মদ শা আমাদের শাহকে নিয়ে গিয়েই সেই ঝারোকায় বসালেন। শাহ নিজে হাতে ধরে তাঁর বাম পার্শ্বে বাদশা মহম্মদ শাকে বসালেন—অর্থাৎ মোগল বাদশাকে তিনি একজন গণ্যমান্য আমিরের সম্মান দিলেন। ঝারোকার নিচে রৌপ্যনির্মিত ওয়াজীরের আসন। সেখানে আজ কেউ বসবার নেই।

ওয়াজীরের আসনের সামনেও রৌপ্যনির্মিত দীর্ঘ আসন। এখানে গণ্যমান্য আমিরেরা বসেন। শাহী আমির আর মোগল আমিরেরা শাহের অনুমতি নিয়ে সেখানে উপবেশন করলেন।

পেছনে গুলালবারিতে দাঁড়াল উভয়ে শাহের কর্মচারিরা। তার বাইরে দর্শকদের দাঁড়াবার স্থানে আহম্মদ খাঁ দাঁড়াল শাহী দেহরক্ষীদের নিয়ে।

বেগম সাহেবাকে নিয়ে আমি চললুম হারেমের অভ্যন্তরে।

শাহের নির্দেশ ছিল মোগল বেগমদের সকলকেই সিতারা বেগমকে কুর্নিশ জানাতে হবে।

দূরে প্রবেশ পথে নহবৎ খানায় সানাই বাজছে। আমার মনে হল, যেন করুণ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছে লালকেল্লা। জরির কাজ করা বোরখা পরেছেন বেগম সিতারা। আমাদের আগে মোগল হারেমের প্রধান খোজা জাবিদ খাঁ। কুর্নিশ জানিয়ে তিনি সিতারা বেগমকে ভেতরে আহ্বান জানালেন। সিতারা বেগমকে কুর্নিশ জানাতে তার হাতটা কাঁপল কি? দুদিন আগেও সে ইচ্ছা করলে সিতারা বেগমের পিঠের উপর চাবুক কষতে পারত।

বেগম সাহেবার পেছনে দুর্গে ঢুকলাম আমি। প্রথমেই জাবিদ খাঁ আমাদের নিয়ে এলেন দেওয়ান-ই-খাসে। সমস্ত লালকেল্লার মধ্যে যেন একটা শান্ত শীতল হাওয়া। শ্বেত পাথরের স্নিগ্ধ প্রশান্তিতেই যে এ স্নিগ্ধতা—তা নয়। ফুটেছে কৃত্রিম ফোয়ারা। ঘরে ঘরে মেঝের নিচে প্রবাহিত কৃত্রিম ঝর্ণার জলধারা। সবুজ ঘাসের উঠান। পরিমিত ঝাউ গাছ। নানা বিচিত্র রংয়ের সুগন্ধি ফল। বিরাট হারেম। আমার কল্পনার সীমাকে এ দৃশ্য বহু পূর্বেই অতিক্রম করে গেছে।

জাবিদ খাঁ আমাদের এনে বসালেন দেওয়ান-ই-খাসে। শ্বেত মর্মরের একটি পটমণ্ডব। যেন একখণ্ড ছবি। রঙিন খিলানের ভর দিয়ে ঢালাও ছাদ কেন্দ্র-কক্ষের ৩২টি স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান। প্রত্যেকটি স্তম্ভ মূল্যবান রত্নখচিত। সম্পূর্ণ রৌপ্য নির্মিত ছাদ। এর নিচে মণিমুক্তা খচিত ময়ুর সিংহাসন। আমি খোজা, আমার চোখও ঝলসে গেল সেই সিংহাসন দেখে। সমস্ত শাহী সাম্রাজ্যে এই সিংহাসনের যা মূল্য—তা আছে কিনা কে জানে।

জাবিদ খাঁ কুর্নিশ জানিয়ে সিতারা বেগমকে সিংহাসনে বসালেন। দলে দলে বেগমেরা কুর্নিশ জানালেন বেগম সাহেবাকে। হয়তো

সিতারা বেগম অস্বস্তি বোধ করছিলেন, তথাপি তিনি নির্বিকারভাবে সকলের কুর্ণিশ গ্রহণ করলেন। শেষ পর্যন্ত একবার তিনি বিচলিত হলেন। মহম্মদ শার রাজপুত মহিষী এসে সালাম জানাতেই সিতারা বেগম আর স্থির থাকতে পারলেন না। উঠে গিয়ে বেগম সাহেবার কাছে ক্ষমা চাইলেন। আমি শুনেছিলুম, এই বেগম সাহেবা তাকে স্নেহ দানে কার্পণ্য করেন নি।

জাবিদ খাঁ আমায় জিজ্ঞেস করলেন : আগা সাহেবের কেমন লাগছে ?

বললুম : মোগলদের সৌন্দর্য-প্রীতির প্রশংসা করছি।

হাত তুলে খাঁ সাহেব, দেয়ালে উৎকীর্ণ একটি কবিতা পাঠ করলেন :

অগর ফিরদৌস বর্ রু-ঈ জমীন অস্ত্
হমিন অস্ত্, উ হমিন অস্ত্, উ হমিন অস্ত্।

সঙ্গে সঙ্গে খাঁ সাহেব এর অর্থও ব্যাখ্যা করে শোনালেন : "দুনিয়াতে যদি কোথাও বেহেস্ত থেকে থাকে, তবে তা এইখানে, এইখানে, এইখানে।"

পংক্তি দুটি পড়ে যেন একটা গর্বের দৃষ্টিতে তাকালেন জাবিদ খাঁ আমার দিকে। আমি বুঝলুম, আমাদের দারিদ্র্যকে তিনি বিদ্রূপ করতে চান। সঙ্গে সঙ্গে আমি তাকে বললুম : এই কক্ষে পংক্তিটি অত্যন্ত মনোরম হয়েছে খাঁ সাহেব। কিন্তু স্বর্গকে কি আপনারা স্বর্গ রেখেছেন ?

শুনে জাবিদ খাঁর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। আমি তার ক্ষত স্থানে আঘাত করেছি। আমি শুনেছিলুম, বাদশা মহম্মদ শার উপর তার প্রচুর প্রভাব। এর দুষ্ট পরামর্শে বাদশা অনেক নিচে নেমেছেন। বাদশাকে মেয়েমানুষের খেলায় নামিয়েছেন জাবিদ খাঁ।

জাবিদ খাঁ কক্ষান্তরে গিয়ে আমাকে ময়ুর সিংহাসন দেখিয়ে এর মূল্য নিরূপণ করবার চেষ্টা করলেন। খাঁটি সোনার দুটি ময়ুর দুই পাশে। তার গায়ে নীলকান্ত মণি, পদ্মরাগ মণি, মুক্তা, পান্না আর হীরার ছড়াছড়ি। মণিমুক্তাখচিত ময়ূর দুটোকে যেন জীবন্ত মনে হয়। দুই ময়ুরের মধ্যে বিরাট আসন। মণিমুক্তাখচিত ছ'টি পায়া। উপরে সোনার চাঁদোয়া টাঙ্গানো। সেই চাঁদোয়ার নিচে বারটি পান্নার স্তম্ভ আর মুক্তাখচিত ঝালর। আশ্চর্য আর একটি জিনিষ দেখলুম, একখণ্ড পান্নার উপর মণিমুক্তার তৈরী গাছপালার মধ্যে কাকাতুয়া পাখি। আমার মনে পড়ে গেল—ইরাণের এক রূপকথার চিত্র --রূপোর গাছ, হীরের ফল, সোনার পাতা, আর তার উপর একটি জীবন্ত ময়ূর। সে স্বপ্ন দেখে কোন এক শাহ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। স্বপ্ন স্বপ্নই জানতুম। হিন্দুস্থানে এসে দেখলুম, এ স্বপ্ন সত্য।

আমার চোখে আশ্চর্য মুগ্ধতার ছবি ছিল। জাবিদ খাঁ তা লক্ষ্য করেছিলেন নিশ্চয়ই। আমি ময়ুর সিংহাসন থেকে চোখ ফেরাতে তিনি বললেন: খাঁ সাহেবের অন্য কোন কিছু দেখবার অভিরুচি আছে?

বললুম: হ্যাঁ, আছে। আমাদের বেগম সাহেবার হারেম সবটাই ঘুরে দেখতে চাই। জানেন তো এই মুহূর্তে এই হারেমের মালিকান, আমাদের শাহের বেগম!

কোন উত্তর না দিয়ে ঘাড় নিচু করে জাবিদ খাঁ আমাকে তৃপ্ত করলেন। তারপর বললেন: মহামান্যা বেগম সাহেবা যদি কষ্ট করতে রাজী থাকেন, তবে সব ঘুরিয়ে দেখাতে পারে এ বান্দা।

সিতারা বেগম মোগল হারেমে থাকলেও সব কিছু ঘুরে দেখতে পারেন নি। বোধহয় তার ইচ্ছা ছিল। তিনি উঠলেন। আমিও দাঁড়ালুম।

জাবিদ খাঁ আমাদের ঘুরে ঘুরে সব দেখাতে লাগলেন। প্রথম দেখলুম খাস মহল—মোগল বাদশার অন্দর মহল এটি। তিনটি মহল পরস্পর সংলগ্ন। তসবিখানা, (প্রার্থনাগৃহ) খোয়াব ঘর (স্বপ্নপুরী) এবং বৈঠকখানা। সর্বত্র মূল্যবান পাথর আর মণিমুক্তার ছড়াছড়ি। নিচে কৃত্রিম শীতল জলস্রোত। দেওয়ানী খাসের উত্তর দিকে দেখলুম হামাম ঘর—বাদশা বেগমদের স্নানাগার। এখানে তিনটি কক্ষ। প্রথমটিতে দুটি জলের ফোয়ারা দেখলুম। একটিতে উৎসারিত হচ্ছে গোলাপ জল, আর একটিতে সুগন্ধি জল। দ্বিতীয় কক্ষে উষ্ণ আর শীতল জলের ধারা। তৃতীয় কক্ষে শুধুমাত্র উষ্ণ জলের ব্যবস্থা। চতুর্দিকে রঙিন কাঁচের জানালা। দেখলুম লাল পাথরে ঘেরা ছোট শ্বেত শুভ্র মতি মসজিদ। খোয়াব ঘরের পূর্ব দিকে প্রাচীরের সঙ্গে লাগানো দেখলুম সাম্মান বুরুজ। নদী তীরে মুখ করে এখানে দাঁড়িয়ে সূর্যকে দেখেন মোগল বাদশা—দূরে নিচে থেকে প্রজারা অভিনন্দন জানায়। ওপাশে মমতাজ মহল, হারেমেরই একটি অংশ। দেখলুম জলমণ্ডপ—শাওন আর ভাদো। পায়চারী করলুম হায়াৎ বক্স উদ্যানে। ঝর্ণা নেমেছে হায়াৎ বক্স উদ্যানে। বাদশার বসবার মঞ্চ থেকে স্রোত ধারা নিচে নেমে ক্রমশঃ উদ্যানের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেছে। মঞ্চের নিচে মোমবাতীর কুঠরী। রাত্রি বেলা স্রোত ধারার উপর মোমের আলো রঙের খেলা সৃষ্টি করে। সত্যি যেন এক স্বপ্নের রাজত্ব। আমার নয়ন সার্থক, আমি শাহের সঙ্গে হিন্দুস্থান অভিযানে এসেছিলুম।

জাবিদ খাঁ বললেন: কেমন উপভোগ করলেন জনাব?

বললুম: সৃষ্টি অপূর্ব। কিন্তু একে রক্ষা করবার ক্ষমতা নেই দেখে দুঃখ পাচ্ছি।

আবার ব্যথা দিলুম জাবিদ খাঁকে। আমি স্থির করেছিলুম কোন রকমেই তাকে বাহবা নিতে দেব না।

অনেক সময় আমরা হারেম পরিদর্শনে অতিক্রম করেছিলুম। ইতিমধ্যে আম-দরবারের বৈঠক শেষ হয়েছিল। আমাদের শাহ সমস্ত হিন্দুস্থানী আমিরদের আনুগত্য গ্রহণ করেছেন। তিনি দাবি করেছেন, কুড়ি কোটি মুদ্রা নগদ দিতে হবে দিল্লীর বাদশাকে। এ ছাড়া সহর লুণ্ঠন করে শাহী ফৌজরা যা পাবে তাতো আছেই। শাহের দেহরক্ষীদের হারেমের ভেতর ঢুকতে দিতে হবে। তারা তাদের নিজেদের ইচ্ছামত হারেমের ঐশ্বর্য লুণ্ঠন করবে। আগামী কাল ইত্তজোহা, ইরাণী মতে নৌরোজও। শাহ নির্দেশ দিয়েছেন এ উপলক্ষ্যে দিল্লীর প্রত্যেকটি মস্‌জিদে শাহের নামে খুত্‌বা পড়তে হবে।

মহম্মদ শা শাহ নাদিরের সমস্ত হুকুমই মেনে নিয়েছেন, শুধু একটি কাতর অনুরোধ জানিয়েছেন, শাহী ফৌজেরা হারেমে ঢুকে যেন বেগমদের অমর্যাদা না করেন। শাহ তাঁকে সে আশ্বাস দিয়েছেন।

আম দরবার শেষ হলে শাহ ভেতর থেকে আমাকে তলব করে পাঠালেন, আমি যেন সিতারা বেগমকে নিয়ে বাইরে আসি। এখনি তিনি সালিমার বাগে ফিরে যাবেন। আমি জাবিদ খাঁকে সালাম জানিয়ে বেগম সাহেবাকে নিয়ে বাইরে এলুম।

সমস্ত দরবার বেগম সাহেবার সম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে কুর্ণিশ জানাল। শাহের মুখে হাসি ফুটল। তিনি দরবার ত্যাগ করলেন। দেখলুম, বাদশা মহম্মদ শাহের মুখে রক্ত নেই, যেন তিনি মৃত মানুষ।

সালিমার বাগে গিয়ে শাহ আমাকে নিজের শিবিরে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন: মোগল হারেম কেমন দেখলে বল। বললুম: শাহেন শা, নিজের চোখে না দেখলে, বর্ণনা করবার ক্ষমতা এ বান্দার নেই।

শাহ বললেন: তবু বল, আমি শুনতে চাই।

আমি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে শাহকে হারেমের সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের বর্ণনা দিলুম।

শুনে শাহের চোখ দু'টা চকচক করে উঠল। তিনি বললেন : মহম্মদ শাকে জানিয়ে দিয়েছি, আমার দেহরক্ষীরা নিজের ইচ্ছামত হারেম থেকে ঐশ্বর্য সংগ্রহ করবে। তোমার কাছে বর্ণনা শুনে আমি তৃপ্ত হলুম। কাল যখন লুণ্ঠন আরম্ভ হবে, তুমি থাকবে।

আমি শুনে খুব যে আনন্দিত হলুম তা নয়। এমন সুন্দর একটি স্থাপত্য-কীর্তিকে লুণ্ঠন করা হলে শিল্প সৃষ্টির প্রতি অনাদর প্রকাশ করা হয়। ময়ূরসিংহাসন দেওয়ানী খাস ছাড়া কোথায় মানাতে পারে? তার মণিমুক্তা গুলিকে যদি লুণ্ঠন করা হয়?

কিন্তু শাহের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তো কোন কথা বলা যায় না! সুতরাং চুপ করে থাকলুম।

শাহ বললেন : হারেমের বেগমেরা সিতারাকে যথাযথ সম্মান দেখিয়েছে কি?

বললুম : সে বিষয়ে কোন ত্রুটি হয় নি শাহেন শা।

—কেউ কোন বিদ্রূপ করেনি?

—কার ঘাড়ে দশটা মাথা আছে শাহেন শা যে, আপনার হুকুম অমান্য করবে?

—সিতারা খুশি।

—খুশি জাঁহাপনা।

শাহ আমাকে বললেন : যাও, সিতারা বেগমকে জানাও যে, আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি।

আমি শাহেন শাকে কুর্ণিশ জানিয়ে বেগমের শিবিরের দিকে এগিয়ে গেলুম।

বেগম সাহেবা সিতারা বেগমের মুখের চেহারা মুহূর্তেই মধ্যে পাল্টে গিয়েছে। মর্যাদা এবং সম্মান মানুষের জীবনে একটা

উত্তেজক দাওয়াই। সামাজিক মর্যাদা পেয়ে সিতারা বেগম যেন নিজের অন্তর্নিহিত সত্তাকে চিনতে পেরেছেন। মুহূর্তে তাঁর রং পাল্টে গেছে।

তাঁর সেই অনবদ্য মুখে যে একটা পাণ্ডুর রেখা ছিল, তা আর নেই। সেখানে একটা জীবনের আলো ফুটেছে। আনন্দের স্বাদ পেয়েছেন সিতারা বেগম।

আমি গিয়ে কুর্ণিশ জানিয়ে দাঁড়াতেই তিনি বললেন: আগা, শাহ কি করছেন? তিনি কি আজ এখানে আসবেন?

বললুম: বেগম সাহেবা, শাহ আপনার কুশল ভবিষ্যৎ কামনা করেছেন। তিনি আমাকে জানালেন কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি আপনার কাছে আসবেন।

সিতারা বেগম বললেন: শাহের অসীম করুণা আগা! তিনি আমাকে নতুন জীবন দিয়েছেন। আজ আমার ভারি ভাল লাগছে। আচ্ছা আগা, শুনেছি শাহ তার মহলের একজন বেগমকে নিয়ে এসেছেন, তাঁর সঙ্গে তো আমার একদিনও সাক্ষাৎ করিয়ে দিলেন না।

বললুম: সাক্ষাৎ করালে তিনি খুব সন্তুষ্ট নাও হতে পারেন ভেবে শাহ সে ব্যবস্থা করেন নি।

আশ্চর্য চোখ তুলে সিতারা বেগম আমার দিকে তাকালেন: কেন আগা, তিনি অসন্তুষ্ট হবেন কেন? আমি তো তাঁর ছোট বহিনের মত।

বুঝলুম হিন্দু-মনোবৃত্তি আর সমাজ ব্যবস্থার সংস্কার তার মধ্যে কাজ করছে, তাই সপত্নীকে তিনি নিজের জ্যেষ্ঠা সহোদরার মত দেখছেন। দুদিন শাহী মহলে থাকলে এ ভুল তাঁর ভাঙবে।

তবু একটা বুঝ দেবার জন্য বললুম: শাহী মহলের রীতি অনুযায়ী বেগমেরা পৃথক পৃথক থাকেন, কেউ কারো সঙ্গে দেখা করেন না।

সিতারা বেগম বললেন : এ কথাটা তোমার কাছ থেকে জেনে ভাল হল আগা। আমি শাহকে এ-কথা জিজ্ঞেস করব ভাবছিলুম। হয়তো শাহ আমার উপর রাগ করতেন।

আমি বললুম : হ্যাঁ, বেগম সাহেবা, তিনি গোসা করতে পারেন। এমন অনুরোধ তাঁকে করবেন না।

সিতারা বেগম বললেন : না, আর বলব না।

দ্বিপ্রহরে শাহ সিতারা বেগমের শিবিরে এলেন। আজ তিনি যে শুধুমাত্র প্রণয়ের তারণায় অস্থির হয়ে এসেছেন তা নয়। সিতারা বেগমের কাছ থেকে হারেমের কিছু খবর সংগ্রহ করাও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। কোথায় বাদশা বেগমরা তাঁদের ঐশ্বর্য লুকিয়ে রাখেন এ খবরটা তিনি জানতে চেয়েছিলেন। সব কিছু তিনি জানতে পারেন নি। সিতারা বেগম হারেমের সব কিছু খবর জানেন না। তবে একটি খবর তিনি বেগমের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন সেটা এই যে মোগল বাদশার কাছে একটি হীরক খণ্ড আছে, যার নাম কোহিনূর। তার চেয়ে মূল্যবান প্রস্তরখণ্ড নাকি মোগল দরবারে আর নেই। আর সে কোহিনূর থাকে সম্রাটের উষ্ণীষে।

শাহ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মোগল হারেম থেকে বিশেষ কোন জিনিষ সিতারা বেগমের চাইবার আছে কি না। সিতারা বেগম হীরা, পান্না, চুনী, মুক্তা কিছু চাননি, চেয়েছেন শুধুমাত্র হারেমের কয়েকজন বাঁদী। তিনি এখানে কিছুটা নিঃসঙ্গ বোধ করেছেন।

আশ্চর্য বেগম, যার ঐশ্বর্যের লোভ পর্যন্ত নেই। হেন রমণী-রত্ন আমি পূর্বে কখনো দেখিনি; শাহের অসীম ভাগ্য—তিনি নারীরত্ন লাভ করেছেন। আমারও ভাগ্য বলতে হবে—এমন বেগম সাহেবার হারেমের খোজা নিযুক্ত হয়েছি আমি।

ইদুজ্জোহার দিন মস্‌জিদে মস্‌জিদে সারাটা সকাল শাহের নামে খুতবা পাঠ করা হল। দুপুর বেলা শাহী ফৌজ বেরুলো

দিল্লীর আমীরদের গৃহ তল্লাসী করতে। আহম্মদ খাঁ শাহের দেহরক্ষী ফৌজ নিয়ে গেল হারেম অনুসন্ধান করতে। আমি সঙ্গে গেলুম। ঘরে ঘরে ঢুকে বেগমদের ব্যক্তিগত ধনরত্ন সংগ্রহ করা হোল। দেওয়ান-ই-খাস থেকে আরম্ভ করে খাস মহল পর্যন্ত সর্বত্র তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল। তারপর দেওয়াল থেকে মূল্যবান পাথরগুলিকে উঠিয়ে নেওয়া হতে লাগল। আমার ব্যথা হতে লাগল। শিল্পের অঙ্গহানী বড় যন্ত্রণানায়ক। মনে হতে লাগল—যেন শত শত নিষ্ঠুর সিরাজাই বেগম সফাভিদ বেগমদের চোখের মণি উঠিয়ে নিচ্ছে।

আমি খোজা, আমার কোন বক্তব্য নেই, শুধুমাত্র নীরব দর্শক হওয়া ছাড়া। থাকলে শাহকে পরামর্শ দিতুম, শিল্প সৃষ্টির অঙ্গহানী যেন তিনি না করেন।

ইজুজ্জোহার দিন ভালই কাটল। কোন গোলমাল হল না। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা একটা চাপা আক্রোশ লক্ষ্য করা গেল দিল্লীর নাগরিকদের মধ্যে। তিলে তিলে সঞ্চিত অর্থ তাদের জীবন অপেক্ষা নাগরিকদের কাছে কম প্রিয় নয়। লুণ্ঠকের হাতে সারা জীবনের সঞ্চিত ঐশ্বর্য তুলে দিতে তাদের বুক জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিল।

পরদিন কিছু কিছু বদ্‌লোকে ঘটনাকে জটিল করে তুলল। তারা একটা গোলমাল সৃষ্টির চেষ্টা করছিল। কিন্তু শাহী ফৌজের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, হেন বুকের পাটা কার! সুতরাং শাহ জীবিত থাকতে তাঁর ফৌজের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে কারো সাহসে কুলাবে না এটা বুঝে বদ্‌লোকেরা গুজব রটালো যে, শাহ নিজের শিবিরে গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হয়েছেন।

একটা ঘৃণিত আক্রোশ জমে উঠছিল শাহী ফৌজের বিরুদ্ধে দিল্লীর নাগরিকদের। শাহের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে অনেকেই রুখে দাঁড়াল। চকবাজারে কয়েকজন শাহী ফৌজকে গুণ্ডারা মেরে

ফেলল। অনেকেই অস্ত্র তুলে দাঁড়াল। দু-একজন আমির সাহস পেয়ে কিছু কিছু মোগলাই ফৌজ সংগ্রহ করে ফেললেন।

দিল্লীতে একটা গোলমাল পাকিয়ে উঠল। সালিমার বাগে গোলমাল শুনে শাহ আহম্মদ খাঁকে ডেকে পাঠালেন। আহম্মদ আসতেই বললেন: দিল্লীতে গুঞ্জরণ কিসের? আহমদ খবরটা শুনতে পেয়েছিল। বলল: চকবাজারে কিছু কিছু গুণ্ডা আমাদের দু-একজন ফৌজকে মেরে ফেলেছে। কা'রা রটিয়ে দিয়েছে, শাহেন শা দুর্বৃত্তদের হাতে নিহত হয়েছেন। সেই সুযোগে দু-এক জন মোগল আমির ফৌজ সংগ্রহ করবার চেষ্টা করছেন।

দীর্ঘকায় দৈত্য সাদৃশ্য নাদিরের ক্রোধের সঙ্গে আমার পূর্বের পরিচয় আছে। এই হঠকারিতা সংবাদে তার উপর কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে আমি জানতুম। সঙ্গে সঙ্গে শাহের দুটি চোখ যেন প্রভাতের সূর্যোদয়ের মত রক্তবর্ণ ধারণ করল। তার নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হল। দেহ কাঁপতে লাগল। তিনি গম্ভীর কণ্ঠে ডাকলেন: আহমদ!

আভূমি নত হয়ে কুর্নিশ জানিয়ে আহম্মদ বলল: হুকুম করুন শাহেন শা।

শাহ বললেন: যে দিল্লীর নাগরিকেরা রটনা করেছে যে, আমি মৃত, তাদের প্রত্যেককে মৃত দেখতে চাই আমি! আমার স্পষ্ট হুকুম —দিল্লীর ওপর রক্তের স্রোত বইয়ে দাও। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে যাকে পাও তাকে হত্যা কর। দিল্লীতে কোন মোগলের অস্তিত্ব আমি রাখব না।

শাহের হুকুম শোনামাত্র আমি চমকে উঠলুম। এরপর যে নৃশংস কাণ্ড ঘটবে তা অনুমান করা যায় না। সিরাজাই বেগমের নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা বৃত্তিও এমন পৈশাচিক ধ্বংসলীলা কল্পনা করতে পারতো না।

দিল্লীর দুর্ভাগ্য। আর একবার দিল্লী এমন ভয়াবহ নরহত্যার সম্মুখীন হয়েছিল। আমির তৈমুরের অনুসঙ্গীরা এমন হত্যাকাণ্ড আরম্ভ করেছিল যে, মানুষের মৃত দেহে রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দুর্গন্ধে তৈমুর পর্যন্ত তাড়াতাড়ি দিল্লী ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিলেন। দুইমাস যাবত নাকি দিল্লীর আকাশে একটি পাখিও উড়েনি। দিল্লীর ভাগ্যে আবার কি আছে কে জানে।

বেলা এক প্রহর থেকে শাহের হুকুম অনুযায়ী আমাদের ফৌজেরা দিল্লীর অধিবাসীদের কোতল করতে আরম্ভ করল। নরনারী নির্বিশেষে যাকে দেখতে পেল তাকেই হত্যা করতে লাগল। মনোরম গৃহ যেখানেই চোখে পড়ল সেখানেই ঢুকে পড়তে লাগল ফৌজেরা। তন্ন তন্ন করে সে-সব গৃহ খুঁজে অর্থ, আসবাব পত্র, মণিমুক্তা যা পেতে লাগল সব সংগ্রহ করতে লাগলো। জেনানাদের দেহ থেকে অলঙ্কার কেড়ে নেওয়া হতে লাগল। তারপর চলল বলাৎকার, হত্যা, খুন। সর্বশেষে গৃহে গৃহে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হতে লাগল। শাহ স্বয়ং ঢুকলেন দিল্লী হারেমে। তার চোখের সামনে হারেম লুণ্ঠন করা হতে লাগল। দিল্লীতে আর্ত ক্রন্দন রোলে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। আগুনের তেজে দিল্লী যেন সাহারা মরুভূমির মত তেতে উঠল। সালিমারবাগে আমাদের শিবিরে পর্যন্ত সেই আর্ত কান্নার শব্দ শোনা যেতে লাগল।

সিতারা বেগম কিছু জানতেন না। হঠাৎ আকাশে ধূয়ার কুণ্ডলী দেখে, বাতাসে চিৎকার ও ক্রন্দন ভেসে আসতে শুনে তিনি আমাকে বললেন: আগা, আকাশে ধূয়া কিসের, এত লোকের কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছি কেন?

বললুম: বেগম সাহেবা, শাহ ক্রুদ্ধ হয়ে দিল্লীর অধিবাসীদের হত্যা করবার আদেশ দিয়েছে। লোকদের মরণ চিৎকার উঠছে। গৃহে গৃহে অগ্নি সংযোগ করা হচ্ছে, আকাশে তারই ধূয়া।

ভীত, শঙ্কিত দুটি চোখ মেলে বেগম সাহেবা আমার দিকে তাকালেন : কেন, কেন আগা ?

বললুম : দুর্বৃত্তেরা মিথ্যে সংবাদ রটিয়েছিল যে আমাদের শাহের মৃত্যু হয়েছে। সেই সুযোগে তারা কয়েকজন শাহী ফৌজকে হত্যা করেছে। আমাদের শাহ ক্রুদ্ধ হয়ে দিল্লীর নাগরিকদের হত্যা করবার ঢালাও হুকুম দিয়েছেন।

বেদনার্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন বেগম সাহেবা। মাঝে মাঝে 'বাঁচাও বাঁচাও' আর্ত চিৎকার শুনে কানে আঙ্গুল দিতে লাগলেন তিনি। আকাশের দিকে তাকিয়ে ধূয়ার কুণ্ডলী দেখে চোখ ঢাকতে লাগলেন।

কোমল-হৃদয় নারী তো দূর স্থান—সে আর্ত চিৎকার শুনে, আমারও মনটা বড় বেশী চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগল। অসহায় মানুষের এমন নির্মম শাস্তি দেখলে নিষ্ঠুরতম হৃদয়ও টলবে।

চিৎকার ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। আকাশে ধূয়ার কুণ্ডলী ক্রমশঃ গাঢ় হতে লাগল। বেগম সাহেবা অস্থির ভাবে একবার উঠতে লাগলেন, একবার বসতে লাগলেন। তাঁর কোমল অন্তরের অব্যক্ত যন্ত্রণা আমি অনুভব করতে লাগলুম।

বেলা দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হলে সিতারা বেগম অস্থির হয়ে উঠলেন। বললেন : আগা, এ নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড কি বন্ধ হবে না ? বললুম : সবই খুদার মর্জি। আমাদের শাহের মেজাজ ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত এ চলবেই।

হঠাৎ বেগম সাহেবা এক অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসলেন আমাকে : মানুষ মানুষকে এমন করে হত্যা করে কেন আগা ?

এ প্রশ্নের কি উত্তর দেব আমি ? দার্শনিক হলে হয়তো কিছু ভেবে বলতে পারতুম। বললুম : বেগম সাহেবা, এ প্রশ্নের

উত্তর আমার জানা নেই। মনে হয় মানুষের মনে ভালবাসার অভাব হলে একে অপরকে হত্যা করতে অগ্রসর হয়।

—মানুষের মনে ভালবাসার অভাব কেন হয় আগা ?

বললুম : স্বয়ং খুদা ছাড়া, এ প্রশ্নের উত্তর কে দেবেন বেগম সাহেবা।

সিতারা বেগম একটু চুপ করলেন। তারপর বললেন : শাহের মনেও কি ভালবাসা নেই বলতে চাও তুমি আগা ?

বললুম : রাজপুরুষের ভালবাসার রীতিনীতি আমাদের দৃষ্টি থেকে আলাদা বেগম সাহেবা। আমরা তাঁদের হয়তো ঠিক বুঝিনে।

সিতারা বেগম বললেন : আগা, তোমরা শাহকে চেননি, আমি চিনেছি। তার হৃদয় যথেষ্টই কোমল। তিনি ভালবাসতে জানেন। আমার মনে হয় শাহকে ভুল বুঝিয়ে এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড করানো হচ্ছে। তাকে বোঝানো হলে…।

বললুম : একথা বিশ্বাস করি বেগম সাহেবা। কিন্তু তাঁকে বোঝাবে কে ? শাহের সিদ্ধান্তের উপরে পরামর্শ দিতে গেলে তাঁর জীবন সংশয় অনিবার্য।

—তাকে বোঝাতে পারে, এমন কেউ কি নেই আগা ? আমি যে আর এই কান্না সহ্য করতে পারছিনা।

বললুম : শাহ. নিজের সিদ্ধান্তের বাইরে কারো কথা আজ পর্যন্ত শোনেন নি। তবে তিনি আপনাকে যথেষ্ট পেয়ার করেন।

সিতারা বেগম বললেন : আগা, আমাকে তুমি শাহের কাছে নিয়ে চল, তাঁকে আমি বুঝিয়ে বলব।

তখন আর্ত চিৎকার বীভৎসতায় রূপান্তরিত হচ্ছিল। মরুভূমির মত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল সহর। আমাদের সালিমারবাগে এসে তার আঁচ লাগছিল। কি চরম হত্যাকাণ্ড বাইরে চলেছে ভেবে আমার দেহ শিউরে উঠতে লাগল।

আমির তৈমূরও বুঝি আমাদের শাহের কাছে হার মেনে যাবেন। যোদ্ধার ক্রোধানলকে বাড়তে দিলে বাড়তেই থাকে। হত্যার একটা উন্মাদনা, নেশা, আনন্দ জাগে তার মধ্যে। সময় মত জল সিঞ্চন না করতে পারলে আগুন নেভে না। ভাবলুম, কে শাহের ক্রোধাগ্নিতে বারি সিঞ্চন করতে পারেন? একমাত্র সিতারা বেগম ছাড়া শাহের হৃদয়ের উপর কার এত প্রভাব আছে? কিন্তু তাকে কি শাহের কাছে অনুরোধ করতে পাঠানো ঠিক হবে? উত্তেজনা বশে শা' যদি ভালবাসার মূল্য না দিয়ে বেগম সাহেবারই ক্ষতি করে বসেন? ক্রোধের মুহূর্তে আমি শাহকে দেখেছি। তখন তিনি সমস্ত বিচার বুদ্ধির বাইরে চলে যান। আমি তাই বেগম সাহেবার অনুরোধের উত্তরে কিছু বললুম না।

উদ্বেগাকুল বেগম সাহেবা আমায় আবার বললেন: কই আগা আমার কথার জবাব দিলে না তো? চল, আমাকে শাহের কাছে নিয়ে চল!

বললুম: শাহ যদি আপনার উপর রাগ করেন?

ব্যাকুল ভাবে বেগম সাহেবা বললেন: আমার উপর শাহ রাগ করবেন না। আমি বুঝিয়ে বলব। যদি ক্রুদ্ধ হন বলব, আমাকে হত্যা করে নিরীহ দিল্লীর অধিবাসীকে রেহাই দিন শাহেন শা। আমি যে এই আর্ত কান্না আর সইতে পারছিনা আগা।

নারী চরিত্রের আর একটি রূপ সেই মুহূর্তে আমার চোখে ভেসে উঠল—সিরাজাই বেগম। আজ তার মনে হয়তো শান্তি নেই, কিছু ভাবছেন না। কিন্তু যদি শাহের কৃপাদৃষ্টিতে আজ তিনি সিতারা বেগমের পর্যায়ে থাকতেন, তা হলে হয়তো এই বীভৎস দৃশ্যে তিনি আরো আনন্দ পেতেন। পেয়ালা পেয়ালা সিরাজী পান করে, বিহ্বল দৃষ্টিতে আকাশের এই ধূঁয়ার কুণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে থাকতেন। শাহকে অনুরোধ করতেন, যেন এই হত্যাকাণ্ড

বন্ধ করা না হয়,—সমস্ত দিল্লী শহর শ্মশানে পরিণত হলে তিনি নিজের চোখে দেখবেন। একই মানুষের মনে এমন দুই বিপরীত কল্পনা কেমন করে হয়? হায় সিতারা বেগম! তোমার মূল্য দুনিয়ায় কে দেবে?

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সিতারা বেগম বললেন:— কই আগা, তুমি আমার কথার জবাব দিচ্ছ না? চল, আমাকে শাহের কাছে নিয়ে চল।

বললুম: বেগম সাহেবা, আমাদের দুর্ভাগ্য যে শাহ এখন শিবিরে নেই।

—কেন? কোথায় তিনি?

—শাহ স্বয়ং কেল্লার হারেমে গিয়েছেন লুণ্ঠনের তদারক করতে।

হতাশায় যেন ভেঙে পড়লেন সিতারা বেগম। তিনি শয্যার উপর উপুর হয়ে পড়ে উপাধানে নিজের মুখ লুকালেন।

আমি বাইরে আকাশের ধূঁয়ার কুণ্ডলির দিকে তাকিয়ে মানুষের করুণ ভাগ্যের কথা ভাবতে লাগলুম। মনে মনে খুদাকে ডেকে বলতে লাগলুম: খুদা, তুমি মুখ তুলে তাকাও। মানুষকে এই বীভৎস যন্ত্রণার হাত থেকে রক্ষা কর।

চিৎকার, কান্না, হত্যা চলতেই থাকল। বহু লোক পালাবার পথে সালেমার বাগের কাছেই আমাদের ফৌজের হাতে নিহত হল। এই হত্যাকাণ্ড বন্ধ হবার কোন সম্ভাবনা আমি দেখতে পেলুম না।

অপরাহ্নের দিকে একটি ভীত সন্ত্রস্ত লোক এসে আমাদের শিবিরের সামনে দাঁড়াল। তার মুখ মৃতের মত ফ্যাকাশে। আমি তাকিয়ে চিনতে পারলুম—সে মোগল। হয়তো সে প্রাণের ভয়ে আমাদের কাছে আশ্রয় নিতে এসেছে। আমি তার দিকে সমবেদনার নিয়ে তাকালুম। আমার সেই সমবেদনার দৃষ্টির সামনেও সে

যেন মিইয়ে গেল। আমাকে কুর্ণিশ জানিয়ে সে থর থর করে কাঁপতে লাগল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম : তুমি কে ?

শঙ্কিত ভাবে সে আমার দিকে একখণ্ড কাগজ বের করে দিল।

—এটা কি ?

—একটি বার্তা।

—কার ? তুমি কার কাছ থেকে আসছ ?

সে বলল : আমি মোগল হারেমের একজন সামান্য খোজা। বাদশা মহম্মদ শা এই বার্তা পাঠিয়েছেন।

—কাকে ?

—হজরত সিতারা বেগমকে।

কেন ?

ভয়ে ভয়ে সে বলল : আমি জানি না জনাব। আমি আজ্ঞাবহ মাত্র।

বললুম : আচ্ছা তুমি যাও। আমি এটা বেগম সাহেবার কাছে পৌঁছে দেব

খোজা আমাকে সেলাম জানিয়ে বলল : জনাব, গোস্তাকী নেবেন না, বাদশার হুকুম, এর জবাব নিয়ে যেতে হবে, খুব জরুরী।

আমি তাকে বসতে বললুম।

সে বলল : জনাব, মেহেরবানী করে এই বার্তা জরুরী ভেবে বেগম সাহেবার হাতে পৌঁছে দিন। বহু লোকের জীবন-মরণ নির্ভর করছে একখণ্ড চিরকুটের উপর।

আমি তাকে আশ্বস্ত করে তৎক্ষণাৎ বেগম সাহেবার শিবিরে প্রবেশ করলুম।

পদশব্দে আমার দিকে ফিরে তাকালেন বেগম সাহেবা। বোধ হয় তিনি কেঁদেছেন। চোখ দুটো তাঁর ভেজা। আমায় দেখে বললেন : আগা, আমি যে আর সইতে পাচ্ছি না! শাহ কি এখনও ফেরেন নি?

আমি বললুম : বেগম সাহেবা, মোগল হারেম থেকে আপনার জন্য একটি বার্তা এসেছে।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন বেগম সাহেবা : কই, কই দেখি! শাহ কী আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?

বললুম : শাহ নন। মোগল বাদশা মহম্মদ শা আপনাকে এই বার্তা পাঠিয়েছেন।

যেন হতাশ হলেন সিতারা বেগম। এ বার্তার জন্য কোন প্রকার আগ্রহ দেখালেন না।

বললুম : বোধ হয় খুব জরুরী বার্তা, আপনাকে এখুনি সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

সিতারা বেগম কি একটু ভাবলেন। মহম্মদ শার কথা শুনে তিনি বিরক্ত হলেন কি? সিতারার প্রতি তিনি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, লাম্পট্য দেখিয়েছেন, সে কথা তাঁর মনে পড়ে গেল কি? আমি বাদশার সেই বার্তা তাঁর দিকে বাড়িয়ে ধরলুম। কিন্তু বেগম সাহেবা আমাকে হতাশ করে বললেন : আমি এখন শাহী হারেমের বেগম। পর পুরুষের পত্র আমি গ্রহণ করতে পারি না আগা।

জরুরী পত্র বলে মহম্মদ শা খোজা পাঠিয়েছেন সিতারা বেগমের কাছে। তিনি জানেন, আমাদের শাহের সর্বাপেক্ষা ভালবাসার পাত্রী আজ সিতারা বেগম। নিশ্চয়ই কোনপ্রকার আবেদন আছে, যা সিতারা বেগমের মারফৎ তিনি শাহের কাছে রাখতে চান। শাহের দরবারে আবেদন পাঠাবার অন্য কোন মাধ্যমে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন নি। লক্ষ লক্ষ লোকের ভাগ্য হয়তো জড়িত রয়েছে একটি

মাত্র পত্রের মধ্যে। এ পত্রকে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। তাই আমি কৌশল করে বললুম : বেগম সাহেবা, মোগল বাদশা এ পত্র কোন পরস্ত্রীর কাছে পাঠিয়েছেন বলে আমার মনে হয় না। আমার মনে হয় তিনি আবেদন পাঠিয়েছেন শাহেনশার প্রধানা বেগমের নিকট। এ পত্রকে আপনি সামান্য একজন প্রজার আবেদন হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন। মোগল বাদশা, বর্তমানে শাহের দরবারে একজন সামান্য আমির বইতো নন!

সিতারা বেগম এক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর বললেন : আগা তোমার যদি সে রকম মনে হয়, এ পত্র তুমি গ্রহণ করতে পার। কিন্তু আমি তো পড়তে জানি না আগা।

বললুম : পত্র পাঠ করবার তক্‌লিব আপনাকে সহ্য করতে হবে না বেগম সাহেবা। সে কাজের দায়িত্ব আপনার এই বিশ্বস্ত বান্দার উপর দিতে পারেন।

বেগম সাহেবা আমাকে মোগল বাদশার বার্তা পাঠ করবার অনুমতি দিলেন।

আমি আমাদের বেগম সাহেবার কাছে পাঠানো মোগল বাদশার সেই আবেদন পত্র তাঁকে পাঠ করে শোনালাম। বাদশা লিখেছেন :

মহামান্য বেগম সাহেবা,

জীবনে ভুল ত্রুটি হয়তো অনেক করেছি। কিন্তু যিনি বড় ছোটজনের ছোট ত্রুটি তিনি আনায়াসেই ক্ষমা করতে পারেন। আপনার উপযুক্ত মর্যাদা দিতে পারিনি, কিন্তু একথা ঠিক আপনাকে চিনতে পেরেছিলুম। আপনি আমাদের ক্ষুদ্র পরিধির অনেক উর্ধ্বে। খুদাতালার বিচারে ভুল হয় না। আপনাকে তিনি আপনার যথাযোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আজ আপনার হাতে অসীম ক্ষমতা। ইচ্ছা হলে আমাদের মত ক্ষুদ্রজনের বিচারের ভার আপনি

নিজে হাতে নিতে পারেন। কিন্তু ক্ষুদ্রজনের ক্ষুদ্র ত্রুটি ধরে আপনার মন কখনো নিচে নেমে আসবে না জানি।

দিল্লী-হারেম এবং আমাদের মত ত্রুটিপূর্ণ লোক সম্পর্কে আপনার কোন ক্ষোভ থাকলেও থাকতে পারে। সেজন্য ব্যক্তিগত ভাবে আপনার কাছে আবেদন পাঠিয়ে আপনাকে বিব্রত করতে চাইনা। কিন্তু আমি জানি, সাধারণ মানুষের জন্য আপনার কোমল অন্তকরণে দরদের অন্ত নেই। একদিন আপনার চোখে সাধারণ মানুষের জন্য আমি অশ্রু দেখেছিলুম। দিল্লীর একদল আমির যখন মারাঠা দস্যুদের লেলিয়ে দিয়ে সাধারণ গৃহী-লোকের সর্বনাশ করেছিল, আপনি তা দেখে আমাকে জাবিদ খাঁর উপদেশে কর্ণপাত না করে তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বলেছিলেন। আপনার চোখে সেদিন জনগণের জন্য অসীম মর্মবেদনা দেখেছি।

আপনার হৃদয়ের করুণার উৎস সেই সাধারণ লোকদের জন্য আজো শুকিয়ে যায়নি বলে আমার নিশ্চিন্ত বিশ্বাস আছে। আমাদের সকল ভুলত্রুটিকেও আপনি ক্ষমার চোখে দেখেছেন; নইলে শাহেন শা নাদির কুলির মাধ্যমে আপনি মোগল হারেমের মর্যাদা ধূলায় লুটিয়ে দিতে পারতেন। শাহেন শা হারেমের জেনানাদের উপর হস্তক্ষেপ করেন নি। আমি জানি আপনার করুণা না থাকলে হারেমের মর্যাদা রক্ষা পেতনা। কিন্তু তথাপি আমি হারেমের জন্য চিন্তিত নই।

আমি শাসন ক্ষমতার অধীশ্বর হলেও জন কল্যাণের দিকে কখনো দৃষ্টিপাত করিনি। সে দিক থেকে প্রজা-দরদী শাসক আমাকে বলা যায় না। কিন্তু সেই আমিও আজও দিল্লীর অসহায় অধিবাসীদের উপর নির্মম উৎপীড়ন দেখে স্থির থাকতে পারছি না। আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ও মানুষের বিরাট ভাগ্য বিপর্যয়ে আজ নিতান্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আজ আমি স্বীয় সাম্রাজ্যে অসহায় এক পুতুলের মত অবস্থান করছি। প্রজাবর্গের জন্য অঙ্গুলী তেলনের অধিকার আমার নেই। কিন্তু আপনি,—যার হৃদয় চিরকাল জনগণের দুঃখ-দুর্দশায় কেঁদেছে, আপনিও কি মানুষের এই আর্ত চিৎকারে আজ বধির হয়ে আছেন? দিল্লীর আকাশ-বাতাস প্রতিধ্বনিত করে মানুষের এই আর্তকান্নার করুণ সুর কি আপনার কানে পৌঁছাচ্ছে না?

হিন্দুস্থানের সাধারণ জনগণের নামে, আমি তাদের অসহায় বাদশা মহম্মদ শা আপনার দরবারে আবেদন পেশ করছি, আপনি হতভাগ্য দিল্লীর অবশিষ্ট মানুষের জীবন রক্ষা করুন। এখনো সময় আছে, আর যদি কয়েক প্রহর এই নরহত্যা চলে, তবে দিল্লীতে একটিও জনপ্রাণীর অস্তিত্ব থাকবে না। ইতিমধ্যেই প্রায় ত্রিশহাজার নরনারী প্রাণ হারিয়েছে। রাজপথে মৃতের স্তূপ জমেছে। আর্ত কান্নায় পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হচ্ছে। আপনার কাছে আমার এবং আমার দরবারের করুণ আবেদন, আপনি এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে সাহায্য করুন।

একদা আমির তৈমুরের ক্রোধবহ্নি থেকে দিল্লীর মৌলানারা কিছু সংখ্যক লোকের জীবন রক্ষা করেছিলেন। আপনি ইচ্ছা করলে এখনো বহু লোকের জীবন রক্ষা করতে পারেন।

শাহের কাছে আবেদন পত্র নিয়ে যাবে, হেন সাহস কারো নেই। আপনি একবার হারেমে আসুন। শাহকে বুঝিয়ে নিবৃত্ত করান। হারেমে এসে আপনার চোখে অশ্রু সংবরণ করা কঠিন হবে। দেওয়ানী খাসের মণি, মুক্তা, জহরৎ, সব উধাও হয়েছে। খাস মহলের দেয়াল থেকে মণি মুক্তাগুলি তুলে নেওয়া হচ্ছে। মোগল হারেম আজ শ্রীহীন। বেগম সাহেবারা হায়াৎ বক্স বাগানে জড় হয়ে অভুক্ত অবস্থায় বসে আছেন। শাহী ফৌজেরা এখনো তন্ন তন্ন করে

হারেম খুঁজছেন। আমাদের এই করুণ আবেদন গ্রহণ করে আল্লার আশীর্বাদ সংগ্রহ করুন। এই মুহূর্তে আপনি ছাড়া হতভাগ্য দিল্লীর অধিবাসীদের রক্ষা করবার আর কেউ নেই।

ইতি—

হতভাগ্য বাদশা মহম্মদ শা

মোগল বাদশার করুণ মিনতিভরা পত্র শুনে বেগম সিতারার দুই চোখ জলে ভিজে উঠল। তিনি বাক্ হারিয়ে ফেললেন।

আমি বললুম : বেগম সাহেবা, আপনি কি এর কোন জবাব দেবেন?

সিতারা বেগম বললেন : এ পত্র নিয়ে এসেছে কে?

বললুম : মোগল হারেমের একজন খোজা বেগম সাহেবা।

বেগম হুকুম করলেন : আগা, তুমি তাকে তাড়াতাড়ি আমার কাছে নিয়ে এস।

আমি বেগম সাহেবার ইচ্ছাক্রমে মোগল হারেমের খোজাকে ভেতরে নিয়ে এলুম।

খোজা ভেতরে প্রবেশ করে আভূমি নত হয়ে বেগম সাহেবাকে কুর্নিশ জানালো। উঠে দাঁড়াতেই দেখলুম তার চোখে অশ্রুর ধারা নেমেছে।

মোগল হারেম সিতারা বেগমের প্রতি যথেষ্ট দুর্ব্যবহার করেছে, তার মানবিকতাকে মূল্য দেয়নি। বাঁদীর বেশী তাকে কোনপ্রকার সম্মান দেওয়া হয়নি। আমাদের বেগম সাহেবা যদি লোভ, ঘৃণা, বিদ্বেষ, প্রতিহিংসপরায়ণতা, প্রভৃতি সাধারণ গুণের বশবর্তিনী হতেন, তবে হয়তো এই মুহূর্তে হারেমের দুর্ভাগ্যটাকে উপভোগ করে তিনি বিদ্রূপাত্মক বাক্যে মোগল খোজাকে জর্জরিত করতে পারতেন। কিন্তু সিতারা বেগম আল্লাহতালার এক বিশেষ সৃষ্টি। হৃদয়ের

নিচুতা তার মধ্যে নেই। বাদশা মহম্মদ শা তাঁর পত্রে সিতারা বেগমের আসল চরিত্র স্পষ্ট করে ফুটিয়েছেন কিন্তু কি হতভাগ্য এই বাদশা, মানুষের প্রকৃত মূল্য তিনি দিতে পারেন নি। চোখ থাকতে মানুষ চোখের মূল্য বোঝে না। সিতারা বেগমকে হারিয়ে অন্ধ হয়তো তিনি কিছুটা বুঝতে পারছেন। সেই বিশ্বাসঘাতকতার মুহূর্তগুলিকে কি বাদশার মনে পড়ছে না আজ?

সিতারা বেগম মোগল খোজাকে দেখে উদ্বেগাকুল হয়ে উঠলেন। দেখলুম এ খোজাকেও তিনি চেনেন। ব্যস্তভাবে তিনি জিজ্ঞেস করলেন: মহম্মদ, হারেমের খবর বল। বেগম সাহেবারা কেমন আছেন?

চোখে জল নিয়েই খোজা মহম্মদ বলল: বেগম সাহেবা, বাদশার পত্রে সমস্ত বিষয় আপনি অবগত হয়েছেন। হারেমের খবর বর্ণনা করবার সাধ্য আমার নেই। হারেমের দিকে তাকান যায় না। মোগল হারেমের দুই চোখ যেন উপড়ে নেওয়া হয়েছে। বেগম সাহেবারা হায়াৎবক্স বাগানে মাঠের উপর বসে কাঁদছেন। বেগম সাহেবা আপনি দয়া করে মোগল হারেমের ইজ্জৎ রক্ষা করুন। আমাদের বাঁচান। দিল্লীতে আর কিছু নেই। আমিরেরা পথের ভিখারী হয়েছেন। পথে পথে মৃত দেহ ছড়িয়ে পড়ে আছে।

শুনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সিতারা বেগম।

খোজা মহম্মদ আবার আবেদন জানালো: বেগম সাহেবা, একটা জবাব দিন। আমাদের রক্ষা করুন।

সিতারা বেগম আমার দিকে তাকালেন: আমি কি করতে পারি আগা? শাহ তো এখনো ফেরেন নি। কিন্তু আমার হৃদয়টা জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে।

বললুম: বেগম সাহেবা, মানুষের দুঃখে আমারও মন বিচলিত হয়ে উঠেছে। অনেক নিষ্ঠুরতা আমি দেখেছি। কিন্তু এমন ব্যাপক

নরহত্যা আমার নজরে পড়েনি। শাহ শিবিরে থাকলে তাঁর কাছে করুণা ভিক্ষা করা যেত। কিন্তু···।

সিতারা বেগম একটু কি ভাবলেন। তারপর বললেন: আগা, তুমি ব্যবস্থা কর, আমি মোগল হারেমে যাব।

আমি বললুম: কিন্তু বেগম সাহেবা, শাহেন শার অনুমতি না হলে, আমিতো আপনাকে নিয়ে যেতে পারি না!

বেগম সাহেবা বললেন: শাহেন শার হুকুমের প্রয়োজন নেই। আমি বলছি, তুমি আমাকে কেল্লার হারেমে নিয়ে চল।

—শাহ যদি ক্রুদ্ধ হন?

বেগম সাহেবা বললেন: ক্ষুদ্র আমার এই জীবন। মানুষের কল্যাণের জন্য যদি এ জীবন যায়, তাতে ক্ষতি কি? আমার প্রিয়তম যদি আমার এ জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট হন, তবে এ জীবন আমি বিসর্জন দিতে রাজী আছি।

আমারও ইচ্ছা ছিল, সিতারা বেগমকে শাহের কাছে নিয়ে যাই। আমি নিশ্চিত জানি যে, একমাত্র সিতারা বেগম ছাড়া শাহের ক্রোধ কেউ প্রশমিত করতে পারবে না। কিন্তু এই উন্মত্ত খুন-খারাবির মধ্যে রাস্তার চলা কষ্টকর। শাহের হুকুম ছাড়া, আমার কথায় কোন দেহরক্ষীই আমাদের কেল্লার হারেমে পৌঁছে দেবে না। তবে? সিতারা বেগমকে সে-কথা জানালুম।

তিনি বললেন: দেহরক্ষীদের আমি হুকুম করছি।

বললুম: আপনার হুকুম তারা নাও শুনতে পারেন বেগম সাহেবা।

বেগম সাহেবা বললেন: শাহেন শা আমাকে একটি পাঞ্জা দিয়েছেন। বলেছেন, এই পাঞ্জার বলে যে-কোন হুকুম আমি শাহী সরকারকে করতে পারি। তুমি এই পাঞ্জা দেখিয়ে দেহরক্ষীদের আমাদের সঙ্গে কেল্লায় যেতে বল।

বললুম : তাহলে কেল্লায় যাওয়া অসম্ভব নয়। বেগম সাহেবার অভিরুচি মত আমি এই মুহূর্তে দেহরক্ষীদের হুকুম করছি।

শাহী পাঞ্জার ক্ষমতা শাহের হুকুমেরই মত। দেহরক্ষীরা সঙ্গে সঙ্গে বেগম সাহেবার হুকুমকে কুর্ণিশ জানিয়ে আমাদের নিয়ে সালিমারবাগ ছেড়ে বাইরে বেরুল। বেগমসাহেবাকে একটা হিন্দুস্থানী শিবিকায় চাপিয়ে দিয়ে পাশে পাশে আমি ঘোড়ার পিঠে চললুম। রাস্তায় বেরুতেই শাহী ফৌজের বীভৎস কাণ্ড চোখে পড়ল।

অধিকাংশ গৃহের দরজা ভাঙা। কোন কোন গৃহ থেকে এখনো ধূয়া উঠছে। কোন কোন গৃহ একেবারে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এখানে ওখানে মৃতদেহ পড়ে আছে। কুকুরগুলো বিভ্রান্ত হয়ে মড়া শুঁকে শুঁকে বেড়াচ্ছে। এখনো লাস ফুলে পচে উঠেনি, সুতরাং কামড়ে ছিঁড়ে খাবার সাহস হচ্ছে না। বিভ্রান্তভাবে হঠাৎ চিৎকার করে উঠছে তারা।

মৃতদেহগুলিকে লক্ষ্য করে দেখলুম, অধিকাংশ বান্দা বাঁদীদের দেহ। আমিররা খুব কমই আছেন দিল্লীতে। শাহী ফৌজ আসার খবর পেয়েই দিল্লী ছেড়ে গা ঢাকা দিয়েছেন তারা। ঘরে ঘরে সে-সব বান্দারা পাহারা দিত সেই সব হতভাগ্যেরা ক্রুদ্ধ শাহী-ফৌজের হাতে প্রাণ দিয়েছে। মুসলমানের দেহ বেশী। কিছু কিছু হিন্দুর দেহও আছে। নারী, শিশুও বাদ যায়নি, তাদের দেহও আছে। এই সব মৃতদেহগুলি পঁচে উঠলে, আকাশ থেকে শকুন নামবে। আশে-পাশে থেকে শেয়াল আসবে। গৃহপালিত কুকুরগুলি পর্যন্ত পচা মাংসের গন্ধে পাগল হয়ে উঠবে। হায় আল্লা, মানুষের ভাগ্য!

এক জায়গায় দেখলুম—কোমড়ে দরি বেঁধে পিঠে চাবুক কষতে কষতে একদল লোককে সালিমারবাগের দিকে তাড়া করে নিয়ে

চলেছে শাহী-ফৌজেরা। এদের চেহারা দেখে মনে হল এরা সম্ভ্রান্ত বংশের। হয়তো আশানুরূপ অর্থ পাওয়া যায়নি বলে এদের বেঁধে আনা হচ্ছে। দৈহিক নিপীড়ন চালিয়ে এদের গুপ্তধনের সন্ধান বের করা হবে। কোন আশা না থাকলে ফৌজের হাতে এতক্ষণ গর্দান নেমে যেত এদের। যে হতভাগ্য লোকগুলো প্রাণ হারিয়ে রাজপথে গড়াগড়ি যাচ্ছে তাদের কাছ থেকে পাওনা-দাওনার কোন আশাই ছিল না। ভাবলুম, গরীব লোকের ভাগ্য চিরকালই বিরূপ। সমাজের এবং অপরের পাপের শাস্তি এই সব হতভাগ্য লোকদেরই বহন করতে হয়।

সূর্য তখন আকাশের গায় পশ্চিম দিকে অনেকটা নেমে গেছে। দুই ঘণ্টা দ্রুত চলবার পর আমরা লালকেল্লার লাহোর দরজাতে এসে উপস্থিত হলুম।

শাহী-ফৌজ দুয়ার পাহারা দিচ্ছিল। তারা বেগমসাহেবাকে দেখে সসম্ভ্রমে কুর্নিশ জানিয়ে পথ ছেড়ে দিল। আমরা ভেতরে ঢুকলুম।

লালকেল্লার নহবৎখানায় আজ আর শানাইয়ের সুর নেই। ছত্তচৌকের পণ্য গৃহগুলি লুন্ঠিত। দুই পাশে কোন শৃঙ্খলা নেই। সেখানেও দু-একটা মৃতদেহ পড়ে রয়েছে।

নহবৎখানা ছাড়িয়ে আমরা দেওয়ান-ই-আমে প্রবেশ করলুম। দেওয়ান-ই-আম ফাঁকা।

খবর পেলুম, শাহ দেওয়ান-ই-খাসে ময়ূর সিংহাসনের উপর বসে স্বয়ং হারেমের ঐশ্বর্য লুণ্ঠনের তদারক করছেন। একজন দেহরক্ষীকে পাঠিয়ে শাহকে বেগম সাহেবার আগমণের সংবাদ দিলুম।

আহম্মদ খাঁর সঙ্গে বসে শাহ তখন হারেমের গোপন কক্ষের মণিমুক্তার সন্ধান কি করে সংগ্রহ করা যায় সেই পরিকল্পনা করছিলেন। বেগমসাহেবা সিতারা বেগম হঠাৎ সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতে পারেন এ-কথা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি।

হয়তো তিনি আশ্চর্য হয়েছিলেন। বিরক্ত হয়েছিলেন কিনা তাই বা কে জানে! আমি তখন বেগমসাহেবার পাশাপাশি ছিলুম, কিছু দেখতে পাইনি।

সংবাদ শুনে শাহ দেওয়ান-ই-খাস থেকে অন্য সকলকে বাইরে পাঠিয়ে দিলেন। বেগম সাহেবাকে নিয়ে আমি ভেতরে গেলুম।

শাহের সামনে দাঁড়িয়ে বেগম সাহেবা তাঁর বোরখা খুললেন। আমি দেখলুম, তার দুই চোখে অবিরল অশ্রুধারা। যে নারী স্বীয় সম্মান রক্ষার্থে নাদিরকে দেখেই একদিন কোমড় থেকে ছোরা বের করেছিল, মানুষের দুঃখে সে-ই তার চোখের জল রাখতে পারছে না।

বেগমের চোখে জল দেখে শাহ বুঝি একটু বিচলিত হলেন। বললেন : সিতারা তুমি!

হাঁটু গেড়ে সিতারা বেগম প্রার্থনার ভঙ্গীতে শাহের পায়ের কাছে বসে বললেন : শাহেন শা, আপনি প্রথম রজনীতে আমাকে আপনার কাছ থেকে মনোমত কিছু একটা প্রার্থনা করতে বলেছিলেন, আমি সেই প্রার্থনা করতে এসেছি।

শাহ বিস্মিত হয়ে বেগমের মুখের দিকে তাকালেন।

বেগম সাহেবাও করুণা বিগলিত নয়নে শাহের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

শাহ স্নেহ মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন : বল, তোমার কি চাই?

বেগম সাহেবা আবেগ জড়িত কণ্ঠে বললেন : শাহেন শা, দিল্লীর সাধারণ মানুষের আর্তনাদ আমাকে বড় বিচলিত করেছে। বহু নির্দোষ লোকের মৃত্যু হয়েছে। সাধারণ মানুষ তো শাহেনশার দরবারে কোন দোষ করেনি। তবে তাদের এই নিষ্ঠুর শাস্তি দিচ্ছেন কেন? সাধারণ মানুষের এই নিপীড়ন আমি সহ্য করতে পারছি না জাঁহাপনা। আপনি এই হত্যাকাণ্ড বন্ধ করবার আদেশ দিন।

এক মুহূর্ত শাহ অশ্রুসিক্ত বেগমের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। বেহেস্তেও এত সুন্দর মুখ আছে বলে আমার মনে হল না।

শাহ উঠে দাঁড়িয়ে বেগমকে দুই হাত ধরে তুললেন, তারপর বললেন: সিতারা বেগম, তোমাকে অদেয় আমার কিছু নেই।

এই মুহূর্তে আমি নরহত্যা বন্ধের নির্দেশ দিচ্ছি। তুমি খুশি?

আনন্দের আবেগে বেগম সাহেবার দুই চোখে আরো বেশী করে অশ্রু ফুটল। বললেন: আমি খুশি শাহেন শা। শুধু খুশি নয়। সুখীও। এই মুহূর্তে আমার চেয়ে সুখী দুনিয়াতে কেউ নেই।

শাহের মুখেও এক আশ্চর্য হাসি ফুটল। প্রিয়তম ব্যক্তিকে খুশি করবার মত তৃপ্তিকর আনন্দ দুনিয়াতে আর কি আছে!

সিতারা বেগম বলল: জাঁহাপনা, সামান্য বাঁদীর প্রতি আপনি অসীম করুণা প্রদর্শন করেছেন। হুকুম করুন এবার আমি সালিমার বাগে ফিরে যাই।

শাহ সস্নেহে বেগম সাহেবার চিবুক স্পর্শ করে বললেন: সিতারা তুমি সামান্যা নও, তুমি অসামান্যা। তুমি আমার তাজের মণিগুলির চেয়েও বহু মূল্যবান। তুমি আমার বুকের রত্ন।

বেগম সাহেবা বললেন: হুকুম করুন শাহেন শা, এবার আমি যাই।

শাহেন শা বললেন: তুমি একা যাবে না। চল আমিও ফিরব। খুদা হাফেজ সিতারা। তোমার মাধ্যমে তিনি অপ্রয়োজনীয় নরহত্যা বন্ধ করলেন। খুদাতালাকে ধন্যবাদ।

আমি ভয় পেয়েছিলুম। শাহের মেজাজের সঙ্গে আমার বহু দিনের পরিচয়। তাঁর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বললে তিনি ভয়ানক ক্রুদ্ধ হন। আমার ভয় হচ্ছিল, বেগম সাহেবার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে হঠাৎ না জানি শাহ কি কাণ্ড করে বসেন। আল্লার

অসীম করুণা, কোন রকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটেই ব্যাপারটার সুরাহা হল। হতভাগ্য মানুষেরা বাঁচল। যে-সব হতভাগ্য প্রাণ হারিয়েছে, বেহেস্তে তাদের জন্য স্থায়ী আসন হোক।

শাহ সালিমার বাগে ফিরে এলেন। দিল্লীতে নরহত্যা বন্ধ হল। কয়েক প্রহরের মধ্যে দিল্লীতে ত্রিশ হাজার লোক প্রাণ হারিয়েছে। কার্ণালের যুদ্ধেও নিহত সৈন্যসংখ্যা একে অতিক্রম করতে পারেনি। শাহী ওয়াকিনবিসের হিসাব মতে, কার্ণালের যুদ্ধে উভয় পক্ষে কুড়ি হাজারের বেশী মানুষের মৃত্যু হয়নি। কিন্তু কাপুরুষ মহম্মদ শার দুর্বলতার প্রায়শ্চিত্ত করল অসহায় দিল্লীর অধিবাসিরা। হিন্দুস্থানের ইতিহাস মহম্মদ শা'কে ক্ষমা করবেন না।

নরহত্যা বন্ধ হল বটে, কিন্তু লুণ্ঠন চলল। হিন্দুস্থানের রূপ-কথার ঐশ্বর্য শাহকে নিতান্ত প্রলুব্ধ করেছিল। আরো একমাস শাহ দিল্লীতে থাকলেন। কিন্তু হিন্দুস্থানে বাবুর শাহের মত নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। তাই শেষ পর্যন্ত তিনি ফেরার জন্য প্রস্তুত হলেন।

কয়েক শত কোটী মূল্যের মণিমুক্তা ইতিমধ্যে সংগৃহীত হয়েছিল। আমির তৈমূরের আত্মজীবনী আমি পড়েছি। তার হিন্দুস্থান আক্রমণ শেষে প্রত্যেকটা তুর্কী ফৌজ বিশটা করে বান্দা নিয়ে এ-দেশ থেকে ফিরেছিল। আমাদের ফৌজেরা বান্দার জন্যে কেউ আগ্রহ দেখায় নি। কিন্তু প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্যের অংশ পেয়েছিল। হেন ঐশ্বর্য ইরাণে তারা কদাচ কল্পনা করতে পারেনি।

শাহ স্বয়ং ত্রিশ কোটী টাকা বাদশাহী মুদ্রা সংগ্রহ করলেন। এই সকল মুদ্রা মোগল হারেম আর আমিরদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। সাদাত খাঁ বুরহান উল্‌মুল্‌ক—যিনি কার্ণাল থেকে

বিশ কোটী মুদ্রা আদায় করে দেবার প্রতিশ্রুতিতে শাহকে দিল্লীতে এনেছিলেন শাহ তাঁর কাছ থেকে ব্যক্তিগত ভাবে দুই কোটী মুদ্রা দাবি করলেন। না দিলে দৈহিক শাস্তি দেবার ভয় দেখালেন। অপমানের ভয়ে বুরহান উল্‌মুল্‌ক বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী সফদর জঙ্গ দুই কোটী টাকা দিয়ে রেহাই পেল।

সালিমার বাগে মাস খানিক ধরে সংগৃহীত অলংকার, সোনা, রূপা, মূল্যবান আসবাব পত্র, এইসব জড় হল। এক হাজার হাতী, সাত হাজার ঘোড়া, দশ হাজার উট, একশত খোজা এবং একশ ত্রিশ জন কোরাণী, দুইশ কারিগর, একশত রাজমিস্ত্রী এবং দুইশত ছুতারকে লুণ্ঠিত দ্রব্যের সামিল করা হল। এইসব নিয়ে শাহ ইরাণ যাবার উদ্যোগ করলেন।

দিল্লী ত্যাগ করবার পূর্ব দিন শাহ আম-দরবারে সকলকে নিয়ে জড় হলেন। সমস্ত হারেমে একটি জিনিষ খুঁজে পাওয়া যায় নি, —কোহিনূর। ময়ূর সিংহাসনকে পূর্বেই সালিমারবাগে নিয়ে আসা হয়েছিল। কিন্তু তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোহিনূরের সন্ধান মেলেনি। আহম্মদ খাঁকে শেষ পর্যন্ত নজর রাখতে বলেছেন শা, যাতে কোহিনূরের সন্ধান পাওয়া যায়।

দরবারে বসে শাহ হিন্দুস্থান সম্পর্কে যে-ব্যবস্থা করেছেন সেই ব্যবস্থার কথা তিনি সকলকে ঘোষণা করে শোনালেন। তিনি জানালেন, মোগল বাশদাকে সিংহাসনচ্যুত করবার ইচ্ছা তাঁর নেই, কিন্তু তিনি আশা করেন, দুষ্ট লোকের পরামর্শ থেকে মুক্ত হয়ে মহম্মদ শা ভালভাবে দেশ শাসনের চেষ্টা করবেন। নিজাম উল্‌মুল্‌ককে জঘন্য ভাষায় গালাগালি করে তিনি তাকে বাদশাহী সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কোন পদে না রাখবার জন্য মহম্মদ শাকে উপদেশ দিলেন।

মোগল সাম্রাজ্যের আঞ্চলিক ব্যবস্থার পরিবর্তন করে তিনি

যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন দরবারে সে সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বললেন: কাবুল আর মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকবে না। আজ থেকে কাবুল শাহী-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হল। সিন্ধু দরিয়ার পূর্ব তীরের চারিটি জেলার জন্যে পাঞ্জাবের সিপাহশালার আমার সরকারকে বাৎসরিক কুড়ি লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত রাজস্ব পাঠাবে।

দিল্লী-সরকার যদি এ-ব্যবস্থা যথাযথ পালন না করেন, তবে আবার হিন্দুস্থানে বিরাট বাহিনী নিয়ে আসব আমি। আর আমাকে যদি দিল্লী আসতে হয়, তবে দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস, লাল কেল্লা বা দিল্লী সহরের ঘরবাড়ী কিছুই সেদিন আর টিকে থাকবে না।

বাদশা মহম্মদ শা কুর্ণিশ জানিয়ে আমাদের শাহের এ সিদ্ধান্তকে তিনি যে মেনে নিয়েছেন সে-কথা জানিয়ে দিলেন। মোগল ওম্‌রাহেরাও উঠে দাঁড়িয়ে শাহকে কুর্ণিশ জানালেন।

শাহ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দরবার-কক্ষ দেখে নিয়ে আর একটি শেষ আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করলেন। বললেন: আমি শুনতে পেয়েছি মোগল হারেমে বহুমূল্যবান হীরক খণ্ড কোহিনূর আছে। সে হীরক আমার চাইই। আজ সন্ধ্যার মধ্যে সে হীরকখণ্ড সালিমার বাগে আমার কাছে পৌঁছে দিলে আমার ফৌজ আগামী কালই ইরাণে ফিরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হবে। সে কোহিনূর না পাওয়া গেলে আমাদের স্বদেশ যাত্রা বিলম্বিত হতে পারে। তার পরিণাম বাদশা মহম্মদ শা আর দিল্লীর লোকদেরই ভোগ করতে হবে।

বিষণ্ণ মুখে শাহকে কুর্ণিশ জানিয়ে হারেমের খোজা জাবিদ খাঁ উঠে দাঁড়ালেন। আমি লক্ষ্য করে দেখলুম, সে মুখে অমঙ্গল আশঙ্কার এক বিরাট ভীতি।

জাবিদ খাঁ বললেন: মহামান্য শাহ। মোগল হারেম এখন পর্যন্ত আপনারই অধীন। মোগল হারেমের সমস্ত চাবি আপনার

হাতে। কিন্তু সে কোহিনূরের অস্তিত্ব আজ নেই। থাকলে শাহের এ মনোবাঞ্ছা আমরা অপূর্ণ রাখতুম না। কোহিনূরকে ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো করে দেওয়ানী খাস সাজিয়েছি আমরা। সে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরক খণ্ড শাহ স্বয়ং সংগ্রহ করে নিয়েছেন। সুতরাং কোহিনূর শাহের সঙ্গেই আছে। শাহ যদি আর দুই বৎসর পূর্ব হিন্দুস্থানে আসতেন, তা হলে অক্ষত অবস্থায় কোহিনূরকে দেখতে পেতেন। আমরা দুঃখিত, শাহের নয়ন তৃপ্ত করাতে পারিনি।

শাহের পাশেই আজ দরবারের আসনে বাদশা মহম্মদ শা বসেছিলেন। সে-কথা শুনে শাহ মহম্মদ শা'র দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকালেন। খোজা জাবিদ খাঁ সত্য কথা বলেছেন কিনা তাই তিনি জানতে চান। দেখলুম বাদশা অত্যন্ত বিমর্ষ।

মহামূল্যবান হীরকখণ্ড কোহিনূরকে যে মোগল বাদশা আমখাস সাজাবার জন্য ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো করেছেন এ কথা সহজ বিশ্বাস করা যায় না। শাহ বিশ্বাস করলেন বলে মনে হল না। নেকড়ের দৃষ্টি নিয়ে আহম্মদ খাঁ বাদশার দিকে তাকিয়ে ছিল। সে বিশ্বাস করেনি যে মূল্যবান কোহিনূরকে অমন করে নষ্ট করা হয়েছে।

কোহিনূর নিয়ে আবার বিপর্যয় হতে পারে। বহুলোকের প্রাণ যেতে পারে। এই ভয় আমার ছিল। বেগম সাহেবা সিতারা বেগমকে আমি তাই কোহিনূর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলুম। সিতারা বেগম বলেছেন, কোহিনূর বাদশার উষ্ণীষে থাকে। আমি সিংহাসনে দাঁড়িয়ে বাদশা মহম্মদ শার উষ্ণীষ লক্ষ্য করছিলুম। উজ্জ্বল কোন বিশেষ মণি তার উষ্ণীষে নেই। তাহলে সে মণি গেল কোথায়? হারেম তন্ন তন্ন করে খুঁজে তার সন্ধান মেলেনি। হায়রে

মানুষের ঐশ্বর্য-প্রীতি। প্রাণ দেবে তবু ঐশ্বর্য হাত ছাড়া করতে সে রাজী নয়।

আমার মনে হল, আছে, সে কোহিনূর আছে। সম্ভবতঃ উষ্ণীষের ভেতরে লুকিয়ে রেখেছেন মহম্মদ শা। এক টুক্‌রো হীরকের জন্য আবার সহস্র সহস্র লোক দিল্লীতে প্রাণ হারাক আমি চাই না। আমাদের শাহের ক্রোধকে আমি জানি। ক্ষিপ্ত হলে তার কাণ্ডজ্ঞান থাকেনা। এ ব্যাপারের একটা ফয়সালা হয়ে যাওয়াই উচিত। আমি আহম্মদ খাঁকে ডেকে আমার মনের সন্দেহের কথা বললুম।

সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো জ্বলে উঠল আহম্মদ খাঁর। শাহের অনুমতি নিয়ে সে উঠে গিয়ে তাঁর কানে কানে কি পরামর্শ দিয়ে এল। দেখলুম শাহের মুখে হাসি ফুটেছে।

শাহ দরবারের কক্ষকে জানালেন যে, আজকের মত এখানেই দরবার সমাপ্ত হবে। তবে কোহিনূরের জন্য তাঁর দাবি রইল। কিন্তু তাই নিয়ে মোগল বাদশার প্রতি কোনপ্রকার ব্যক্তিগত ঘৃণা তিনি পোষণ করবেন না। বরং মুক্ত কণ্ঠে তিনি স্বীকার করছেন যে, মোগল বাদশার আথিতেয়তায় তিনি মুগ্ধ। হিন্দুস্থান ত্যাগ করবার পূর্বে মোগল বাদশার সঙ্গে তিনি প্রীতি বিনিময় করতে চান।

জাবিদ খাঁর মুখে হাসি ফুটলো। বাদশার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলুম সেখ নেও স্বস্তির চিহ্ন।

শাহ বললেন: মোগল বাদশার প্রতি যে আমি প্রীতি পোষণ করি এবং তিনিও যে আমার প্রতি প্রীতিভাবাপন্ন এ-কথা প্রমাণ করবার জন্য আমি বাদশা মহম্মদ শার সঙ্গে আমার শিরস্ত্রাণ বদল করছি।

নিজের শিরস্ত্রাণ তিনি মহম্মদ শার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। তাকিয়ে দেখলুম, বাদশা মহম্মদ শার মুখ রক্তশূন্য ছাইয়ের মত হয়ে

গেছে। জাবিদ খাঁর মুখ মড়া মানুষের মত। বুঝলুম, সমস্যার সমাধান হয়েছে। শাহকে আর হিন্দুস্থানে কোহিনূরের অপেক্ষায় বসে থাকতে হবে না।

নির্জীব দুটো হাতে মহম্মদ শা নিজের উষ্ণীষ খুলে দিলেন আমাদের শাহের হাতে। শাহ নিজের উষ্ণীষ তুলে দিলেন মহম্মদ শার হাতে। দরবার ভাঙল।

বুঝলুম, কোহিনূরের জ্যোতি মোগল দরবার থেকে চির দিনের জন্য নিভে গেল।

এই কোহিনূর হিন্দুস্থানে প্রবেশ করেই মোগলেরা পেয়েছিলেন। হুমায়ুনের উপর সন্তুষ্ট হয়ে রাজা বিক্রমজিৎ এটা উপহার দিয়েছিলেন হুমায়ুনকে। হুমায়ুন দিয়েছিলেন বাবুর শাকে। বাবুর শা'র মতে সমস্ত দুনিয়ার অর্ধদিনের যত ব্যয়, ঐ পাথরের মূল্য তত। কিন্তু বাবুর শার কোন অর্থলোভ ছিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন হুমায়ুনকে এই মূল্যবান পাথরটি। ঐশ্বর্যের প্রতি উদাসীনতার জন্য মধ্য এশিয়ার লোকেরা আজো তাঁকে "কলনদরি" বা ভিখারী দরবেশ বলে ডাকে।

কোন ফাঁকে এই কোহিনূর হারিয়ে গিয়েছিল গোলকুণ্ডাতে। সেখান থেকে মিরজুমলা এটাকে সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন বাদশা শাজাহানকে। সেই থেকে এ পাথর বাদশার দরবার আলো করেছিল। আজ থেকে সে আলো নিভে গেল। মোগল বাদশার উষ্ণীষে আর কোন দিন কোহিনূর জ্বলবে না।

শিবিরে ফিরে উষ্ণীষের ভেতর থেকে কোহিনূর বের করে শাহ উচ্চৈস্বরে হা হা হা হা করে হেসে উঠলেন। আহম্মদকে ডেকে বললেন: আহম্মদ, তুমি কি করে বুঝেছিলে যে, মহম্মদ শার

উষ্ণীষের মধ্যে এই অমূল্য রত্ন লুকিয়ে আছে? তুমি এ খবর কোথায় পেলে?

আহম্মদ বলল: এ খবর আগা দিয়েছে আমাকে।

শাহ আমাকে তলব করলেন। বললেন: আগা তোমার প্রখর বুদ্ধিতে আমি সন্তুষ্ট। এই বহুমূল্য রত্নের সন্ধান দেবার জন্যে তোমায় আমি পুরস্কৃত করব।

আমি বললুম: শাহেন শা, এ প্রশংসা আমার প্রাপ্য নয়।

আশ্চর্য হয়ে শাহ তাকালেন আমার মুখের দিকে: তবে কার?

বললুম: হজরত সিতারা বেগমের।

—সিতারা! সেকি তোমাকেও বলেছিল?

বললুম: আজ্ঞে জাহাপনা। কিন্তু মনে হচ্ছে আপনিও এ-কথা জানতেন?

শাহ হাসলেন। বললেন: জানতুম।

—আপনি কি করে জেনেছিলেন জাঁহাপনা?

—তুমি যার কাছ থেকে জেনেছিলে আমিও তার কাছ থেকেই জেনেছিলুম। গতরাত্রে আমি সিতারা বেগমকে মোগল হারেম থেকে লুণ্ঠিত সামগ্রীর মধ্য থেকে আপন ইচ্ছামত কোন একটি রত্ন বেছে নিতে বলেছিলুম। কিন্তু দুঃখ করে জানিয়েছিলুম, সিতারার উপযুক্ত রত্ন একমাত্র কোহিনূর ছাড়া আর কিছু নেই। অথচ দুর্ভাগ্য কোহিনূর পাওয়া যায়নি। আমার উদ্দেশ্য ছিল সিতারার কাছ থেকে কোহিনূরের সন্ধান জেনে নেওয়া। কিন্তু ঐশ্বর্যের প্রতি সিতারার বিন্দুমাত্র লোভ লক্ষ্য করলুম না। সুতরাং ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করলুম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল সিতারা কোহিনূরের সংবাদ জানে।

আমি বললুম: সিতারা, তোমায় একটি প্রশ্ন করব?

অবাক দুটো চোখ তুলে সিতারা আমার দিকে তাকিয়েছিল:

হুকুম করুন শাহেন শা।

—তুমি কি আমাকে ভালবাস?

থর থর করে কেঁপে উঠেছিল সিতারা: এ প্রশ্ন কেন শাহেন শা? আপনার কি আমার প্রতি সন্দেহ হচ্ছে?

আমি তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললুম: না।

—তবে?

—ভালবাসার জন্য মানুষ সব কিছু পরিত্যাগ করতে পারে এ-কথা তুমি জান?

—জামি।

—তুমি আমার জন্য কি ত্যাগ করতে পার?

সিতারা বলেছিল: আমার জীবন পরিত্যাগ করতে পারি শাহেন শা।

বলেছিলুম: জীবন চাইনা। তুমি জীবন হারালে আমি বাঁচবনা সিতারা। তুমি আমায় একটি সংবাদ দাও।

সে বলেছিল: হুকুম করুন শাহেন শা।

বলেছিলুম: আমার বিশ্বাস কোহিনূরের সংবাদ তুমি জান। বল সে মণি কোথায় আছে?

সিতারা বলেছিল: শাহেন শা, মহম্মদ শা একবার দুর্বলতা বশে বিপদের দিনে কোথায় কোহিনূর লুকিয়ে রাখবার নির্দেশ আছে, আমায় বলেছিলেন। কিন্তু আমাকে দিয়ে ঈশ্বরের নামে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন যে, আমি যেন কদাচ এ-কথা কাউকে না বলি। কিন্তু শাহেন শা—আপনার অপেক্ষা প্রিয়তম বস্তু আমার আর কিছু নেই। আপনার জন্য আমি ঈশ্বরের নামে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিও ভঙ্গ করতে পারি। মহম্মদ শার উষ্ণীষের নিচে সেই কোহিনূর লুকায়িত আছে।

আগা না বললেও আমি মহম্মদ শার সঙ্গে উষ্ণীষ বিনিময় করতুম।

শাহেন শা বললেন : যাও আগা, বেগমকে সংবাদ দাও। তার উপর আমি খুবই সন্তুষ্ট হয়েছি। লুণ্ঠিত দ্রব্য থেকে মনের মত যে-কোন একটি রত্ন সে বেছে নিতে পারে।

শুনে আমি হাসলুম।

শাহের সামনে এমন করে আমি কখনো হাসিনি।

শাহ বললেন : একি আগা, তুমি হাসছ?

বললুম : শাহেন শা, গোলামের গোস্তাকী নেবেন না। হাসলুম এই মনে করে যে, আপনি ইতর রত্ন দিয়ে রত্নশ্রেষ্ঠা যে নারী, তাঁকে পুরস্কৃত করতে চান—এই সিদ্ধান্তের কথা শুনে।

শাহ অবাক হয়ে তাকালেন আমার দিকে : মানে?

বললুম : শাহেন শা, আপনি আত্মবিস্মৃত হয়ে এ-কয়দিন শুধু লুণ্ঠনই করেছেন, লুণ্ঠিত সামগ্রির মূল্য যাচাই করবার অবকাশ পাননি। যাচাই করলে দেখবেন, কোহিনূরের চাইতেও মূল্যবান রত্ন আপনি আহরণ করেছেন। রত্ন দিয়ে তাঁকে পুরস্কৃত করা চলে না?

শাহ বললেন : তুমি সিতারা বেগমের কথা বলছ?

আজ্ঞে শাহেন শা। হেন মূল্যবান রমণী ইতিপূর্বে আমার নজরে পড়েনি। যিনি আপন স্বার্থ চান না, পরের কল্যাণ চিন্তা করেন, যিনি প্রিয়তম ব্যক্তির ঐশ্বর্যের চাইতে শুধুমাত্র প্রিয়তমকেই ভালবাসেন, হেন রমণী-রত্ন মাণিক্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জানবেন।

আমি এই কোহিনূরের একটি ছোট্ট কাহিনী বলছি শুনুন। বাবুর বাদশার জ্যেষ্ঠ এবং প্রিয়তম পুত্র হুমায়ূন একদা মরণাপন্ন অসুস্থ হয়ে পড়েন। রোগ আর সারে না। কে একজন বললেন বাদশার প্রিয়তম জিনিসটিকে যদি পুত্রের প্রাণের বিনিময়ে তিনি ত্যাগ করতে পারেন, তবে পুত্রের জীবন রক্ষা পেতে পারে।

বাদশার সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম জিনিষ কি? সকলে ভাবতে লাগল।

অবশেষে একজন আমির বললেন : —কোহিনূরের চাইতে

বড় মূল্যবান জিনিষ আর কিছু হতে পারে না। বাদশা কোহিনূর ত্যাগ করুন।

বাবুর বাদশার কিন্তু সে কথা মনঃপূত হল না, তিনি বললেন: সর্বাপেক্ষা প্রিয় জিনিষ কোহিনূর হতে পারে না। প্রাণই মানুষের কাছে তার প্রিয়তম জিনিষ। সুতরাং পুত্রের জন্য আমি প্রাণ উৎসর্গ করছি। বাদশা আল্লার কাছে পুত্রের প্রাণের বিনিময়ে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করলেন।

সেই থেকেই হুমায়ুন ধীরে ধীরে ভাল হয়ে উঠতে লাগলেন, আর বাবুর বাদশা অসুস্থ হয়ে পড়তে লাগলেন।

তাই বলছিলুম, মণিরত্ন দিয়ে বেগম সাহেবাকে পুরস্কৃত করা চলে না।

শাহ খুস্ মেজাজে ছিলেন আজ। সুতরাং আমার ঔদ্ধত্যকেও তিনি ক্ষমার দৃষ্টিতে গ্রহণ করলেন। বললেন: আগা, তুমি সত্যি বলেছ। মণি দিয়ে প্রেমের বিচার চলেনা। সিতারা বেগমকে আমার অফুরন্ত ভালবাসা জানাও।

পরদিন ভোরবেলা, সালিমারবাগ থেকে আমাদের শিবির উঠল। হিন্দুস্থানের সমস্ত প্রান্তরটাই হাতীর পিঠে পার হবেন শাহী বেগমেরা। স্বয়ং শাহও হাতীর পিঠে যাবেন। আমিও চাপলুম একটি হাতীর পিঠে, সিতারা বেগমের পাশাপাশি আমাকে চলতে হবে। বেগম সাহেবার যাতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা না হয় সে দেখবার ভার শাহ আমাকে দিয়েছেন।

সালিমারবাগ থেকে বেরিয়ে আমাদের ফৌজেরা চলল পাঞ্জাবের দিকে। সেই লাহোর হয়ে আবার খাইবার গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে বরফাবৃত আফগান পাহাড়ের উপর দিয়ে আমাদের চলতে হবে।

আমাদের দৃষ্টি সামনে, ইরাণে, ইরাণের দ্রাক্ষাকুঞ্জ, বুলবুল মিথুন উদার নীল আকাশ আর ইস্‌পাহানের প্রাসাদে।

কিন্তু সিতারা বেগমের? একটি মাত্র প্রলুব্ধ ইশারায় তিনি পরিচিত থেকে অপরিচিত দেশের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাচ্ছেন। সামনে অন্ধকার। পেছনে যন্ত্রণা। তবু এই দেশের মাটিতেই তো সে পা রেখে দাঁড়িয়ে ছিল!

ধীরে ধীরে দিল্লীর জুমা মসজিদের চূড়া, হুমায়ুনের সমাধির গম্বুজ, কুতব মিনারের শীর্ষ, লালকেল্লার শ্বেতমর্মর খচিত হর্ম্য প্রাসাদ, সব আমাদের দৃষ্টির সামনে থেকে দূরে চলে যেতে লাগল। মাতৃভূমি মায়েরই মত, যত দুঃখই সে দিক না কেন। দেখলুম—বেগম সাহেবা সিতারা বেগম অপসৃয়মান লালকেল্লার দিকে তাকিয়ে আছেন। ঐখানে তার মর্যাদা ধূলায় লুণ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু ঐখানেই তিনি তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা মধুর স্বপ্ন নিয়ে বেড়ে উঠেছেন। মাতৃভূমি রাজপুতনার রুক্ষ মাটীর সেই উদাসীন আহ্বানও মনে পড়ে। কিন্তু সে অনেক দূরে। এই মাটী হারিয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ, আরো হারাবে, শেষে দৃষ্টির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

লালকেল্লার শেষ হর্ম্যচূড়াটি আমাদের দৃষ্টির কাছ থেকে হারিয়ে গেল। দেখলুম, মুক্তা-বিন্দুর মত কয়েক ফোটা অশ্রু সিতারা বেগমের চোখের কোণে ফুটে উঠেছে।

॥ পাঁচ ॥

আমার কাহিনীর শেষ অধ্যায়ে প্রবেশ করছি আমি। চলেছি ইরাণে। মানুষের জীবন তার পরিকল্পনা অনুযায়ী চলে না। হাসি-কান্নাতে পরিণত হয়, কান্না হাসির প্রস্রবণে ঝরে পড়ে। সঙ্গতি-অসঙ্গতির বীভৎসরূপে আত্মপ্রকাশ করে, পেয়ে মানুষ রাখতে পারে না, আবার না পেয়েও কেউ পূর্ণ থাকে।

সিরাজাই বেগম আপন স্বার্থ সিদ্ধ করবার জন্যে হারেমে থাকতে চেয়েছিল, কিন্তু তাকে যেতে হল হিন্দুস্থানে। লালকেল্লা লুণ্ঠনে নিজে সে ব্যক্তিগত ভাবে অংশ গ্রহণ করবে, এই ছিল তার সাধ, কিন্তু কার্ণালের প্রান্তরে তার সে স্বপ্ন ধূলায় মিলিয়ে গেল। যে বাঁদী ছিল মোগল হারেমে, সম্রাজ্ঞি হয়ে সে ফিরছে ইস্পাহানে। খাদিজা সুলতান ভালবেসেছিল আলিকুলিকে, কিন্তু সে বন্দী হল নাদিরের হারেমে, তার প্রেম কখনো মূল্য পাবে না। মানুষের স্বপ্ন আর পাওনার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান।

হিন্দুস্থানে আমাদের শাহ এসেছিলেন মোগল বাদশাকে হুঁসিয়ার করে দিতে। কার্ণালের প্রান্তরে দুই কোটি মুদ্রা পেয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন তিনি। ভাগ্য চক্রে তিনি এলেন দিল্লীতে, ত্রিশ কোটী নগদ স্বর্ণমুদ্রার সঙ্গে তিনি নিয়ে চলেছেন অসংখ্য সোনা, রূপা, মণিমুক্তা, হীরা জহরৎ, বান্দা, বাঁদী, হাতী, ঘোড়া, সব। স্বয়ং শা নিয়ে চলেছেন তুলনাহীন এক নারী-রত্ন। এ-সব কে জানতো। ভবিষ্যৎ আমাদের চোখের দৃষ্টির বাইরে।

সারাটা পথ চলতে চলতে নিয়তির এই অদ্ভুত রহস্যময়তার

কথা আমি ভাবছি। আমি ভাবছি, আর শঙ্কিত হচ্ছি এই ভেবে যে, যদি ভবিষ্যৎ আমাদের আপন পরিকল্পনা অনুযায়ী না চলে ?

সিতারা বেগমের সঙ্গে দেখা হবার পর সিরাজাই বেগমের সঙ্গে আর আমার মোলাকাৎ হয়নি। শাহেন শার নির্দেশে আমি নয়া বেগমের তদারকিতেই আছি। আমার সমস্ত শ্রদ্ধা যেমন নয়া বেগমকে কেন্দ্র করে সুখের স্বস্তি-কক্ষ তৈরী করছে, তেমনি আমার বিরাট কৌতূহল ঘুরে মরছে সিরাজাই বেগমের মনের চার পাশে।

শাহ যা নিয়ে যাচ্ছেন, তা শান্তি। আমি যা আশা করছি তা স্বস্তি। কিন্তু আমি নিশ্চিন্ত জানি, এ-সব কিছুর চূড়ান্ত অস্তিত্ব আজো নির্ভর করছে একটি মাত্র লোকের উপর—সে সিরাজাই বেগম। আজ শাহ তাঁর হাতের মুঠোর বাইরে চলে গেলেও সিরাজাই বেগম, সুন্দর মাছের চার তৈরী করতে পারেন। কখন কোন টোপে শাহ আটকাবেন কে জানে।

সিতারা বেগম নদী, শাহকে স্বাভাবিক ভাবে ধরে রেখেছেন। মাছকে ধরে রাখবার জন্য নদীর কোন প্রয়াস নেই। নদী জানে, জলের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা তাকে ধরে রাখবেই। খুব রং বেরং-এর আকর্ষণ সৃষ্টি করতে হয় না তাকে। তবু কি মাছ জলে থাকে ? কেউ কেউ রঙিন টোপ দেখে গিলে ফেলে জল ছেড়ে উপরে উঠে। উঠলে মৃত্যু জানা কথা, তবু টোপ গেলে। সিতারার স্বচ্ছ প্রেম-স্রোতধারায় শাহ আজ মাছেরই মত খেলে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু কাল যদি ভুল করে টোপ গিলে গেলেন ?

হাতীর পিঠে থেকেই আমি সিরাজাই বেগমের খোঁজ করছিলুম। কার্ণালের যুদ্ধের পর তাঁর সঙ্গে আর আমার সাক্ষাৎ হয়নি। অথচ তাকে দেখা বা জানা আমার প্রয়োজন। একদিন চলতে চলতে তার হাতীটা আমাদের হাতীর পাশাপাশি এসে গিয়েছিল। আমি তাকে দেখতে পেলুম। আমার আগের হাতীটার দিকে তিনি

ইস্পাতের ফলার মত চোখ নিয়ে তাকিয়ে দেখলেন। এই কঠিন দৃষ্টি শাহের হারেমে সফাভিদ বেগমদের অন্ধ করবার সময় তার চোখে দেখেছিলুম আমি।

সিতারা বেগমের হাতীর দিকে তাকিয়ে 'থুথু' করে থুথু ছিটালেন তিনি।

সিরাজাই বেগমের অন্তরের যন্ত্রণাটা বুঝতে পারছি আমি। ভালবাসার বেদনা তার মধ্যে নেই। ক্ষমতা হারিয়ে তিনি উন্মাদ। অথচ ভালবাসাই জীবনে যার একমাত্র কাম্য, সে আজ অসীম ক্ষমতার অধিশ্বরী, কিন্তু ক্ষমতা প্রয়োগ করবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা তাঁর মধ্যে নেই।

আমরা পাঞ্জাব ছাড়ালুম। হিন্দুস্থানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ দিয়ে হাটলুম, খাইবার গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করলুম। দেখলুম আফগানিস্থানের পাহাড়ে পাহাড়ে বরফের চাদর বিছানো।

শেষ পর্যন্ত এলুম কান্দাহারে। পাহাড় তখন শ্বেতশুভ্র আকৃতি ধারণ করেছে।

পথে পথে যেখানেই আমাদের তাবু পড়েছে, শাহ ঢালাও অনুমতি দিয়েছেন আনন্দ উৎসব করবার জন্যে। হিন্দুস্থান থেকে অফুরন্ত ঐশ্বর্য নিয়ে চলেছি আমরা।

শাহের চোখে নিষ্ঠুরতার কাঠিন্য ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। নারীর অভাব শাহের জীবনে কোনদিন ছিল না, কিন্তু প্রেমের অভাব ছিল। সেই প্রণয়িণীর সন্ধান পেয়েছন তিনি। চোখের দৃষ্টিতে তার মানুষের প্রতি বিশ্বাস ফুটে উঠছে।

একদিন শাহ আমাকে বললেন: আগা, আমার মধ্যে সেই দুর্ধর্ষ আবেগটা আমি যেন আর খুঁজে পাচ্ছি না। অশান্তির ঘুর্ণীঝড়

তুলবার কল্পনাতেই আমি এতদিন আনন্দ পেতুম। আজ সে ইচ্ছাটা আমার মধ্য থেকে কমে যাচ্ছে। কেন, বলতো ?

বললুম : শাহেন শা, সূর্যের আলোতে উত্তাপ অনুভব করা যায়, চন্দ্রের আলোতে স্নিগ্ধ লাগে। পরিবেশের প্রভাব মানুষের জীবনের উপর অত্যন্ত প্রবল। আপনি এতদিন সব পেয়েছেন, কিন্তু ভালবাসা পাননি। সেই ভালবাসার সান্নিধ্যে এসে আপনার দৃষ্টি পাল্টে যাচ্ছে শাহেন না।

শাহ বললেন : তুমি ঠিকই ধরেছ আগা। সিতারাকে আমি যত দেখছি, তত আমার পরিবর্তন হচ্ছে। তুমি আর-একদিন বলেছিলে, কোহিনূরের চাইতে মূল্যবান রত্ন আমি পেয়েছি। সে কথা বিশ্বাস করি। ভাবছি, বাদশা মহম্মদ শা'র কথা। কোহিনূর হারিয়ে তিনি ম্রিয়মান হয়েছেন, কিন্তু আসল রত্নের মূল্য যাচাই করতে পারেন নি। হতভাগ্য বাদশা !

বললুম : যথার্থ পুরুষই নারীর মূল্য দিতে পারেন। মহম্মদ শা পুরুষ দেহধারী হীন নিবীর্য মানুষ। নারীরত্নের মূল্য তিনি দেবেন কোত্থেকে ? কোহিনূর হারিয়ে মোগল দরবারের আলো নিভেছে। সিতারা বেগমকে হারিয়ে হারেমের শোভাও চিরকালের মত বিদায় নিল।

শাহ বললেন : তুমি সত্য বলেছ আগা। সিতারা শুধুমাত্র নারী নয়, সে সৌভাগ্যের প্রতীক। সে যার কাছে থাকবে, তার ভাগ্য প্রসন্ন হবে। কিন্তু আমার ভয়, আমি তার মূল্য দিতে না পেরে কখনো বা ভুল করি।

বললুম : শাহেন শা, আপনার সন্দেহ স্বাভাবিক। কিন্তু এর উৎস দুর্বল নয়। আপনি বেগম সাহেবাকে সত্যিকারের ভালবাসেন। তাই পাছে তাঁকে হারান, এই ভয় আপনার মনে দেখা দিয়েছে।

শাহ বললেন : তোমার অনুমান সত্যি, আগা। আমি সত্যি

সিতারাকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসে ফেলেছি। আমার ইচ্ছা করে, তাকে তৃপ্ত করি, তুষ্ট করি। কিন্তু সে যে আমার কাছে কোন দ্রব্যই প্রার্থনা করে না আগা ?

বললুম: শাহেন শা, সামান্য মূল্যের জিনিস বেগম সাহেবা চান না। তিনি চান অনেক বেশী মূল্যের জিনিষ।

শাহ বললেন: বল আগা, কি সে চায় ? সর্বাপেক্ষা মূল্যবান জিনিষ কোহিনূর আমি তাকে দিচ্ছি।

আমি হেসে বললুম: শাহেন শা। আপনি হয়তো ভুলে গেছেন সেদিন দ্রব্যমূল্যের উপর আমি আপনাকে কি বলেছিলুম। তবে জানবেন, কোহিনূরের কোন মূল্য সিতারা বেগমের কাছে নেই। তিনি তার চাইতেও বড় জিনিস চান।

—কি সে জিনিস ? শাহী হারেমে যদি সে-রকম মূল্যবান কোন জিনিস থাকে, আমি অকাতরে তাকে দান করব।

বললুম: শাহেন শা, ঐশ্বর্য-ভাণ্ডারে সে জিনিস লুকিয়ে রাখবার নয়। তাকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না।

অধৈর্য শাহ বললেন: সে কি ?

—সে ভালবাসা, শাহেন শা। সে আপনার প্রেম।

শাহের মুখে একটা সৌম্য আনন্দের আলোক লক্ষ্য করলুম।

তিনি বললেন: সে প্রেমতো আমি তাকে দিয়েছি। সে কি তৃপ্ত নয় ?

বললুম: তিনি পরিপূর্ণ তৃপ্ত শাহেন শা। আমার এ-কথা বলার অর্থ এই যে, তিনি আপনার ভালবাসা ছাড়া অন্য কিছুর প্রত্যাশী নন, এইটুকু জানবেন।

কান্দাহারে এসে কয়েকদিনের জন্য আমাদের শিবির পড়ল। শাহ কান্দাহারে বসে দেশের অভ্যন্তরের খবরটা কয়েকদিন ভাল করে নিলেন। এতদিন পর্যন্ত তিনি উৎফুল্লই ছিলেন। তাঁর স্বপ্ন

ছিল—গৃহে ফিরে পুত্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি আনন্দ ভোগ করবেন।

রেজা খাঁ, সিংহাসনের ভাবি উত্তরাধিকারী। রেজা খাঁ তাঁর নিজেরই পুত্র। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরের সংবাদ শুনে তিনি মর্মাহত হলেন। রেজা খাঁ শাহকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে তেমন ব্যবস্থা করেন নি। বরং বিরাট একজন আমিরকে তিনি হাত করেছেন। দীর্ঘদিন শাহের অনুপস্থিতিতে তার মনে হয়তো একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়েছে।

শাহকে অত্যন্ত বিমর্ষ ও ক্লান্ত দেখালো।

সিতারা বেগম শাহের এই বিষণ্ণ ক্লান্তি লক্ষ্য করে নিতান্ত ব্যথিত হলেন। কিন্তু নিজের মনের এই বিরাট অশান্তির কথা শাহ সিতারা বেগমকে জানতে দেননি।

উদ্‌বিগ্ন বেগম সাহেবা আমাকে তলব করে পাঠালেন: আগা, কান্দাহারে এসে শাহকে দেখছি, মনের সেই সহজ ভাব তাঁর আর নেই। শাহের কি হয়েছে, তুমি জান আগা?

শাহের এই পরিবর্তন আমিও লক্ষ্য করেছিলুম। কিন্তু শাহ আমাকেও কিছু জানাননি। চিন্তা করছিলুম আমিও। কিন্তু বেগম সাহেবাকে বিন্দুমাত্র উত্যক্ত করবার ইচ্ছা আমার ছিল না। বললুম: রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব যাদের হাতে, তাদের অনেক ভাবনা, বেগম সাহেবা। হঠাৎ কখনো তাঁরা চিন্তাক্লিষ্ট হতেই পারেন। এ নিয়ে আপনি মনের শান্তি নষ্ট করবেন না।

বেগম সাহেবা বললেন: শাহের মুখে চিন্তার ছায়া থাকলে, আমি কি করে নিশ্চিন্ত হব, বল আগা?

বুঝলুম—'শাহেন শা'র বেগম' হিসাবে আজো নিজেকে কল্পনা করছেন না সিতারা বেগম। তিনি নিজেকে একজন পুরুষ সিংহের দয়িতা হিসাবেই কল্পনা করছেন।

আমি বেগম সাহেবাকে আশ্বাস দিলুম যে, শাহের চিন্তার কারণ জানবার জন্য আমি সর্বপ্রকার চেষ্টা করব।

সত্যই শা অতিরিক্ত পরিমাণে চিন্তিত হয়েছিলেন। নিতান্ত নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির নিকট তিনি মনের বাসনা প্রকাশ করবার কথা ভাবছিলেন বোধ হয়। শিবিরে একদিন তাকে একাকী পেয়ে বললুম: শাহেন শা, যদি গোস্তাকী না নেন তো একটি কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে।

শাহ আমার দিকে তাকালেন। বললেন: বল আগা।

বললুম: আপনাকে চিন্তার ভারে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। কি এমন চিন্তা যা আপনার শান্তিকে অপহরণ করতে উদ্যত হয়েছে?

শাহ বললেন: আগা, তোমায় সে-কথা বলা চলে। গুপ্তচর পাঠিয়ে আমি সংবাদ পেয়েছি, রেজা আমার প্রত্যাবর্তনে সন্তুষ্ট নয়। দুদিন রাজদণ্ড পরিচালনা করে তার মনে ক্ষমতার মোহ জন্মেছে।

আমি চিন্তা করলুম। যুবরাজ রেজাকে আমি চিনি। সে বীর এবং সাহসী, কিন্তু ধীরস্থির। পিতার বিরুদ্ধে তার এই হঠকারিতার কথা সহজে আমার বিশ্বাস হল না। তবে কি কোন ষড়যন্ত্র চলেছে?

সিতারা বেগমকে প্রধানা-বেগম হিসাবে হারেমে স্থান দেবার জন্য অনেকেই অসন্তুষ্ট! সিরাজাই বেগমতো ফুঁসছে।

সিরাজাই বেগমের ভ্রাতা আলি আকবর ভগ্নীর মারফৎ শাহের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। হঠাৎ ধূমকেতুর মত সিতারার আবির্ভাবে তিনি সন্তুষ্ট নন। যুবরাজ রেজার সঙ্গে কি তাদের কোন যোগাযোগ হয়েছে।

সিরাজাই বেগমের শিবিরে মাঝে মাঝেই ভ্রাতা ভগ্নিতে সলাপরামর্শ হচ্ছে এটা আমি দেখেছি। তবে কি···? একদিন কাবুল থেকে ইস্পাহানের দিকে দুজন ঘোড়সওয়ার গিয়েছিল। তবে কি···?

শাহকে বললুম : শাহেন শা, রাজনীতিতে সাবধানতা প্রয়োজন। পুত্র বিশ্বাসহন্তা বা বিদ্রোহী হতে পারে বই কি ? হিন্দুস্থানে আকবর বাদশার পুত্র শাজাদা সেলিম বিদ্রোহ করেছিল। জাহাঙ্গীরের পুত্র শাজাদা খুররম দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহ করেছিল। শাজাহানের পুত্র আরংজেব পিতাকে আগ্রাদুর্গে বন্দী করেছিল। সুতরাং পুত্র হলেও এ ব্যাপারে সাবধানতা প্রয়োজন। অন্য কোন দিকও থাকতে পারে। শাহকে সেই দিকে নজর রাখতে অনুরোধ করছি।

শাহ বললেন : অন্য কি প্রকার সন্দেহ করছ তুমি ?

বললুম : শাহেন শা, শত্রু অন্তঃপুরেই বেশী থাকে। সেই দিকে নজর দেবেন।

শাহ কিছু বললেন না, গম্ভীর ভাবে কিছুকাল একটু ভাবলেন।

সিরাজাই বেগমকে শাহ নাদির কুলি সিতারা বেগমের কাছ থেকে দূরে রেখেছিলেন। কিন্তু সে জন্য অনতিক্রম্য ব্যবধানের সৃষ্টি হয়নি। ইচ্ছে থাকলে সিরাজাই বেগম যে-কোন মুহূর্তে এসে নতুন বেগম সাহেবার সঙ্গে দেখা করতে পারতেন। কিন্তু হিন্দুস্থানে থাকাকালিন একদিনের জন্যও সিরাজাই সে অভিলাস ব্যক্ত করেননি। আকস্মিক ভাগ্য বিপর্যয়ে তিনি নিজের সাধারণ বুদ্ধিটুকুও হারিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু হতাশার কাছে নিজেকে বিসর্জন দেবার পাত্রী সিরাজাই বেগম নন। আমি জানতুম তিনি ফাঁক খুঁজবেন।

কাবুল পর্যন্ত সিতারা বেগমের উপর সিরাজাইয়ের উষ্মা ছিল। প্রচণ্ড আক্রোশ ছিল। নিজের স্বাভাবিকতার ঊর্ধে তিনি উঠতে পারেন নি। কিন্তু কাবুল থেকে কান্দাহারের মধ্যে তার দৃষ্টিভঙ্গীর যেন এক বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করছি।

হঠাৎ কান্দাহারে সিরাজাই বেগম একদিন এলেন সিতারার

শিবিরে। আমি শিবিরের মুখে বসেছিলুম। বেগম সাহেবাকে দেখে ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ জানালুম।

আমার দিকে তাকিয়ে তিনি একটু হাসলেন। সিরাজাইয়ের চরিত্রের সঙ্গে যারা পরিচিত নয় সে হাসির অর্থ তারা ধরতে পারবেনা। আমি তৎক্ষণাৎ সে হাসির অর্থ বুঝলুম। আমার অন্তরাত্মা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে কেঁপে উঠল।

আমি হুকুমের দাস। শাহ আমাকে যেখানে হুকুম করবেন থাকতে হবে। তবু আমি জানতুম, সিরাজাই বেগমের তীব্র বিদ্রূপ একদিন আমাকে সহ্য করতে হবেই।

আমি ভেতরের দিকে কান পেতে শুনলুম সিরাজাই বেগম কি বলেন। তিনি ভেতরে গিয়েই কিছুটা যেন বিদ্রূপ ভরে সিতারা বেগমকে সেলাম জানালেন।

নিষ্কলঙ্ক সিতারা বেগমের সঙ্গে শাহতো সিরাজাই বেগমের পরিচয় করিয়ে দেননি। তিনি কি করে তাকে চিনবেন। উঠে দাঁড়িয়ে সিতারা বেগম সিরাজাই বেগম-এর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন।

মোগল হারেমের কয়েকজন বাঁদী আছে সিতারা বেগমের সঙ্গে কিছু সংখ্যক শাহী হারেমের জেনানা। এর বাইরে শাহের শিবিরে গুরুত্বপূর্ণ অন্য কোন রমণীর পরিচয় শাহ তাঁকে দেননি। দেননি, কিছুটা ইচ্ছে করে, কিছুটা সিতারা বেগমের প্রেমে আত্মহারা হয়ে করণীয় কর্তব্য ভুলে।

সিরাজাই বেগম বললেন: বেগম সাহেবা, আমাকে আপনি চিনতে পারবেন না। আপনার খোজা আগাকে ডাকুন, সে পরিচয় দেবে।

সে কথা শুনে তৎক্ষণাৎ আমি শিবিরের ভেতর প্রবেশ করে উভয় বেগমকে সালাম জানালুম। বেগম সাহেবা সিতারা বেগমকে

বললুম: বেগম সাহেবা, ইনি আমাদের শাহেন শার অন্যতমা প্রিয়তমা বেগম সিরাজাই বেগম।

বিদ্রূপ করলেন বুঝি সিরাজাই। বললেন: "বহিন, আমি তোমার সতীন। শত্রুও বলতে পার। আমার স্বামীকে তুমি নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে পুরেছ। আমি এখন অপাংক্তেয়।" এমন ভাবে হাসতে হাসতে কথা কয়টি বললেন সিরাজাই বেগম যে, হাল্কা একটা রসিকতার মত শোনাল কথা কয়টি।

বুঝলুম সিতারা বেগম তার বিদ্রূপ ধরতে পারলেন না। তৎক্ষণাৎ এগিয়ে গিয়ে হাত ধরে সিরাজাই বেগমকে এনে তিনি পালঙ্কে বসালেন। তারপর বললেন: বহিন, আমার বেআদবি হলে কসুর করবেন। শাহ আমাকে আপনার কথা কোনদিন বলেননি। জানলে তক্‌লিব করে আপনাকে এ বাঁদীর শিবিরে আসতে হত না।

হাসতে হাসতেই একটা তীব্র কটাক্ষ করলেন সিরাজাই বেগম: বাঁদী একদিন ছিলে বটে, আজতো নও। কি বল?

সিতারা বেগম বললেন: বাঁদী বই কি বহিন। আপনি আমার বয়োজ্যেষ্ঠা, শাহের কাছে আমি যেমন বাঁদী, আপনার কাছেও আমি তেমন বাঁদীই।

চোখদুটো বাঁকা করে সিরাজাই বেগম তাকালেন আমার দিকে: —আগা, তোমার নয়া বেগম সাহেবা দেখি ভাল ভাল কথা জানেন?' বলেই ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। সিতারা বেগমের চিবুকে হাত রাখলেন। আবার বললেন: যা বল, তা বল, মুখখানি কিন্তু অপূর্ব। তবু শাহের এ ভারি অন্যায়। তাঁর বেগম হলেও, আমার বহিন্ বটেতো, একদিন আমার কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল না?

সিতারা বেগম বললেন: বহিন্! এতদিন আমি আপনার কথা শুনিনি। শাহ যদি পূর্বেই আমাকে জানাতেন, আমি

নিশ্চয় আপনার হুকুম তামিল করতে আপনার শিবিরে যেতুম। আমার অজ্ঞাত বেআদপি মাপ করুন বহিন।

চিবুক স্পর্শ করে সিতারা বেগমকে সামান্য চুম্বন করলেন সিরাজাই বেগম: বললেন, ছি ছি! তুমি আমার ছোট বহিন। তোমার কোন ত্রুটি ধরা কি শোভা পায়? তোমাকে দেখে আজ আমার ভারি ভাল লাগল বহিন।

সিতারা বেগম বললেন: আপনি যদি আগেই আমাকে জানাতেন, কত ভাল হত। সারাটা পথ প্রকৃত পক্ষে নিঃসঙ্গ এসেছি। আপনার পাশাপাশি কত আনন্দ করে আসা যেত।

সিরাজাই বেগম বললেন: যেদিন চলে গেছে, সেদিন নিয়ে দুঃখ করে লাভ নেই। এখনতো আমাদের দেখা হল, এবার পাশাপাশি চলতে পারব, কি বল?

সিতারা বেগম যেন আহ্লাদে গদগদ হয়ে বললেন: নিশ্চয়ই বহিন!

সিরাজাই বেগম চলে গেলেন। যাবার আগে আমার দিকে আর একবার সেই দুষ্ট চাহনিতে তাকালেন: আগা! আমাকে দেখে চিনতে পেরেছিলে?

বললুম: বেগম সাহেবা, আমি মালিকানদের হুকুমের বান্দা। শাহের হুকুমে এতকাল আপনার খিদমত করেছি। বেগম সাহেবাদের আমি কখনো ভুলতে পারি?

সিরাজাই বেগম সেকথার কোন উত্তর না দিয়ে চলে গেলেন।

আমি গম্ভীর হয়ে ভাবতে লাগলুম। নিশ্চয়ই কোথাও মেঘ করেছে, ঝড় উঠবে। নইলে এমন বিদ্যুতের চমক কেন? সিরাজাই বেগম কি পরিকল্পনা করেছেন? আল্লা সিতারা বেগমকে রক্ষা করুন।

সিরাজাই বেগম চলে গেলে বেগম সাহেবা সিতারা বেগম

আমাকে বললেন : আগা, এই বেগম সাহেবা ভারি সুন্দর, না ? এতদিন এঁর কথা আমাকে বলনি কেন ?

আমি ছোট্ট করে বললুম : আজ্ঞে বেগম সাহেবা।

ভাবলুম, সিতারা বেগমের নিষ্পাপ মনে বিষ ঢুকিয়ে লাভ নেই। আমাকেই সজাগ থাকতে হবে।

কান্দাহারের পথে যখন হিন্দুস্থানের দিকে বেরিয়েছিলাম তখন প্রচণ্ড শীত ছিল। ফিরবার পথে তত শীত আর নেই। বরফ কিছু কিছু গলতে আরম্ভ করেছে। গাছে গাছে নতুন পাতার আভাস। আমাদের শিবিরের সামনে বরফ গলে গিয়ে সবুজ ঘাসের ইঙ্গিত দেখা দিয়েছে। শাহ এইখানে প্রত্যেকদিন বিকেলবেলা একটা আসন বিছিয়ে বসছেন। কিছু দূরেই একটা টিলা। কিছু সংখ্যক গাছ সেখানে জড়াজড়ি করে আছে। তারা এখনো শীতের সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

বেগম সাহেবা সিতারা বেগমকে নিয়ে শাহ সেদিন সেই নবাঙ্কুর ময়দানে বসেছিলেন। সূর্যের দীপ্তি কমতে কমতে প্রায় অনস্তিত্বের পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে, হঠাৎ এমন সময় কয়েকটি নিক্ষিপ্ত তীর এসে শাহের আসনে আঘাত করল।

বেগম সাহেবা তা দেখে বিদ্যুৎবেগে নিজের আসন থেকে লাফিয়ে উঠে শাহকে নিজের বুকের মধ্যে আড়াল করে দাঁড়ালেন। চিৎকার করে আমাকে ডাকলেন : আগা, আগা, এদিকে এস।

আমি দেখেছিলুন। তাই সঙ্গে সঙ্গে একটি ঢাল নিয়ে শিবির থেকে লাফিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালুম। শাহের সামনে ঢালের আড়াল দিয়ে, বাইরে সেই টিলার দিকে তাকালুম। দূর থেকে কোন প্রাণীর অস্তিত্ব সেখানে লক্ষ্য করা যায় না।

সেই মুহূর্তে শাহ আহম্মদ খাঁকে তলব করে পাঠালেন। সংবাদ পেয়ে আলি আকবরও এলেন। ছুটে এলেন সিরাজাই বেগমও।

তার দৃষ্টি দেখলুম শাহের চাইতেও সিতারা বেগমের দিকে বেশী। আলি আকবর আহমদকে শাহের কাছে থাকতে বলে নিজেই এগিয়ে গেলেন সেই টিলার দিকে।

আমার খুব ভাল লাগল না। মনে হল বাইরের শত্রুর কাজ এটা নয়। নিক্ষিপ্ত তীরের লক্ষ্য হয়তো শাহ্ ছিলেন না—ছিলেন সিতারা বেগম। আমি সিরাজাই বেগমের চোখের দিকে তাকালুম, ইস্পাতের মত সেই কঠিন দৃষ্টি সেখানে আছে কিনা দেখবার চেষ্টা করলুম।

সিরাজাই বেগমের কাছে যা কখনো আশা করিনি, তিনি তাই করলেন। সিতারা বেগমকে বুকে জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রশংসা করতে লাগলেন—বহিন কি বলে তোমার প্রশংসা করব। তুমি না থাকলে আমাদের শাহের জীবন রক্ষা পেত না। তোমার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

কি ইচ্ছা আছে সিরাজাই বেগমের মনে কে জানে। তাকে কি সহজে বিশ্বাস করা যেতে পারে? কিন্তু আমি খোজা, শাহের হুকুমে বেগম মহলে প্রহরীর কাজ করা ব্যতীত আমার আর কিছু করবার নেই। আমার কোন মন্তব্য নেই। আমার মন্তব্য প্রকাশের অধিকার থাকলে বলতুম: আলি আকবরকে আততায়ীর সন্ধানে পাঠানো উচিত হয়নি।

শাহ্ সেদিন সিতারা বেগমকে শিবিরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী সোহাগ জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন: সিতারা তুমি আমাকে ভালবাসো জানি, কিন্তু নিজের জীবনের অপেক্ষাও ভালবাসো জানতুম না। আজ তুমি আমার জীবন রক্ষা করেছ, বল তোমার জন্যে আমি কি করতে পারি?

আমি জানতুম, বেগম সাহেবার জবাব কি হবে। তিনি বললেন: শাহেন শা, আপনার চেয়ে প্রিয়তম জিনিষ আমার কাছে আর কি

থাকতে পারে। সামান্য একজন বাঁদীকে আপনি ধর্মসাক্ষী করে বেগমের মর্যাদা দিয়েছেন। তারো চেয়ে বড়—আপনি আমাকে ভালবাসা দিয়েছেন। জীবনের অপেক্ষাও 'প্রিয়তম' প্রিয়তর নয় কি? আপনার জীবনের চাইতে আর বড় প্রাপ্য আমার কি আছে শাহেন শা? আপনি মূল্য দিতে চেয়ে আমাকে কেন ব্যথা দিচ্ছেন।

বোধ হয় আবেগে সিতারা বেগমের চোখে অশ্রু দেখা দিয়েছিল।

শাহ বেগম সাহেবাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন: সিতারা তোমার মত রমণীরত্ন ইতিপূর্বে আমার চোখে পড়েনি। নিজেকে আমি দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা সুখী ব্যক্তি বলে মনে করছি। তোমার কিছু চাইবার নেই। কিন্তু আমি আজ তোমাকে একটি বিশেষ রত্ন উপহার দিচ্ছি। আমার মনে হচ্ছে, ইস্পাহানে ফিরে স্থির হয়ে বসে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। রাজ্যে বিদ্রোহের আভাস পাচ্ছি। কিন্তু আমি যেখানেই থাকি না কেন, প্রয়োজনে এই রত্নটির সাহায্যে তুমি আমার নিকট পৌছুতে পারবে। এই রত্নটি তুমি তোমার কাছে রাখ।

আমি জানতুম শাহের উষ্ণীষের মধ্যে কয়টি রত্ন লুকায়িত আছে। কোহিনূরের মত তার মূল্য তত বেশী না হলেও কতকগুলি ইঙ্গিতময় গুরুত্ব আছে। অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ব্যক্তি ব্যতীত কাউকে এই রত্ন দেওয়া হয়না। সিরাজাই বেগম পান নি, সিতারা বেগম পেলেন।

যে সহজ মূল্যে শাহকে ক্রয় করা যেত সে মূল্য সিরাজাই বেগমের হাতে নেই। রূপের আকর্ষণ আর যৌন আবেদনে মানুষকে চিরদিন আবদ্ধ রাখা যায় না। সহজ সরল এক টুকরো প্রেম অসাধ্য সাধন করতে পারে। যাকে সহজে পেতে পারতেন, তাকে কসরৎ করে পেতে চাইছেন সিরাজাই বেগম—জানিনা পরিণতি কি হবে।

কান্দাহার থেকে হিরাত গিয়ে আমাদের শিবির পড়ল। শাহ

সংবাদ পেলেন পুত্র রেজা তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে আসছেন। কিন্তু সে সংবাদে তিনি উল্লসিত হলেন না। তিনি সংবাদ পেয়েছেন, রেজা নিজের হাতে ক্ষমতা পেয়ে স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য চেষ্টা করেছে, আমিরদের হাত করেছে। কিন্তু কেন?

'কেন'? এ প্রশ্নের উত্তর শাহ যেমন খুঁজে পাচ্ছেন না, আমিও পাচ্ছি না। মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষার পশ্চাতে 'কেন'র কোন অবসর নেই। হিন্দুস্থানের ইতিহাস তারিখ-ই-ফিরুজশাহী নিয়ে এসেছি আমার সঙ্গে। পড়ছি হিন্দুস্থানের সুলতানদের ইতিহাস। তুগলক বংশের জুনা নিজের পিতা গিয়াসুদ্দিন তুগলককে হত্যা করে সিংহাসনে বসেছিলেন। কেন? তিনি তো জানতেন পিতার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী তিনিই। তবে? না, পাছে গিয়াসুদ্দিন আর এক পুত্র মামুদকে সিংহাসন দেন এই ভয়ে তিনি পিতাকে হত্যা করেছিলেন?

আমাদের শাহের ক্ষেত্রে রেজা ছাড়া সে-রকম যোগ্য পুত্র কই? তবু তাঁর এই চিন্তা কেন?

শুনছি বাইরে একটি প্রচার ছোট ছোট করে হাওয়ায় বেশ ছড়িয়ে পড়ছে। সে প্রচার এই যে, শাহ তার সিংহাসনের উত্তরাধিকার সিতারা বেগমের ঔরষে তাঁর যদি কোন পুত্র জন্ম গ্রহণ করে, তবে তাকেই দেবেন বলে স্থির করেছেন। কিন্তু শাহ তো ঘুণাক্ষরেও কখনো এমন অভিমত প্রকাশ করেন নি! তবে? সেদিন কাবুল থেকে ইরাণের দিকে দুটি অশ্বারোহী বার্তাবহ ছুটে গিয়েছিল। তারা কি এই সংবাদই বহন করে নিয়ে গিয়েছিল!

হিরাতে আমাদের শিবির পড়েছে। কিন্তু রেজা এখনো এসে পৌঁছোয়নি। রেজা এসে পৌঁছোয়নি বটে তবে নিত্য সংবাদ আসছে শাহের কাছে রেজার দুরভিসন্ধি সম্পর্কে। সংবাদ আনছে আলি আকবরের গুপ্তচরেরা। সংবাদের সবটাই সত্য কি? কোন

উদ্দেশ্যে কি এর পেছনে কাজ করছে? যদি করেই থাকে, তবে কি স্বার্থ তারা সিদ্ধ করতে চায়?

দুর্ভাগ্য শাহের, দুর্ভাগ্য আমাদের, রেজা ভুল করল। ভুল করল বলব না, ফাঁদে পড়ল। আলি আকবর শাহকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন—রেজা এলে যেন এই প্রশ্ন করা হয়, স্বাধীনভাবে এতদিন রাজ্যশাসন করবার পর ক্ষমতা ত্যাগ করতে তোমার দুঃখ হচ্ছে না রেজা। এতদিন তুমি নিজে হুকুম চালিয়েছ এবার হুকুম শুনতে হবে। কেমন লাগছে না? রেজার উত্তর যদি শাহকে সন্তুষ্ট করতে পারে তবে ধরতে হবে যা শোনা গিয়েছে সব ভুল। কিন্তু যদি উত্তর মনোমত না হয়?

রেজা যখন শাহের সঙ্গে ভেট করতে এল, দেখলুম, কেমন বিমর্ষ, চিন্তাক্লিষ্ট সে! কেন? সত্যি কি তাঁর মনে কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে? রেজা আসবার পূর্বদিন বাইরে জোর গুঞ্জরণ শুনলুম, শাহ পুত্রের উপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ। কে ছড়ালো এই গুজব? উভয় তরফেই কি ভ্রান্ত সংবাদ ছড়ানো হচ্ছে এমনি করে? যার কোন অস্তিত্ব নেই। গুজবের উপর ভিত্তি করে কি পিতা পুত্রের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হল?

রেজা দরবারে ঢুকতেই শাহ লৌকিক ভাবে তার সামান্য কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। রেজাও পিতার কুশল কামনা করল। আমি লক্ষ্য করে দেখলুম, উভয় ক্ষেত্রে আন্তরিকতার অভাব।

হঠাৎ শাহ প্রশ্ন করলেন: রেজা দীর্ঘদিন ক্ষমতা পরিচালনা করে পিতার হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে তোমার মনোকষ্ট হচ্ছে না?

হঠাৎ যেন চমকে উঠল রেজা। একটা ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে পিতার দিকে তাকিয়ে থাকল, কিন্তু কোন জবাব দিল না।

শাহ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে তাকিয়ে দেখে বললেন: তুমি এবার যেতে পার।

মুহূর্তমধ্যে শাহ দরবার ভেঙ্গে দিয়ে নিজের শিবিরে ঢুকে পড়লেন। আমি দেখলুম, দূরে দাঁড়িয়ে সিরাজাই বেগম রেজাকে তাকিয়ে দেখছেন। তাকে তিনি নিজের শিবিরে ডেকে নিয়ে গেলেন।

নারী চরিত্র দুর্জ্ঞেয়। সিরাজাই কি খেলা খেলবেন কে জানে! তাঁর লক্ষ্য কে? রেজা না সিতারা? না দুজনকেই সে ঘায়েল করতে চায়? আজ তার হাতে ক্ষমতা নেই। থাকলে সে সিতারাকে নিশ্চিত অন্ধ করে দিয়ে তার মুখে কালসিট দাগ ধরিয়ে দিত। বলপ্রয়োগ করা অসম্ভব জেনে সে কি বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করেছে?

শাহ নিজের শিবিরে গিয়ে চুপ করে বসে থাকলেন। সন্ধ্যায় সবুজ ময়দানে এ-কয়দিন যেমন সিতারা বেগমকে নিয়ে তিনি বসতেন, তেমন বসলেন না। বুঝলুম, কৃষ্ণ মেঘ শাহের মনের উপর গাঢ় হয়ে জমা হচ্ছে। সন্দেহ বড় বিষম বস্তু, একবার মনকে আশ্রয় করে বসতে পেলে সহজে তাকে বিতাড়িত করা যায় না। আমি শাহকে চিনি, যদি তিনি ক্ষুব্ধ হন, আত্ম-পর বিচার করবার ক্ষমতা তাঁর থাকে না। আল্লা জানেন কি ঘটবে!

সন্ধ্যাবেলা সিতারা বেগমের সঙ্গে ভেট করতে এলেন রেজা। ভেট করবার অধিকার তার আছে। গর্ভধারিণী না হলেও আজ সিতারা বেগম তার আম্মাজান। আমিই তাকে বেগম সাহেবার শিবিরে নিয়ে গেলুম। রেজা বেগম সাহেবাকে কুর্নিশ করে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। পর পুরুষকে জেনানা শিবিরে এ-পর্যন্ত সিতারা বেগম প্রবেশ করতে দেখেননি। তিনি নিজের ওড়নাতে মুখ লুকালেন।

আমি বললুম: বেগম সাহেবা, শাহজাদাকে আপনার লজ্জার কিছু নেই। ইনি আমাদের শাহেন শার জ্যেষ্ঠ পুত্র রেজা খাঁ। হিরাতে ইনি পিতাকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছেন।

বেগম সাহেবা ওড়নার আড়াল থেকে নিজের মুখে বের করলেন। দেখলুম, প্রশান্ত স্নেহ-দৃষ্টি মেলে তিনি রেজার দিকে তাকিয়েছেন। রেজার কুশল জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

রেজা গভীর মনোযোগের সঙ্গে বেগম সাহেবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

সেই মুহূর্তে কি ভেবেছিলেন তিনি কে জানে। ভেবেছিলেন কি, তার সৌভাগ্যের পথে উত্তরাধিকার কেড়ে নিতে ভাবি প্রতিবন্ধক আসতে পারে এখান থেকেই? কিংবা অতুলনীয় একটা সুন্দর মুখ দেখে তিনি বিমুগ্ধ হয়েছিলেন? রেজা কোন কথা বলতে পারলেন না। যেমনি এসেছিলেন তেমনি কুর্নিশ জানিয়ে শিবির ত্যাগ করলেন।

রেজা হঠাৎ নির্বাক হয়ে গেছেন কেন হিরাতে এসে? তাকে এত নির্বাক তো আমি কখনো দেখিনি। সিতারা বেগমের শিবিরে তিনি নিজের বুদ্ধিতেই সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন কি? না এর পেছনে কোন হাত আছে?

রেজা ঘোড়ায় চাপলেন।

বেগম সাহেবা বললেন: আগা, রেজাতো আমার সঙ্গে কোন কথা বলল না। সে কি তার নতুন আম্মাজানকে দেখে সন্তুষ্ট হয়নি?

বললুম: শাহজাদা হয়তো বেগম সাহেবার সঙ্গে কি কথা বলবেন ভেবে না পেয়ে নির্বাক হয়েছিলেন। হয়তো সঙ্কোচ বোধ করছিলেন।

সিতারা বেগম বললেন: আমি আম্মাজান, আমাকে আবার সঙ্কোচ কি?

আমি বললুম: বেগম সাহেবা, শাহজাদা বড় হয়েছেন। সঙ্কোচ তার স্বাভাবিক। ধীরে ধীরে এ সঙ্কোচ কাটবে।

বেগম সাহেবা বললেন: কিছু কি বলতে এসেছিল রেজা?

বললুম: মনে হয়না বেগম সাহেবা। নতুন আম্মাজানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা প্রয়োজন, তাই সে এসেছিল। অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয়না।

সিতারা বেগম দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললেন: কি জানি, হয়তো সে আমাকে পছন্দ করতে পারেনি।

আমি বললুম: বেগম সাহেবা, অমন কোন কল্পনা করে নিজের মনকে ক্ষত বিক্ষত করবেন না। আপনাকে দুনিয়ায় কেউ অপছন্দ করতে পারে না।

আপন মনে শাহ সেদিন নিজের শিবিরে বসে অনেক কিছু চিন্তা করেছিলেন। তারপর একটু গভীর রাত্রে এসেছিলেন সিতারা বেগমের শিবিরে।

সেদিনের সেই আক্রমণের পর থেকে শাহের উপর আমাদের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। শিবিরের চতুর্দিকে আহমদ আবদালির প্রহরীরা পাথরের মূর্তির মত এক একজন দাঁড়িয়ে ছিল। শাহ এলে আমি তাঁকে কুর্নিশ জানিয়ে আরো সতর্ক ভাবে দুয়ারে দাঁড়ালুম। শাহ চিন্তামগ্ন ভাবে বেগম সাহেবার পালঙ্কের দিকে এগিয়ে গেলেন।

আমি লক্ষ্য করে দেখলুম—বেগম সাহেবা হাত ধরে তাঁকে নিজের পালঙ্কে নিয়ে গিয়ে বসালেন।

নিত্য যেমন মধুর সম্ভাষণে বেগম সাহেবাকে নিজের বুকের কাছে টেনে নেন শাহ, আজ তেমন নিলেন না।

আজ নৈশ অভিসারের প্রেমাবেগ হয়তো বেগম সাহেবার মধ্যেও ছিল না। পুত্র সন্দর্শনে আজ হয়তো তার মধ্যে নতুন চিন্তার স্রোত বইছিল। তিনি পুত্রের দর্শন লাভ করেছেন, এ সংবাদ শাহকে দেখার জন্যে হয়তো অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন।

শাহ পালঙ্ক গ্রহণ করতেই তিনি বললেন : শাহেন শা, আজ আমি পুত্র দর্শন লাভ করেছি, আমার নয়ন সার্থক।

দুর্বোধ্য একটা দৃষ্টি মেলে শাহ তাকালেন সিতারার দিকে।

— পুত্র!

—হ্যাঁ শাহেন শা, আপনার পুত্র রেজা!

—সে এখানে এসেছিল কেন?

আশ্চর্য হয়ে সিতারা বেগম বললেন : বা! পুত্র তার আম্মাজানের সঙ্গে দেখা করবে না!

শাহ শুধু একটা অস্ফুট শব্দ করলেন : ওহ্!

সিতারা বেগম বললেন : শাহেন শা, আজ পুত্রের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হয়েছে। কিন্তু তবু আপনাকে বিমর্ষ দেখছি কেন?

শাহ কোন উত্তর করলেন না।

সিতারা বেগম আবার বললেন : আপনি সৌভাগ্যবান শাহেন শা। এ-হেন একজন শাহজাদা সমস্ত মোগল শাহজাদাদের মধ্যেও একজনকে খুঁজে পাওয়া যাবে না—দীর্ঘ, সুন্দর, বলিষ্ঠ-যৌবন। এ পুত্র আপনারই মত শাহেন শা।

দেখলুম, শাহের ভ্রূ-দুটি কুঞ্চিত হল। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সিতারা বেগমের মুখের দিকে তাকালেন। আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। বুঝলুম, বেগম সাহেবা ভুল করছেন। শাহের মনের খবর তিনি জানেন না। মনে হল চেঁচিয়ে বলি, বেগম সাহেবা, এ প্রসঙ্গ আপনি ত্যাগ করুন।

শাহেন শা বেশ অস্থির বোঝা যায়। তিনি পালঙ্ক ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

সিতারা করুণভাবে শাহের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন :

—শাহেন শা, আমি কি কোন ত্রুটি করেছি?

শাহ বললেন : না সিতারা, আমি আজ ক্লান্ত। তুমি বিশ্রাম কর, আমি যাচ্ছি।

শাহ শিবির থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। দেখলুম বিমর্ষ দৃষ্টিতে বেগম সাহেবা শাহের পথের দিকে তখনো তাকিয়ে আছেন। বেগম সাহেবা বসলেন না, দাঁড়িয়েই থাকলেন। দুটো পাথরের চোখের মত স্থির দৃষ্টিতে তিনি যেন কি এক কল্পিত চিত্র দেখতে লাগলেন।

কিছুকাল পরে আমি এগিয়ে গিয়ে বেগম সাহেবাকে ডাকলুম : —বেগম সাহেবা।

—কে, আগা?

—হ্যাঁ বেগম সাহেবা, অনেক রাত্রি হয়েছে আপনি বিশ্রাম করুন।

বেগম সাহেবা বললেন : আগা, শাহ কি আমার উপর ক্ষুব্ধ হয়েছেন?

আমার মনে হল শাহের মনের সন্দেহের কথাটা বেগম সাহেবাকে জানিয়ে দিয়ে তাঁকে সাবধান করে দিই। কিন্তু ঘটনার গতি আরো একটু লক্ষ্য না করে কিছু বলতে ইচ্ছে হল না আমার। বললুম :

—হয়তো শাহের তবিয়ৎ ভাল নেই। এ-নিয়ে আপনি মন খারাপ করবেন না।

কৃষ্ণ মেঘ আকাশে থেকে সরল না।

আমরা সেই অবস্থাতেই হিরাত থেকে ইস্পাহানের দিকে রওনা হওয়া ঠিক করলুম। যাবার আগের দিন এক মজার ঘটনা ঘটল। আমাদের মহম্মদ ইয়ার খাঁ শাহের বদমেজাজে বিরক্ত হয়ে ঠিক করেছিলেন, তিনি আর ইরাণে ফিরবেন না। তিনি হিন্দুস্থানেই থেকে গিয়েছিলেন। হঠাৎ ইস্পাহান রওনা হবার আগের দিন

তিনি আমাদের শিবিরে এসে উপস্থিত। শাহের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি হিন্দুস্থানে থেকে গিয়েছিলেন। তিনি আর কখনো শাহী দরবারে ফিরে আসবেন আমরা এ ধারণা করিনি। দরবারে শাহকে কুর্ণিশ করে দাঁড়াতেই শাহ বললেন : একি ! মহম্মদ ইয়ার খাঁ তুমি ?

ইয়ার খাঁ বলল : শাহেন শা, আপনার দরবারে ফিরে এলুম।

শাহ বললেন : কিন্তু তুমি না আমার ভয়ঙ্কর মেজাজকে ভয় কর ? তবু ফিরে এলে ?

ইয়ার খাঁ বললেন : একদল কাপুরুষের মধ্যে নিরাপদে থাকার চাইতে শাহেনশার হাতে মৃত্যুও শতগুণে শ্রেয়ঃ। তাই হিন্দুস্থান ছেড়ে চলে এলুম খোদাবন্দ।

শাহ জিজ্ঞেস করলেন : দিল্লীর খবর বল ?

ইয়ার খাঁ বললেন : দিল্লীর খবর দেবার মত কিছু নেই শাহেন শা। আবার সেই ইরাণী-তুরাণী বিরোধ বেঁধেছে। আবার দরবারে বাঈজী নাচতে আরম্ভ করেছে। এর বেশী আর কোন সংবাদ নেই হিন্দুস্থানের তবে সংবাদ হল এই, দাক্ষিণাত্য থেকে কাফের মারাঠাগুলো আপনি চলে আসবার পরই আবার নেকড়ের মত লাফিয়ে নেমেছে উত্তর ভারতে।

শাহ বললেন : মোগল বাদশাদের ক্ষমতা নেই ঐ পাহাড়ী ইঁদুরগুলোকে দমন করে। সময় পেলে আবার হিন্দুস্থানে গিয়ে কাফেরগুলোকে শায়েস্তা করব।

হিরাত ছেড়ে পরদিন ইস্পাহানের দিকে রওনা হলুম। সেদিনের সেই ঘটনার পর শাহের মন আর ভাল হয়নি। পুত্রের উপর থেকে কিছুতেই মনের ঘৃণাটাকে সরিয়ে নিতে পাচ্ছেন না তিনি। সিতারা বেগমের প্রতি সেই প্রেমের আবেগটা যেন পূর্বের মত তেমন আর

নেই। অবশ্য তিনি তাকে অবজ্ঞাও করছেন না। কিন্তু অবজ্ঞা না করলে কি হয়, এটা সিতারা বেগমের কাছে উপেক্ষার সামিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। নিঃসঙ্গ একাকিত্বের বেদনা নিয়ে সিতারা বেগমকে মাঝে মাঝে আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে শুনি। হিন্দুস্থানের পরিচিত মৃত্তিকা ছেড়ে শুধু একটিমাত্র প্রেমের বর্তিকা লক্ষ্য করেই না সে দূরে পাড়ি জমিয়েছে? যদি সে বর্তিকা নিভে যায়?

রাজা বাদশার প্রেম ক্ষণভঙ্গুর। বুদ্বুদের মত কত প্রেম ফুলে উঠে মিলিয়ে যেতে দেখেছি আমি। কিন্তু তাদের জন্য তত দুঃখ হয়নি আমার। সিতারা বেগম তো তাদের সকলের চাইতে ভিন্ন। নিঃস্বার্থ প্রেমের এত বড় আত্মদান আমার নজরে পড়েনি। এ-প্রেমের মূল্যও কি স্বার্থ দিয়ে বাঁধা সেই ক্ষণস্থায়ী প্রেমেরই মত হবে?

সিরাজাই বেগমের আনাগোনা অনেক বেড়েছে সিতারা বেগমের শিবিরে। সেই ফাঁকে শাহের সঙ্গেও নিভৃতে তার না হোক দু-একবার সাক্ষাৎ হচ্ছেই। সিরাজাই বেগমের এই ঘনঘন যাতায়াতের কারণ নাকি একটি সরল সাদাসিধে কোমলমতি বালিকাকে সান্নিধ্য দেওয়া। এ সম্পর্কে আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে বিদ্রূপ করতেও ইতস্ততঃ করেন নি তিনি। বলেছেন, রত্ন কুড়াতে জান, তার যত্ন জাননা তোমরা আগা। যে রত্নের মূল্য দিতে জাননা, সে রত্ন কুড়িয়ে এনেছ কেন?

এ প্রশ্ন সিরাজাই বেগম আমাকে করেছিলেন সিতারা বেগমের সামনেই। আমি অনেক বুঝি। তবু সত্যি বলছি, সিরাজাই বেগমের অনেক চাল আমার কাছেও অত্যন্ত দুর্বোধ্য।

সিতারা বেগমকে নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে সোহাগ করে চিবুক ধরে আদর করতে করতে সিরাজাই বেগম একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন: —আগা, ব্যাপার কি? দিনে দিনে আমার বহিনের মুখ শুকিয়ে উঠছে। শাহ কি আমার বহিনকে তেমন যত্ন করছেন না, নিত্য আসছেন না?

সন্দেহ হল আমার। একি সত্যই একটি নিষ্পাপ সরল প্রাণের জন্য সমবেদনা, না কোন গোপন তথ্য অন্বেষণ? আমি কোন উত্তর দিলুম না। শুধু বোকার মত তার দিকে তাকিয়ে হাসলুম। সিরাজাই বেগম বললেন: এ অন্যায় আর যেই সহ্য করুক আমি করব না। শাহকে আমি বলব।

এত বেশী আগ্রহ সহজ মনে গ্রহণ করতে আমার বাধছিল। কিন্তু আমি কি করতে পারি? আমি সিতারা বেগমের ওয়াজিরও নই, ওয়াকিয়ানবিশও নই। আমি শুধু মাত্র তার হারেমের প্রহরী খোজা। যদি তার জীবনের উপর কোন দৈহিক আঘাত আসে তা রুখবার জন্য আমি আছি। কিন্তু যদি কোন ষড়যন্ত্রের অদৃশ্য হাত তার দিকে কেউ বাড়ায় তবে আমি কি করতে পারি?

কিন্তু আমার তবু কেন যেন ভয় করতে লাগল। একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় আমি মাঝে মাঝেই দুশ্চিন্তা বোধ করতে লাগলুম।

শাহের মনের মধ্যে কোন একটা সন্দেহের খেলা নিশ্চয়ই চলছিল। আমি নিজেও তার সে দুশ্চিন্তার পরিচয় বাইরে থেকে বুঝতে পারিনি। আমার ধারণা ছিল পুত্রের উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য তিনি চিন্তিত তাই একটা গোপন ঈর্ষা দানা বেঁধে উঠছে। কিন্তু সেদিন সে ঈর্ষার জটিলতা লক্ষ্য করে আমি শিউরে উঠলুম। নিশ্চিত জানলুম—শাহের এই মানসিক জটিলতার পেছনে একটা সক্রিয় হাত কাজ করে চলেছে।

শাহ আমাকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে বললেন: আগা, তোমাকে অত্যন্ত গোপনে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই। সত্য উত্তর দেবে।

বললুম: শাহেন শা, আপনার জন্যই আমি হারেমের প্রহরী। আপনার কাছে আমি সত্য গোপন করব কেন?

শাহ জিজ্ঞাসা করলেন: রেজা সিতারা বেগমের সঙ্গে কয়দিন দেখা করেছে সত্য করে বল।

আমার মুখ শুকিয়ে গেল। হৃদয় কাঁপতে লাগল। বিপর্যয় এতখানি এগিয়ে এসেছে আমি কল্পনাও করতে পারিনি। বললুম: শাহেন শা, খুদাতালা সাক্ষী, আমি আপনার বান্দা, আপনার নিমক খাই। আপনার গোপন অন্তঃপুরের প্রহরী আমি। আমার কথা আপনি বিশ্বাস করুন, কোন মিথ্যা সংবাদে আপনি বিভ্রান্ত হবেন না। শাহজাদা রেজা একদিন বই তার আম্মাজানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন নি।

আমার কথা শুনে শাহ যেন একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। একটা মিথ্যা সন্দেহ তার বুক্‌কে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল বুঝলুম।

তা লক্ষ্য করে আমি বললুম: শাহেন শা, সিতারা বেগম সম্পর্কে আপনি মনের মধ্যে কিছুমাত্র সন্দেহ পোষণ করবেন না। এই বিশ্বসংসারে আর সমস্ত কিছু ভুলে সে আপনার স্বপ্নে ডুবে আছে। আপনার উপেক্ষায় তার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। আমি তাকে শুধু কাঁদতে দেখছি। শাহেন শা, মনের সমস্ত জড়তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বেগম সাহেবাকে পূর্বের মত করে আপনি গ্রহণ করুন, দেখবেন আপনার সব মানসিক অবসাদ দূর হয়ে যাবে।

শাহ বললেন: হ্যাঁ আগা, আমি তাই করব। আর যাই হোক সিতারাকে আমি অবিশ্বাস করবো না। এমন নির্মল হৃদয়ের সাক্ষাৎ আমি পূর্বে পাই নি। কিন্তু কিছু কিছু কথা শুনে আমার মন বড় বিক্ষিপ্ত আছে। শুনেছি, রেজা নাকি সিতারা সম্পর্কে কুৎসিৎ ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। সে নাকি বলেছে অমন একখণ্ড অনবদ্য যৌবন প্রৌঢ়ের কোলে শোভা পায় না। সে নাকি……' বলতে বলতে দেখলাম ক্রোধে শাহের সমস্ত দেহ থর থর করে কম্পিত হচ্ছে। রক্ত বর্ণ চোখের গোলক দুটি ঘুরছে। নিজের মৃত্যুর গুজবের

কথা শুনে দিল্লীর সালিমার বাগে তাঁকে এমন ভাবে উত্তেজিত হতে দেখেছিলুম।

তাঁর এই অহেতুক ক্রোধকে প্রশমিত করা প্রয়োজন বোধ করলুম। বললুম: শাহেন শা, আপনি বিচারক, আপনি শাসক। গুজবে কর্ণপাত করবার পূর্বে আপনার উচিত-- সত্য সন্ধান করা।

শাহ বললেন: হ্যাঁ, সেইজন্য আমি অপেক্ষা করছি। নইলে পুত্র হলেও রেজার আমি প্রাণদণ্ড দিতুম।

শাহ যে এইটুকু বিচার করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তাতেই আমি যথেষ্ট স্বস্তি বোধ করলুম। শাহকে আর কিছু বললুম না।

শাহের কাছ থেকে ফিরে এলুম সিতারা বেগমের কাছে। শিবিরে ঢুকতেই ভিতরে কার কণ্ঠস্বর শুনলুম। কান পেতে বুঝলুম সিরাজাই বেগম। তিনি সতারা বেগমকে বলছেন: বহিন, তোমার কাছে একটি আর্জি নিয়ে এসেছি।

সিতারা বললেন: হুকুম করুন বহিনজী। আমার সাধ্য হলে আপনার হুকুম নিশ্চয়ই তামিল করব।

আবেগ জড়িত কণ্ঠে সিরাজাই বেগম বললেন: বহিন, আমার ব্যক্তিগত কোন প্রয়োজন হলে আমি তোমার কাছে আসতুম না। এসেছি আ[illegible]ার [illegible] স[illegible]েই।

সিতারা বেগম বললেন: বলুন বহিনজী।

সিরাজাই বললেন: শাহজাদা রেজা আমাদের গর্ভের সন্তান না হলেও সন্তান তো বটে! শাহ অকারণে তার উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন। শুনেছি, তার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণার কথা ভাবছেন তিনি। কিন্তু কে তাকে বোঝাবে বল? একমাত্র তোমাকে ছাড়া আর কাউকে শাহ তেমন পেয়ার করেন না। একমাত্র তুমিই তার জীবন রক্ষা করতে পার বহিন। একটা নিষ্পাপ সন্তানকে তুমি শাহের আক্রোশ থেকে

বাঁচাও। তুমি তাকে দেখনি। কিন্তু ছেলেবেলা থেকে আমরা তাকে দেখে আসছি। অমন একটা মধুর স্বভাবের শাহজাদা হয় না। অথচ ভাগ্যের কি পরিহাস···! বহিন্, তুমি কি একটা নিষ্পাপ জীবন রক্ষা করবে না ?

সিতারা বেগমকে বলতে শুনলুম: বহিনজী, জানি না শাহ আমাকে আগের মত পেয়ার করেন কি না কিন্তু আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, শাহজাদার জন্য শাহকে আমি বোঝাবার আপ্রাণ চেষ্টা করব।

সিরাজাই যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। বললেন: বহিন তোমার ভাল হোক। খুদাতালার কাছে আর্জি রাখি তোমার মঙ্গল হোক।

সিরাজাই বেগম বাইরে এলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে কুর্ণিশ জানালুম। সেই ফাঁকে তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করলুম, তাঁর চোখে সত্যি কোন অশ্রুর ইঙ্গিত আছে কিনা। শাহের সন্দেহের সঙ্গে সিরাজাই বেগমের এই সমবেদনার কোন যোগাযোগ থাকতে পারে না কি? ভাবলুম সিতারা বেগমকে বুঝিয়ে বলি, 'বেগম সাহেবা, অহেতুক কোন দায়িত্ব গ্রহণ করবেন না।'

কিন্তু সে-কথা বলবার আমি সুযোগ পেলুম না। দেখলাম শাহ স্বয়ং আসছেন সিতারা বেগমের কাছে।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে কুর্ণিশ করে শাহকে ভেতরে যাবার পথ করে দিলুম। শাহের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, চিন্তার ভার কিছুটা কমেছে কি তার? কিন্তু কিছু বুঝবার আগেই তিনি ভিতরে চলে গেলেন।

আমি কান পেতে রইলাম, যদি ভেতরের কোন কথাবার্তা শোনা যায়।

শাহ ডাকলেন : সিতারা।

বেগম সাহেবা উঠে দাঁড়িয়ে কুর্ণিশ জানালেন শাহকে। শাহ তার পালঙ্কে গিয়ে বসলেন। বেগম সাহেবার মুখের দিকে তিনি বোধহয় একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। তারপর বললেন : সিতারা, তোমাকে যেন বিমর্ষ দেখাচ্ছে ?

বেগমসাহেবা বললেন : না জাঁহাপনা, আমাকে বিমর্ষ দেখাবে কেন ? আমার অভাব কি যে বিমর্ষ হব ? আপনি থাকলেই আমার সব আছে। কিন্তু আপনার চিন্তাক্লান্ত মুখ দেখে আমি ব্যথা পাচ্ছি। জাঁহাপনা, কি এমন দুঃখ আপনার যেজন্য মুখের হাসি মিলিয়ে যাচ্ছে ?

শাহ বললেন : কিছু নয় সিতারা। রাজ্যের কিছু সমস্যা আমাকে চিন্তাক্লিষ্ট করেছিল, আর আমি চিন্তা করব না।

সিতারা বেগম বললেন : হ্যাঁ শাহেন শা আপনার পক্ষে সামান্য বিষয়ে কি চিন্তা করা উচিত ? সব ক্লান্তি মুছে ফেলে দিন শাহেন শা।

শাহ বললেন : হ্যাঁ সিতারা, ক্লান্তি মুছব বলেই তোমার কাছে এসেছি। তুমি বোস।

বুঝলুম শাহের পাশে সিতারা বেগম বসলেন। মনে হল, শাহ তাঁকে নিজের বুকের কাছে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরলেন। কিছুক্ষণ নীরবে কাটল। তারপর শাহের কণ্ঠ শুনতে পেলাম আমি : আচ্ছা সিতারা, তুমি কি আমাকে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভাল বাসতে পেরেছ ?

প্রশ্ন শুনেই আমি একটু কেঁপে উঠলুম। বুঝতে পারলুম, শাহের মন থেকে সন্দেহের কালো ছায়া এখনো দূর হয়নি। শাহজাদা রেজার প্রতি সিতারা বেগমের আকর্ষণের এক কল্পিত কাহিনী কারা যেন শাহের কানে নিত্য তুলে ধরছেন।

সিতারা বেগম বললেন: এ প্রশ্ন এতদিন পরে আজ কেন শাহেন শা?

শাহ বললেন: আমার মনে হয়, তুমি ভয়ে আমার কাছে নতি স্বীকার করেছ, ভালবাসতে পারনি। তুমি নিতান্তই তরুণী। প্রৌঢ় শাহকে ভালবাসা কি তোমার পক্ষে সম্ভব?

সিতারা বেগম বললেন: এ সন্দেহ কেন শাহেন শা?

শাহ বললেন: 'শাহেন শা', 'জাঁহাপনার'র বাইরে অন্য কোন মধুর সম্বোধনে তুমি আমাকে আজ পর্যন্ত ডাকনি কেন সিতারা?

সিতারা বেগমের কোন উত্তর শোনা গেল না। আমি তার মুখ দেখতে না পেলেও বুঝতে পাচ্ছি, তিনি ব্রীড়ানত হয়েছেন। প্রকৃতই যে নারী, এক্ষেত্রে তার লজ্জা পাওয়া ছাড়া উপায় কি?

মনে হল, শাহের যেন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে গেলুম। সন্দেহের কালোছায়া মনে ঢুকলে তাকে তো দূর করা যায় না। সহজকে সে জটিল করে দেখে। হাতের মুঠোতে পেয়েও কোন কিছুকে সে নিজের বলে ভাবতে পারেনা।

শাহ বললেন: সিতারা, আমার কাছে আজ পর্যন্ত ভালবেসে কিছু চাওনি তুমি কেন?

সিতারা বেগম বললেন: কি চাইব শাহেন শা না চাইতেই আপনি তো আমাকে সব দিয়েছেন!

—তবু আমার ইচ্ছে করে তুমি কিছু চাও। তোমাকে কিছু দিয়ে আমি তৃপ্ত হই

—কি চাইব, শাহেন শা?

—তোমার যা খুশি?

সিতারা বেগম বললেন: শাহেন শা, আপনি যদি সন্তুষ্ট হন, আপনার কাছে একটি প্রার্থনা আছে আমার।

আমার বুকটা কেঁপে উঠল। কি চাইবেন সিতারা বেগম?

সিরাজাই বেগমের পরামর্শ মত শাহজাদা রেজার প্রাণ ভিক্ষা চাইবেন না তো ? ভেতরে একটা চক্রান্ত চলেছে, নির্মল প্রাণ সিতারা বেগম সেটা বুঝতে পারেন নি, কিন্তু আমি বুঝেছি। মনে হল চেঁচিয়ে বলি, বেগম সাহেবা আর যা-ই করুন শাহজাদার জন্যে কিছু বলবেন না যেন।

শাহ বললেন : বল, কি তোমার প্রার্থনা।

সিতারা বেগম নীরব থাকলেন।

শাহ আবার বললেন : বল !

কিছুটা যেন সঙ্কোচ ফুটে উঠলো সিতারার কণ্ঠে : আপনি আমার প্রার্থনা রাখবেন তো ?

শাহ বললেন : তোমায় অদেয় আমার কিছু নেই সিতারা, বল !

—শাহজাদাকে আপনি মার্জনা করুন শাহেন শা।

যেন অস্ফুট একটা চিৎকার বেরুল শাহের কণ্ঠে : কি ;

—শাহজাদাকে আপনি মার্জনা করুন।

বুঝলুম : শাহ উঠে দাঁড়িয়েছেন। এ-শিবিরে আর তিনি থাকবেন না।

মনে হল সিতারা বেগম উঠে দাঁড়িয়ে শাহের পদযুগল জড়িয়ে ধরেছেন : শাহেন শা পুত্রের প্রতি ক্রোধ পোষণ করবেন না. তাকে মার্জনা করুন।

শাহ যেন হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন : দূর হও বিশ্বাসঘাতিনী।

একটা আঘাতের শব্দ শুনলুম। একটা অস্ফুটা চিৎকার। তারপর সব নীরব।

আমি ভয় পেলুম। আমার বুকখানা কাঁপতে লাগল। এই অনাত্মীয় জগতে সিতারা বেগমকে আমি আত্মীয়ের অধিক স্নেহ দিয়ে ফেলেছিলুম। আমার চিত্ত বড় ব্যাকুল হয়ে উঠল। শাহের ভ্রূকুটির কথা গ্রাহ্য না করেও আমি ভেতরে উঁকি দিলুম।

দেখলুম নিস্তরঙ্গ একটা নদীর মত সিতারা বেগম ভূমিতে লুটিয়ে আছেন। তার মুখের কোণ বেয়ে রক্ত ঝরছে। শাহ মাথায় হাত দিয়ে পালঙ্কের উপর বসে আছেন।

আমি বেগম সাহেবার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। প্রাণের স্পন্দন আছে বলে মনে হল না। এশিয়া-ত্রাস বীর সিংহ নাদির কুলি। তার একটি পদাঘাত কোমলাঙ্গী সিতারার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নাও হতে পারে। বিশেষ করে প্রিয়তমের কাছ থেকে এ আঘাত সে হয়তো সহ্য করতে পারেনি।

শাহ সেই যে মুখ নিচু করে বসে আছেন আর তুলছেন না। আমি কি করব, ভাবলুম। এখনো চেষ্টা করলে হয়তো বেগম সাহেবা জীবন ফিরে পেতে পারেন।

আমি তাকে দুই বাহু দিয়ে তুলে নিলুম। আর একবার শাহের দিকে তাকালুম। তিনি নিজের দুই করতলে মুখ ঢেকে বসে আছেন। প্রিয়তম বস্তুকে আঘাত করা নিজেকে আঘাত করারই সামিল। এ আঘাতের ঘোর কাটাতে শাহের সময় লাগবে।

আমি অচেতন বেগম সাহেবাকে নিয়ে বাইরে এলুম। কি করব তাই ভাবলুম। অন্য কাউকে একথা জানানো চলবে না। সিরাজাই বেগম যদি বিন্দুমাত্র জানতে পারেন, সিতারা বেগমের জীবন-দীপের শেষ কম্পিত শিখাটুকু নিভিয়ে দেখার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করবেন না। শুশ্রূষার নাম করে তিনি যদি বেগম সাহেবাকে নিজের শিবিরে নিয়ে যেতে চান? ভাবলুম, ষড়যন্ত্রের বাইয়ে নিয়ে যেতে হবে বেগম সাহেবাকে।

আমাদের শিবিরের দুই ক্রোশ দূরে আর্মেনীয়দের একটি পল্লী আছে। সেই আর্মেনীয়দের এক নামকরা হেকিমকে আমি চিনি। ভাবলুম, বেগম সাহেবাকে সেখানে নিয়ে যাব। এই আর্মেনীয়গণ আর এক অবহেলিত জাত। ভাগ্য বিড়ম্বিত রমণীকে তারা

যে সমবেদনা দেখাতে পারবে, আর কেউ তা পারবে না। আমি অন্ধকারের আড়ালে পায় হেটে সেই পল্লীর দিকে চললুম।

গভীর রাত্রিতে সেই আর্মেনীয় পল্লীতে হেকিম আদমসীর গৃহে কড়া নাড়লাম আমি। ভীত গৃহকর্তা দোর খুলে দিয়ে মশালের আলোতে আমার মুখ দেখলেন: আগা!

বললাম: হ্যাঁ, হেকিম সাহেব।

আমার বাহুতে অচৈতন্য বেগমকে দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন: —এ কে?

বললুম: শাহের হারেমের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান রত্ন। এঁকে দেখুন।

আদমসী গভীর ভাবে সিতারা বেগমকে পরীক্ষা করলেন।

বললাম: কেমন দেখলেন? জীবনের আশা আছে?

আদমসী বললেন: গুরুতর আঘাত। সংবিত ফিরতে দেরী হবে। আদবে ফিরবে কিনা, সে কথাও বলা যায় না।

আমি বললাম: দেখুন যদি জীবনে দান করা যায়। শাহ আজ আত্মবিস্মৃত হয়ে ভ্রান্তি বশতঃ নিজের প্রিয়তম জনকেই আঘাত করেছেন। আমি জানি কাল এঁকে ফিরে পাবার জন্যে তিনি উন্মাদ হবেন। শাহের আক্রোশ থেকে তখন দুনিয়াকে রক্ষা করবার জন্য এর প্রয়োজন হবে সর্বাপেক্ষা বেশী। আপনি আপনার সমস্ত শিক্ষা-কৌশল প্রয়োগ করে এর জীবন রক্ষার চেষ্টা করুন। আমি থাকতে পাচ্ছি না, এক্ষনি আমাকে শিবিরে ফিরতে হবে। আপনি কথা দিন।

আদমসী বললেন: কথা দেবার মালিক খুদাতালা স্বয়ং। আমি আমার আপ্রাণ চেষ্টা করব আগা।

আমি বেগম সাহেবাকে রেখে বাইরে চলে এলাম।

নিশীত রাতের একটানা হাওয়া বইছিল তখন। পাহাড়ের কোন গহ্বরের মুখে সে হাওয়ার একটা করুণ সুর ফুটে উঠছিল। আমার মনে হল, প্রকৃতি তার প্রিয়তম শিশুর জন্য বোধহয় কাঁদছে।

॥ ছয় ॥

মূল কাহিনী শেষ হলেও একটা উপসংহার থাকে। সেই উপসংহার টানছি আমি।

খবরটা তো গোপন থাকবার নয়। জাগ্রত চোখ তো এমন একটা ঘটনার আশঙ্কাতে সর্বদাই উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল।

সেই রাতে ফিরে এসে আমি ভাবলুম কোন শিবিরের কাছে আমি দাঁড়াব? নতুন কাজতো শাহ আমাকে কিছু দেন নি। আমি শাহের শিবিরের মুখে দাঁড়িয়ে রইলাম বাকি রাতটুকু আমি এক নিষ্কলঙ্ক সুন্দর মুখের কথা ভেবে কাটিয়ে দিলাম। আমি জানতুম শাহের ভাগ্যে এ রত্ন শোভা পাবে না। বর্তমান কালের জন্য সিতারা বেগম নন। খুদা শ্রেষ্ঠতমা নারী সৃষ্টি করেছেন বটে, তার জন্য যোগ্য পুরুষ সৃষ্টি করেন নি। শাহের যথেষ্ট তগ্‌দির যে স্বল্প কালের জন্য হলেও তিনি নিজের কাছে একটি রমণী রত্নকে রাখবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

বেগম সাহেবাকে দেখতুম নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি আতঙ্কিত।

কোন গণৎকার নাকি একদা তাঁকে বলেছিলেন, জীবনে প্রিয়তমের সান্নিধ্য ভোগ করবার সুযোগ তার নসিবে নেই। সে কথাই সত্য হল।

কিন্তু ভাগ্যস্রষ্টা খুদাতালা সুন্দর করে গড়ে তাকে এমন করে অসুন্দর পরিণতির মধ্যে টেনে নিলেন কেন? সিতারা বেগমকে যদি তিনি সৃষ্টি করলেন, তাকে মূল্য দিলেন না কেন? সত্য এবং সুন্দর কি দুনিয়াতে তার মূল্য কোনদিন পাবে না?

শাহের শিবিরের মুখে নিতান্ত ভগ্নচিত্তে একা দাঁড়িয়ে সারা রাত ভরে এই সব কথা ভাবছিলাম। রাত্রি শেষে দুই চোখে আমার বোধ হয় একটা ক্লান্তির পড়দা নেমে এসেছিল। হঠাৎ চমকে উঠলাম—

আমাকে নাম ধরে কাউকে ডাকতে শুনে। তাকিয়ে দেখি বেগম সাহেবা সিরাজাই বেগম।

কুর্নিশ জানিয়ে বললুম : বেগম সাহেবা আপনি!

হেসে বেগম সাহেবা বললেন : হ্যাঁ, কাল সারারাত আমি শাহের কাছেই ছিলাম।

আমি অপলক দৃষ্টিতে বেগম সাহেবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম—সিরাজাই বেগমেরই জয় হল।

বেগল সাহেবা বললেন : আগা, শাহকে বলেছি, তুমি এবার থেকে আমারই কাছে থাকবে।

সেলাম জানিয়ে বললাম : এ' বান্দার অসীম সৌভাগ্য বেগম সাহেবা।

বেগম সাহেবা আমাকে একটু আড়ালে ডেকে নিলেন। বললেন : কাল রাতে কি হয়েছিল আগা?

বললুম : কিছু জানিনা বেগম সাহেবা।

-সিতারা কোথায়?

তিনি আর নেই বেগম সাহেবা, ঐ দূর পাহাড়ের কোলে আমি তাকে গোর দিয়ে এসেছি।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস নয়, একটা আনন্দের ছটা লক্ষ্য করলাম সিরাজাই বেগমের মুখে।

খুদা মেহেরবান, আমার কথাতেই বিশ্বাস করেছেন সিরাজাই বেগম। সম্ভবতঃ শাহের কাছে সিতারার মৃত্যু সংবাদ শুনেছেন তিনি।

এই মিথ্যেই প্রচারিত হয়ে থাক।

সত্যকে আড়ালে লুকিয়ে রাখতে হলে মিথ্যের প্রয়োজন আছে।

ষড়যন্ত্র দ্বারা ক্ষমতা অধিকার করা যায়—কিন্তু ভালবাসা জয় করা যায় না। সিরাজাই বেগম শাহকে ফিরে পেলেন, কিন্তু তাঁর মন পেলেন কি?

শাহকে এখনো আমি দেখি।

তিনি ভয়ঙ্কর কঠিন হয়েছেন। শাহজাদা রেজা শিবির থেকে পালিয়ে গিয়েছেন। তার বহু দেহরক্ষীকে কোতল করা হয়েছে। শাহ ঘোষণা করেছেন, বিদ্রোহীদের তিনি নিশ্চিহ্ন করে ফেলবেন। বিদ্রোহী কে, তিনি তা জানেন না। বিদ্রোহী তার অন্তরাত্মা। যতদিন পর্যন্ত না তিনি তা জানতে পারবেন, ততদিন বৃথাই একটা উন্মাদের মত তিনি দিগ্‌বিদিক্ ঘুরে বেড়াবেন। শান্তি পাবেন না। তিনি কি জানেন, তাঁর মন কোথায় পড়ে রয়েছে?

শাহ ইস্‌পাহানে ফিরলেন। কিন্তু নিশ্চিন্তে দুদিন হারেমে রাত কাটাতে পারলেন না। চতুর্দিক থেকে সংবাদ আসতে লাগল—বিদ্রোহ ঘটেছে। আবার ইস্‌পাহান ছেড়ে বেরুলেন তিনি।

আবার প্রান্তরে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতে হবে তাঁকে। আমি জানি, এছাড়া আর উপায় নেই। স্থির হয়ে বসে থাকবার মানসিক স্থিতি শাহ সেই রাত্রেই হারিয়ে ফেলেছেন।

ইস্‌পাহান থেকে বেরুবার আগে শাহ আমাকে ডাকলেন। আমি কুর্ণিশ করে দাঁড়াতেই তিনি বললেন: আগা, আমি যুদ্ধ যাত্রা করছি। আর কোন দিন ফিরব কিনা জানি না।

বললুম: এ চিন্তা করছেন কেন শাহেন শা? আপনি নিশ্চয়ই ফিরবেন।

শাহ বললেন: না। রোজ রাত্রে বীভৎস দুঃস্বপ্ন দেখছি। রক্তাক্ত হাত বাড়িয়ে দিয়ে আততায়ীরা ছুটে আসছে আমার দিকে। আমি চমকে উঠছি।

বললুম: আপনার মানসিক স্থৈর্য্য এখনো ফিরে আসেনি, তাই এই সব দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে। আপনি ঐসব কল্পনাকে মনে স্থান দেবেন না শাহেন শা।

শাহ বললেন ঃ আমি দিতে চাইনা। কিন্তু ওরা জোর করে ছুটে আসে। হ্যাঁ, যে-কথার জন্য তোমায় ডেকেছিলাম, সিরাজাই বেগম ধরেছেন, এ অভিযানে তিনিও আমার সঙ্গে যাবেন। তোমার কি অভিমত ?

বললুম ঃ শাহেন শা, বেগম সাহেবার অভিলাস সম্পর্কে আমার কি অভিমত থাকতে পারে ? তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া অযৌক্তিক হবে না।

শাহ একটু নীরব থেকে কি যেন ভাবলেন।

আমি মনে মনে ভাবলুম—সিরাজাই বেগমকে শাহের সঙ্গে রাখাই বাঞ্ছনীয়। হারেমে থাকলে আবার তিনি কি নারকীয় ঘটনা ঘটাবেন, কে জানে !

শাহ আমাকে বললেন : আগা, একটি প্রশ্ন আজো আমার মনকে ক্ষতবিক্ষত করছে। তোমাকে তা জিজ্ঞাসা করব বলেই ডেকেছি। সিতারা বেগম কি সত্যি কোন ভুল করেছিল ?

বললুম : শাহেন শা, এ প্রশ্নের উত্তর আপনার নিজের মন যা দেবে, তাই সত্য। তবে আমি ইটুকু বলতে পারি, এমন নির্মল প্রাণ আমি আর কখনো দেখিনি। আপনার প্রতি ভালবাসায় তার বিন্দুমাত্র কারচুপি ছিল না।

দেখলুম ঃ শাহের চোখের কোণেও দুই ফোটা জল গড়িয়ে পড়ল।

বুঝলুম, সাহারার মত রুক্ষ বহিরঙ্গের নির্মমতার আড়ালে বহুদিন যাবৎ এই অশ্রুপ্রবাহ তরঙ্গ তুলে নাচছে। এই অশ্রু যদি পথ পায় শাহ অনেকটা শান্ত হবেন। নইলে বিভ্রান্ত নাদির আরো বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে বেড়াবেন শুধু।

শাহ আমায় একটি অনুরোধ করলেন। বললেন ঃ অভিযানকালে কখনো যদি সেই স্থানে যাই, তার কবর তুমি আমায় দেখিও আগা।

কি বলব ভেবে পেলুম না। কবর তো তার দিই নি! কিন্তু কবর হয়তো অন্য কেউ তাকে দিয়েছে। আর যদি কবর তার নাই উঠে থাকে? যদি···। আমি চুপ করে থাকলুম।

শাহ বললেন: কই কথা বলছ না?

বললুম: আপনার হুকুম আমার মনে থাকবে শাহেন শা?

শাহ আর কোন কথা বললেন না।

পরদিন ইস্পাহান থেকে আমরা বেরুলাম। একটা অশান্ত উল্কার মত শাহের গতি। শত শত হতভাগ্য শির ইরাণের এ-প্রান্ত থেকে সে-প্রান্তে গড়িয়ে পড়তে লাগল। কত হতভাগ্যের করুণ কান্নার ধ্বনি আকাশে উঠল। কত চোখের জল নীরবে মাটির উপর পড়ল। তবু শাহের শান্তি নেই। শাহের নিজের হৃদয়ে ক্ষত। বাইরে খুঁজে বেড়াচ্ছেন সেই যন্ত্রণার উপশম করতে।

রাতে শাহের শয়ন শিবিরের পাশে দাঁড়িয়ে শুনতে পাই, তার অবচেতন মনের প্রলাপ। কখনো কখনো সিতারা সিতারা বলে কেঁদে উঠেন তিনি। কখনো কখনো ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে চিৎকার করে উঠেন। প্রেমের স্বপ্নের পাশে বীভৎস একটা চিত্রও তাকে তাড়া করে বেড়ায়। দুটি তার চরিত্রের মধ্যে সুপ্ত আছে। কি অদ্ভুত অসঙ্গতি! বিশ্বসংসার নাদিরের পৈশাচিক রুদ্র রূপ দেখেছে, কিন্তু আমি তাঁর হারেমের খোজা, তাঁর অন্তঃপুরের কাছে যাবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম। তাঁর আর একটা রূপ দেখবার আমার তাই সৌভাগ্য হয়েছে। দুনিয়া যদি ওকে বীভৎস হত্যাকাণ্ডের জন্য অভিশাপ বর্ষণ করে, একমাত্র আমি আগাবাসী তাঁর করুণ ব্যর্থতার জন্য তাঁকে সমবেদনা প্রদর্শন করব। নাদির ঘৃণার চেয়ে করুণার পাত্র বেশী।

দীর্ঘ পাঁচ বৎসর ঘুরতে ঘুরতে আবার একদিন আমাদের শিবির পড়ল সেই হিরাতের কাছে। এইখানেই সেই নির্মল প্রাণটিকে আমরা রেখে গিয়েছিলাম।

শাহ আমাকে ডেকে বললেন : আগা ! এই তো সেই স্থান ?

বললুম : আজ্ঞে জাঁহাপনা।

—কোথায় তুমি তাকে রেখেছিলে ?

কি বলব, ভাবতে লাগলুম। সত্যতো আজ আমারই কাছে অজ্ঞাত। সে আছে কি নেই কে জানে! জীবনে এত গভীর বঞ্চনা নিয়ে মানুষ কি কখনো বেঁচে থাকতে পারে ? তবু মিথ্যাই যদি কারো জীবনে সামান্য সান্ত্বনা বহন করে আনে, চোখের জল ফেলে একটুখানি হাল্কা হতে দেয়, তবে সে মিথ্যা বলে সে সুখ তাকে দেবনা কেন। দূরে কল্পিত এক পাহাড়ের কোল দেখিয়ে বললুম : ঐখানে।

করুণ দৃষ্টি মেলে শাহ সেদিকে তাকিয়ে থাকলেন।

সারাটা দিন শাহ একা সেখানে বসে থাকলেন। তাঁর স্থির দৃষ্টি ঐ দূর পাহাড়ের কোলে নিবদ্ধ।

অপরাহ্ণে আহমদ খাঁ এসে শাহের পাশে দাঁড়াল। সে শাহকে কুর্ণিশ জানাল। শাহ তা দেখতে পেলেন কিনা কে জানে। তিনি তেমনি দূর পাহাড়ের কোলে তাকিয়ে থাকলেন। একবার পাশ ফিরতে আহমদের উপর দৃষ্টি পড়ল তাঁর। মনে হল গভীর ভাবে তাঁর কপালে কি লক্ষ্য করছেন তিনি। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শাহের চোখের কোণে কয়েক ফোঁটা অশ্রু ফুটে উঠল।

আহমদ বিচলিত বোধ করল। ডাকল : শাহেন শা।

শাহ ডাকলেন : কাছে এস আহমদ।

আহমদ এগিয়ে এল।

শাহ বললেন : আরো কাছে এস।

আহমদ আরো কাছে সরে এল।

শাহ বললেন : আহমদ, মনে রেখ, আমার মৃত্যুর পর তুমি শাহ হবে। তখন আমার হারেমকে তুমি দেখ।

একি ! শাহ একি বলছেন ! আহমদ ভয় পেয়ে হাটু গেড়ে

বসে বলল : শাহেনশা, আমার জীবনের যদি আপনার প্রয়োজন হয়, বলুন। আমাকে হত্যা করতে চান, এই আমি আমার বুক খুলে দিচ্ছি। আপনি একথা বলছেন কেন ?

শাহ যেন গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন : আমি জানি, তুমি শাহ হবেই। আমার হারেমকে তুমি দেখো।

আমরা কিছু না বুঝতে পেরে পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলুম। এমন করুণার্দ্র ভঙ্গীতে আমিও কখনো শাহকে দেখিনি। হায়রে প্রেমের বঞ্চনা !

প্রত্যেক প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির একটা আত্মিক শক্তি থাকেই। সেই শক্তি তাঁকে যেমন উত্থান সম্পর্কে স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়, তেমনি পরিণতি সম্পর্কেও আভাস দিতে পারে বই কি ? ইস্রাইলদের ডেভিডের মত একদিন নাদির পশুচারণ-ভূমি থেকে কি ইঙ্গিত পেয়েছিলেন, এগিয়ে এসেছিলেন ইরাণের শা তামাশকে রক্ষা করতে। নিজেই বসেছিলেন সিংহাসনে। আজ কি তিনি শেষ পরিণতির ইঙ্গিত পাচ্ছেন ?

অনেক দূরে একটা কালো বিন্দুর মত কি ফুটে উঠল। দেখি শাহ সেই দিকে তাকিয়ে আছেন। গভীর আগ্রহে কি যেন দেখছেন তিনি। আমায় বললেন : আগা, দূরে কিছু দেখছ তুমি ?

আমি স্পষ্ট কিছু ঠাহর করতে পারলুম না।

শাহ বললেন : একজন ঘোড়সওয়ার, এদিকেই আসছে।

শাহ আহমদের দিকে তাকিয়ে বললেন : আহমদ, তোমার রক্ষীবাহিনীকে প্রস্তুত কর। কোন সংবাদ আছে নিশ্চয়ই।

আমরা অপেক্ষা করতে লাগলুম। দেখলুম শাহের অনুমানই সত্য। একজন অশ্বারোহী ছুটে আসছে। আমাদের শিবিরের কাছে এসে সে থামল।

আহমদ তরবারি খুলে তার দিকে ছুটে যাচ্ছিল। শাহ তাকে থামিয়ে বললেন : ওকে আসতে দাও।

লোকটি ঘোড়া থেকে নেমে শাহকে কুর্ণিশ করে দাঁড়াল।

আমি তাকিয়ে দেখলুম, একজন আর্মেণীয় ছেলে।

আহমদ জিজ্ঞাসা করল: তুমি কে? এখানে এসেছ কেন?

সে বলল: শাহকে চাই আমি।

—কেন?

—শাহের কাছে আমার একটি গোপন বার্তা আছে।

আহমদ বলল: শাহ তোমার সামনে বসে আছেন।

ছেলেটি আবার শাহকে কুর্ণিশ জানিয়ে কাছে এগিয়ে এল।

নিজের শিরস্ত্রাণ খুলে কি এক খণ্ড জিনিষ যেন সে শাহকে দিল।

সেটা হাতে পড়তেই শাহ যেন চিৎকার করে উঠলেন—এ তুমি কোথায় পেলে?

ছেলেটি বলল: আপনি যাকে এ রত্নটি দিয়েছিলেন তিনিই এটা আমার হাতে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

উত্তেজিত কণ্ঠে শাহ বললেন: কি বলছ তুমি! সে এখনো বেঁচে আছে!

ছেলেটি বলল: আছেন জাঁহাপনা। তিনি আপনার দর্শন প্রার্থিনী। আমাকে জানাতে বলেছেন, কি অপরাধে শাহ তাঁকে এমন নির্মম শাস্তি দিচ্ছেন।

উল্লাস-চিৎকারে যেন ফেটে পড়লেন শাহ। আমায় ডাকলেন—আগা।

বললুম: হুকুম করুন জাঁহাপনা।

হাতের মণিটি আমায় দেখিয়ে তিনি বললেন: এ মণিটি কার তুমি জান?

—কার জাঁহাপনা?

—আমার স্মারক মণি, আমি দিয়েছিলুম সিতারা বেগমকে। ছেলেটি বলছে সে বেঁচে আছে। আগা, একি সম্ভব?

অপরিসীম আনন্দে আমিও যেন সেই মুহূর্তে আত্মহারা হলুম। একি সম্ভব! সে বেঁচে আছে! খুদা মেহেরবান।

যেন চিৎকার করে উঠলেন শাহ: বল আগা, কথা বল? তুমি তাকে কবর দিয়েছিলে না।

আমি বললুম: শাহেন শা, যদি দোষ করে থাকি আমার গর্দান নেবেন। আপনাকে আমি যা বলেছি সব মিথ্যা। সে রাত্রে বেগম সাহেবাকে আমি আর্মেণীয় গাঁয়ে হেকিম আদমসীর হেফাজতে রেখে গিয়েছিলুম। পাছে বেগম সাহেবার ক্ষতি হয় সেই ভয়ে আমি সত্য গোপন রেখেছিলুম খোদাবন্দ্।

শাহ প্রায় কেঁদে ফেললেন। বললেন: হায় আগা! তুমি মুর্খ! বুঝতে পারনি এতদিন আমি কার জন্য হাহাকার করে বেড়িয়েছি?

বললুম: তা জানতুম খোদাবন্দ্। কিন্তু বেগম সাহেবা যে সত্যি বেঁচে আছেন এটা আমিও ভাবতে পারিনি।

আহমদের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন: আহমদ, ছেলেটির সঙ্গে গিয়ে তুমি বেগম সাহেবাকে নিয়ে এস। আগা তুমিও সঙ্গে যাও

আমরা কুর্নিশ জানিয়ে তৎক্ষণাৎ আর্মেণীয় গাঁয়ের দিকে রওনা হলুম।

পথে চলতে চলতে সেই এক বছর আগের কথা আমার মনে পড়তে লাগল। ম্রিয়মান একটি ছিন্ন লতাকে যেন সেদিন আমি দুই হাতে তুলে নিয়ে ফেলে দিয়ে এসেছিলুম।

গণৎকারের ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী দাম্পত্য সুখ সিতারা বেগমের ভাগ্যে নেই। এই এক বছর বিচ্ছেদ-বেদনার মধ্য দিয়ে কি দৈবের সেই অভিশাপ তার কেটে যায় নি? কি জানি কি অবস্থায় সিতারা বেগম আজ আছেন। লজ্জায় কি তার দিকে আজ মুখ তুলে আমি তাকাতে পারব? সেই নির্মল সৌন্দর্য কি দারিদ্র্যের কষাঘাত সহ্য করে আজো টিকে আছে? আমার বুকটা দুলে উঠল।

আমরা কয়জন ঘোড়সওয়ার পাহাড়ী পথ উচ্চকিত করে আর্মেণীয় পল্লীর কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। পাহাড়ের ঢেউয়ের নিচে যেন একটা বিষণ্ণ ছায়া দাড়িয়ে আছে। যেন সিতারা বেগমের বেদনার ছায়ায় প্রকৃতি ম্লান।

হাল্কা কুয়াশার আনাগোনা চলছিল পাহাড়ী অরণ্যের মাথার উপর দিয়ে। সন্ত্রস্ত কুকুরগুলি আমাদের দেখে প্রচণ্ড বিরক্তিতে চিৎকার শুরু করে দিল। যেন ওরা বুঝতে পেরেছে একটি মহা-মূল্যবান সম্পদকে আমরা ওদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে এসেছি।

বৃদ্ধ আদমসী ঘোড়ার পায়ের শব্দ পেয়ে ঘরের বাইরে এসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকালেন। তার দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে এসেছে। বললেন ঃ তোমরা কারা ?

সেই আর্মেণীয় ছেলেটি বলল ঃ আমি আদসমী। আমি শাহের শিবির থেকে ফিরে আসছি।

—একটা উৎকণ্ঠা ভরা আগ্রহ ফুটে উঠল আদমসীর মুখে ঃ কে আজিজুল ?

—হঁ্যা, জনাব।

—খবর কি ? শাহের সাক্ষাৎ পেলে ? ঐ পাহাড়ের কোলে কি শাহ নাদিরেরই শিবির পড়েছে !

—জী, জনাব।

—শাহকে সেই মণিটি দেখিয়েছিলে ?

—দেখিয়েছিলুম।

—তিনি চিনতে পেরেছেন ?

—পেরেছেন জনাব

—শাহ কি বললেন ?

—শাহ তাঁর দেহরক্ষীদের পাঠিয়ে দিয়েছেন, বেগম সাহেবাকে নিয়ে যাবার জন্যে।

যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন আদমসী।

একবছরে তাঁর চোখের দৃষ্টি অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে এসেছে।

আমি অশ্ব-পৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করে আদমসীর কাছে এগিয়ে গেলুম। বললুম : সালাম হেকিম সাহেব, ভাল আছেন?

বৃদ্ধ আদমসী বললেন : আপনি কে?

বললুম : আমি আগাবাসী। শাহের হারেমের খোজা। বেগম সাহেবাকে আমিই আপনার কাছে রেখে গিয়েছিলুম। বেগম সাহেবা ভাল আছেন?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আদমসী বললেন : হ্যাঁ, দেহের দিক থেকে ভাল আছেন। কিন্তু ··।

আমি চমকে উঠে বললুম : কিন্তু কি হেকিম সাহেব?

আদমসী বললেন : দেহের ভাল থাকাটাইতো সব নয় আগা সাহেব। মনটাই সব। একটা সুন্দর মেয়ের মনটাকে আপনারা এমন করে তিলে তিলে শুকিয়ে মারছেন কেন?

বললুম : সবই নিয়তি হেকিম সাহেব। ভাগ্যের উপর মানুষের হাত আছে কি·

আদমসী সে-কথার উত্তর না দিয়ে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন : বেগম সাহেবার উপর এখনো কি শাহের ক্রোধ আছে?

বললুম : বেগম সাহেবার উপর শাহের কখনো কোন আক্রোশ ছিল না। সমস্ত কিছুই একটা ভুল বোঝাবুঝির ফলে হয়েছে। অনুতপ্ত শাহ এখন বেগম সাহেবার জন্য নিতান্ত অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। এবার বেগম সাহেবাকে তিনি মাথায় করে রাখবেন।

আদমসী বললেন : রাজা বাদশার প্রেম, আজ আছে তো কাল নেই। তাকে আমি কখনো বিশ্বাস করি না। আমার আম্মাজানকে আমি কখনই শাহের নিকট ফিরিয়ে দিতুম না। কিন্তু কি করব—

আম্মাজান শাহকে গভীরভাবে ভালবেসে ফেলেছেন। প্রিয়-বিচ্ছেদের যন্ত্রণায় তিনি তিলে তিলে শুকিয়ে যাচ্ছেন। তাই সহ্য করতে না পেরে শাহের কাছে আমি খবর পাঠিয়েছি। কিন্তু আগাসাহেব, আপনার শাহ গুণী লোক হলেও ভাল জহুরী নন। নকল একটা কোহিনূর মুক্তা নিয়ে তিনি ভুলেছেন। অমূল্য এক রত্নকে তিনি চিনতে পারেন নি।

বললুম : চিনতে তিনি ঠিকই পেরেছিলেন, কিন্তু ভুল করে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। আজ সেই হারানো রত্নের জন্য তিনি পাগল হয়ে উঠেছেন।

আদমসী বললেন : খুদা করুন, তিনি যেন তাঁর নিজের ভুল ধরতে পারেন।

বেগম সাহেবাকে দেখবার জন্য তখন আমার মন নিতান্ত অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। বললুম : আদমসী, আমাদের বেগম সাহেবা কোথায় ?

আদমসী আমাদের সঙ্গের সেই ছেলেটিকে লক্ষ্য করে বললেন : আজিজুল, আগা সাহেবকে আম্মাজান সিতারা বেগমের কাছে নিয়ে যাও।

আজিজুল আমাকে কুর্ণিশ জানিয়ে তার সঙ্গে যেতে অনুরোধ জানাল। আমি আজিজুলের সঙ্গে এগিয়ে চললুম।

কোন প্রাসাদ বা গৃহের দিকে গেল না আজিজুল। অদূরে একটা টিলা পাহাড়ের দিকে আমাকে নিয়ে চলল। এ-দিক ও-দিক নানা স্থানে মেষ চারকেরা পশুপাল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আজিজুল আমাকে একটা পাইন গাছের কাছে নিয়ে গেল। দেখলুম এক রমণী হাতে পশুচারণার দণ্ড নিয়ে পাইন গাছের ছায়ায় বসে দূরে শাহের শিবির লক্ষ্য করে তাকিয়ে আছেন।

মানুষের ভাগ্যের কি অপূর্ব পরিহাস! একদা যার একটি মাত্র ইচ্ছার জন্য শাহ নাদির কুলি দুনিয়া প্রকম্পিত করতে পারতেন তারই

প্রিয়তমা বেগম সিতারার আজ এই অবস্থা! দেখে মনে হল, আমি চিৎকার করে কাঁদি। সত্যিকারের প্রেম মিথ্যে দ্বারা চিরকাল বঞ্চিত হতে পারে না বলেই বোধ হয় আজো বেগম সাহেবা বেঁচে আছেন।

আমি কুর্নিশ করে বেগম সাহেবার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম :—

—বেগম সাহেবা!

বোধ হয় আত্মবিস্মৃত হয়ে সিতারা বেগম কি ভাবছিলেন। চমকে উঠে আমার দিকে ফিরে তাকালেন। আমাকে দেখেই যেন প্রস্তরীভূত হয়ে গেলেন।

আবার ডাকলুম : বেগম সাহেবা!

—আগা! তাঁর চোখে বিস্ময়ের ঘোর।

শাহের নিকট স্মারক অঙ্গুরি পাঠিয়ে তিনি বোধহয় শঙ্কাতুর আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছিলেন। হয়তো বিশ্বাস করতে পারেননি সত্য সত্যই শাহ তাকে ক্ষমা করে ফিরিয়ে নিতে পাঠাবেন।

আমি তাকে সালাম জানিয়ে বললুম : বেগম সাহেবা, আপনাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি।

সিতারা বেগমের দুই চোখ বেয়ে অবিরল ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল।

সান্ত্বনা দেবার মত কোন ভাষা থাকল না আমার। আমি মাথা নিচু করে থাকলুম।

বেগম সাহেবার কণ্ঠে কোন ভাষা সড়ল না।

আমি আবার বললুম : বেগম সাহেবা চলুন, আমরা আপনাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি।

বেগম সাহেবার চোখে তখনো জল ঝরছে।

বললুম : বেগম সাহেবা, অতীত বেদনাকে ভুলে যান। ভাগ্যের বিধানকে কে অস্বীকার করবে। শাহ তার নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন। শাহ আপনাকে সত্যি ভালবেসেছেন। আপনার

বিরহে তিনি আজ বিপর্যস্ত। বিভ্রান্ত। তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে। দিনে দিনে তিনি ম্রিয়মান হয়ে পড়ছেন।

যেন ব্যস্ত হয়ে উঠলেন বেগম সাহেবা। উঠে দাঁড়ালেন। এই প্রথম কথা বললেন : আগা, শাহ ভাল আছেন তো?

বললুম : তিনি শারিরীক কুশলে আছেন বেগম সাহেবা। কিন্তু আপনার অভাবে মানষিক দিক থেকে ভেঙে পড়ছেন। আপনি ফিরে চলুন বেগম সাহেবা।

সিতারা বেগম সেই অবস্থাতেই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন : আগা, চল, আমি এক্ষুনি শাহের কাছে যাব।

আমরা যখন কথা বলছিলুম সেই সময় আদমসী এসে সেখানে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখে সিতারা বেগম গিয়ে তাঁর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

বুঝলুম, আদমসী তাঁকে কন্যার অধিক প্রতিপালন করছেন।

সস্নেহে সিতারা বেগমের চিবুক ধরে আদমসী বললেন : আম্মা, খুদাতালা মেহেরবান। তিনি আমাদের আবেদন শুনেছেন। শাহ তোমাকে ফিরিয়ে নিতে লোক পাঠিয়েছেন। যা বেটা তাড়াতাড়ি চলে যা।

দেখলুম—সিতারা বেগমের চোখে আবার অশ্রু দেখা দিয়েছে।

বুঝলুম, স্নেহের মায়া ত্যাগ করে যেতে তিনি বেদনা বোধ করছেন। হায়রে নির্মল চরিত্র নারী! তোমার মূল্য কে বুঝবে!

ঐ আর্মেনীয় রমনীর বেশেই সিতারা বেগমকে ঘোড়ার পিঠে তুলে দিলেন আদমসী। বললেন : যা বেটী। খুদাতালাকে স্মরণ রাখিস। সব বিপদ তিনিই কাটিয়ে দেবেন।

আমি নিজের ঘোড়ার পিঠে উঠতে যাবার আগে আদমসীকে সালাম জানিয়ে বললুম : হেকিম সাহেব, আপনি শাহের সঙ্গে দেখা করবেন। আপনার এই সেবার পুরস্কার দিতে শাহ কার্পণ্য করবেন না।

শুনে আদমসী একটু হাসলেন। বললেন: আগা সাহেব, খুদাতালা করুন, মানুষের সেবার বিনিময়ে যেন কোন প্রতিদান প্রত্যাশা না করি। সিতারার মত আম্মাকে যে দু'দিন কাছে পেয়েছিলুম সেই বরাতকে আমি ধন্যবাদ দিই। শাহের মঙ্গল কামনা করি। ধন্যবাদ আগা সাহেব। সালাম।

সালাম। আমি ঘোড়ার পিঠে উঠে বসলুম।

বেগম সাহেবা সিতারা বেগম আর আদমসীর মত মানুষ আজো দুনিয়াতে আছে বলে চন্দ্র সূর্য উঠছে।

সন্ধ্যার মুখে আমরা বেগম সাহেবাকে নিয়ে এলুম। অধীর আগ্রহে শিবিরের মধ্যে পায়চারী করে বেড়াচ্ছিলেন শাহ। সিতারা বেগমকে দেখে তৎক্ষণাৎ ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরলেন: সিতারা, প্রিয়তমা!

বাইরে আসতে আসতে দেখলুম, মুক্তাবিন্দুর মত অজস্র অশ্রুকণা দেখা দিয়েছে বেগম সাহেবার চোখের কোণে।

শিবিরের মুখে এসে আমি দাঁড়ালুম। কাউকে আর শিবিরে প্রবেশ করতে দেওয়া চলবে না। দীর্ঘ বিরহের পর দুটি প্রাণ পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করুক।

আমি এবং আহমদ দুজনেই শিবিরের মুখে দাঁড়িয়ে থাকলুম। বেগম সাহেবা সিরাজাই বেগমও যদি আসেন, এই মুহূর্তে তাকে শাহের শিবিরে ঢুকতে দেব না। কিন্তু কি অদ্ভুত ঘটনা, সিরাজাই বেগমের কথা চিন্তা করতে করতেই দেখি শাহের শিবিরের কাছে এসে তিনি হাজির। তাকে দেখে আমরা কুর্নিশ জানালুম।

বেগম সাহেবা শিবিরের ভিতর ঢুকতে উদ্যত হলেন। আমি পথ রোধ করে বললুম: বেগম সাহেবা, গোস্তাকী নেবেন না, শিবিরে প্রবেশ করা এখন বারণ।

অবাক হয়ে সিরাজাই বেগম তাকালেন আমার দিকে: কেন?

—শাহের হুকুম বেগম সাহেবা।

—ভেতরে কেউ আছে?

বলতে গিয়েও আমার জিভ্ থেমে গেল। ভাবলুম এখনো তাকে এ খবর দেওয়া উচিত হবে না।

অধৈর্য বেগম জিজ্ঞেস করলেন: কে আছে?

আহমদ বলল: হজরত সিতারা বেগম।

মুহূর্তে যেন সিরাজাই বেগমের সমস্ত মুখের রং পাল্টে গেল। ভ্রূ দুটি কুঞ্চিত হয়ে উঠল। দাঁতে দাঁত চাপার শব্দ শোনা গেল। আর বিন্দুমাত্র বাক্য ব্যয় না করে সিরাজাই বেগম দ্রুত নিজের শিবিরের দিকে ছুটে গেলেন।

আহমদকে বললুম: আহমদ, সিরাজাই বেগমকে এ সংবাদ এই মুহূর্তে না দিলেই ভাল হত।

চিন্তাক্লিষ্ট ভাবে আহমদ বলল: তাই দেখছি।

বললুম: যা হবার হয়েছে আজ রাতে শাহের শিবিরের উপর আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। সিরাজাই বেগম সিতারার পুনরোপস্থিতকে সহজে মেনে নাও নিতে পারেন।

আহমদ বললেন: হ্যাঁ, আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

সারারাত শিবিরের মুখে মুক্ত কৃপাণ হস্তে আমি জেগে কাটালুম। যদিও অন্যায় তথাপি একটা কৌতূহল বশতঃ আমি শিবিরের অভ্যন্তরে কান পেতে থাকলুম। ইচ্ছা হল, দীর্ঘ বিরহের পর নতুন মিলনকে শাহ কি ভাবে গ্রহণ করেন তাই জানি।

বুঝলুম প্রথমেই শাহ আবেগভরে সিতারা বেগমকে জড়িয়ে ধরলেন: সিতারা, প্রিয়তমা আমার!

বুঝলুম: সিতারা বেগম দীর্ঘ বিরহের পর মিলনের আনন্দে কাঁদছেন।

শাহ্ বললেন : সিতারা। প্রিয়তমা তুমি আমার সকল ভুল ক্ষমা কর। তুমি বিশ্বাস করবে না, তোমাকে হারিয়ে কি অসীম যন্ত্রণায় আমি দিন কাটিয়েছি।

অশ্রুর আবেগভরা কণ্ঠে বেগম সাহেবা বললেন : আমাকে ক্ষমা করুন শাহেন শা।

শাহ্ বললেন : তোমাকে ক্ষমা করবার কিছু নেই। আমাকে ক্ষমা কর সিতারা ?

শুনে আমার মধ্যে কি অপূর্ব শিহরণ লাগল। শাহ, দুর্ধর্ষ নাদির শাহ, তিনিও আজ ক্ষমা প্রার্থনা করছেন। প্রেমের চেয়ে বড় শক্তিশালী আর কি আছে। এমন যে স্বেচ্ছাচারী তিনিও প্রেমের কাছে নত হন।

সিতারা বেগমের কণ্ঠ শুনলুম : শাহেন শা। আবার তো আপনি আমাকে বিতাড়িত করবেন না !

শাহ্ বললেন : প্রিয়তমা, আমার মুহূর্তের ভুল ক্ষমা কর। আমার জীবন থাকতে তোমাকে আমাকে কেউ আর বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না।

আমার মধ্যে একটা আনন্দের স্রোত অনুভব করলুম আমি। নির্মল প্রেমের উর্ধে যে ক্রুরতা জয়লাভ করতে পারেনি, সেই আমার আনন্দ।

আর কিছু আমার জানাবার নেই। আমি দূরে সরে এসে নিশ্চিন্ত তরবারী হস্তে দাঁড়ালুম। খুদা মেহেরবান, প্রেমকে তিনি অমর্যাদা করেন নি।

বিনিদ্র চোখে তাকিয়ে থাকলুম। প্রহরের পর প্রহর কেটে গেল। গাছের মাথায় কয়েকটা পাখি ডেকে উঠল। রাত্রি বোধহয় কেটে গেল। খুদাতালাকে আমি ধন্যবাদ জানালুম। বিপদ ঘটেনি।

কিন্তু অকস্মাৎ একটা আর্ত চিৎকারে আমি চমকে উঠলাম।

মনে হল বেগম সাহেবা সিতারা বেগম যেন চিৎকার করে উঠলেন: কে? কে?

আর শব্দ শুনতে পেলুম না।

দূরে একদল অশ্বারোহী দ্রুত ছুটে চলে গেল।

ওধারে আহমদ আবদালির উচ্চ কণ্ঠ শুনলুম: হুঁসিয়ার।

হুঁসিয়ার, কিজিবিলাস।

বিদ্রোহী কিজিবিলাসেরা এসেছিল কি?

কিন্তু বেগম সাহেবা শিবিরের ভিতর থেকে কি দেখে চিৎকার করে উঠলেন? দুঃস্বপ্ন দেখছিলেন কি তিনি?

দুয়ার থেকে আমি ডাকলুম: বেগম সাহেবা! বেগম সাহেবা!

কোন উত্তর এল না।

ভাবলুম দুঃস্বপ্ন।

আহমদ আমার কাছে ছুটে এল: আগা, আল্লা মেহেরবান। কিজিবিলাসেরা এসেছিল। আমাদের জাগ্রত দেখে শিবিরে হানা দিতে পারেনি।

বললুম: খুদা মেহেরবান। কিন্তু আহমদ, শিবিরের অভ্যন্তরে বেগম সাহেবা হঠাৎ চিৎকার করে উঠেছিলেন।

—সেকি!

—হ্যাঁ! হয়তো দুঃস্বপ্ন দেখেছেন। আমি ডেকে আর তাঁর সাড়া পেলুম না।

আহমদের চোখে মুখে একটা শঙ্কার ছায়া নেমে এল।

আমাকে বলল: আগা, রাত্রি শেষ হয়েছে। শিবিরে ঢুকে তুমি শাহকে জাগরিত কর।

আমি শিবিরের ভিতরে ঢুকলুম। কিন্তু প্রদীপের আলোতে পালঙ্কের দিকে তাকাতেই আমি শিউরে উঠলুম: শাহের বুক দিয়ে

তখনো ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে। ছুরিকাবিদ্ধ অবস্থায় বেগম সাহেবা সিতারা বেগম মাটীতে লুটিয়ে পড়ে আছেন।

চিৎকার করে ডাকলুম: আহমদ! আহমদ! ভেতরে এস।

শিবিরে ঢুকেই পালঙ্কের দিকে নজর পড়তে দুই হাতে মুখ ঢাকল আহমদ: ইয়া আল্লা!

আমি নিষ্পলক দৃষ্টিতে একবার শাহ আর একবার সিতারা বেগমের দিকে তাকিয়ে দেখলাম।

আহমদ বলল: দুষ্‌মনেরা শেষ পর্যন্ত শাহকে খতম করলই! দুষ্‌মন কিজিবিলাসেরা!

আহমদ যা-ই ভাবুক, আমি জানি—এ কাজ কিজিবিলাসদের নয়।

হাঁটু গেড়ে বসে আমি বেগম সাহেবাকে তুললুম।

পালঙ্কে শাহের পাশে নিয়ে শুইয়ে দিলাম তাঁকে। তারপর শয্যাবস্ত্র দিয়ে মৃতদেহ দুটিকে ঢেকে দিলাম।

আহমদ মৃত শাহ দম্পতিকে শেষ কুর্ণিশ জানিয়ে বাইরে গেল।

আমি অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম দুইটি মৃতদেহের দিকে। খুদাতালার কি অসীম রহস্য! এমন পরিণতি টানবার তাঁর কি প্রয়োজন ছিল কে জানে। মনে মনে ভাবলাম, যদি বেহেস্ত থাকে বেগম সাহেবার কল্যাণে শাহ তাকে নিয়ে সেইখানে স্থান পাবেন। মহৎ প্রেমের স্পর্শ যে পায়, তাকে পাপ স্পর্শ করেনা।

হিজরী ১১৪৪ সাল। আমার তৃতীয় শাহ নাদিরকুলি আর বেগম সিতারা আমারই সামনে শেষ শয়নে শায়িত রয়েছেন। এই বীভৎস রাত্রি এখনি শেষ হবে। আমার প্রভু আবার কে হবেন, কে জানে?